পৌষ ১৪২১ : জানুয়ারি ২০১৫



ভেটকি

পোর্ট্রেট : শমীন্দ্রনাথ মজুমদার
কার্টুন : চিরঞ্জিৎ সামন্ত
ক্যালিগ্রাফি : অতীন ভট্টাচার্য

শূ ন্য স্থা ন পূ র ণ

মাছ নন, মাতালও নন

ব্যতিক্রম বাদ দিলে, কলেজস্ট্রিট-ফেরত বাঙালি তিন ধরনের। এক দলের মনের কথা, একটু গোপন — 'ভেটকি ঠিক আমাদের গোষ্ঠীতে বিলং করার উপযুক্ত নয়'। আরেক দলের বিশ্বাস, উচ্চকিত — 'ভেটকি আসলে শুধু এবং শুধুমাত্র আমাদেরই'। আর তিন নম্বর যাঁরা, বাঙালিই, কলেজস্ট্রিট-ফেরতও, এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এই শীতের দিনে হ্যারিসন রোডের মার্জিনে কেবল মাছের ঝোলে দেওয়ার ফুলকপি ও ক্যাপসিকামের সন্ধানী। কবিতার নয়, কবিতা নিয়ে কাওতালিরও নয়। বাহুল্য, তবু বলার, কবিতা-ফবিতায় তাঁদের কিছুই এসে-যায় না; সত্যিই এসে-যায় না। যাওয়ার কথাও কখনো ছিল না।

কিন্তু, যাঁদের এসে-যায়, অর্থাৎ কিনা ওই প্রথম দু-ধরনের মধ্যে যাঁরা পড়েন, তাঁরাও অনেকে এই সংখ্যা পাঠান্তে হতাশ হতে পারেন। সচেতনভাবেই, 'নিছক পাঁড় মাতাল' বা 'মহৎ জাত কবি' মার্কা আগে-থেকে-সেট-করা কোনো টেমপ্লেটেই এখানে ভেটকিকে আঁটানোর চেষ্টা করা হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও-কোথাও হয়তো তেমন কোনো আভাস চোখে পড়তে পারে, পড়বেও, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ-সংখ্যাটিকে সেই খোপ-সংস্কৃতি থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার প্রয়াসই আমরা চালিয়েছি। কাজেই, কোনো পাঠকে প্রিঅকুপেশনও এখানে ধাক্কা খেতে পারে।

ভেটকিকে নিয়ে এ-কাজটি যেটুকু পারা গিয়েছে, ভেটকির পরিবারের সহায়তা ছাড়া তার অনেকটাই সম্ভব হত না। বিশেষত, ভেটকির মা সুধা দাস ও দিদি পাঞ্চালি চট্টোপাধ্যায় — তাঁদের প্রতি *বোধশব্দ* কৃতজ্ঞ। এ-সংখ্যার নেপথ্যে থাকা আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়। তন্ময় মৃধা ও শ্যামল ধর নানা সুপরামর্শে সাহায্য করেছেন এই কাজে। ভেটকির খান-চারেক মূল্যবান ছবি পেয়েছি অতনু সিংহ-র কাছ থেকে। শুভঙ্কর দাশ ওস্তাদের মার দেখিয়েছেন শেষবেলায়! আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন বিনয় মজুমদারের আকাঁড়া পাণ্ডুলিপি। সে-কাহিনি ভিতরে সবিস্তারে রইল। কৃতজ্ঞতা জানানোর চন্দ্রিল ভট্টাচার্যকে। ভেটকির লেখাপত্রের সন্ধানে বারবার তাঁকে বিরক্ত করেছি। ছাপার বিষয়ে নানা সুপরামর্শ পেয়েছি সৌমেন পালের থেকে। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা। ...অতঃপর ভেটকি সুখে জল-ক্রীড়া করুক। চিয়ার্স!



ভেটকি

সম্পাদক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদক : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত

প্রকাশক : অতীন ভট্টাচার্য

যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ ◻ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২

বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com

অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া

মুদ্রণ : এস পি কমিউনিকেশনস, কল-৯

ম্যাকাও, উত্তরপাড়া

বন্ধুত্বে : বরুণ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, রাজদীপ রায়
পিনাকপাণি ঘোষ, অরুণাভ পাত্র, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দে
অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রসূন মজুমদার ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

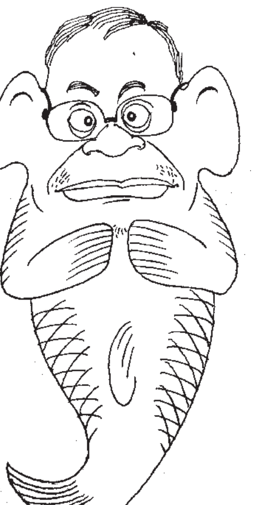
ইতিহাস ঘাঁটলে বা মানুষের সঙ্গে কথা বললে এমন নমুনা খুব বিরল হবে না, যেখানে জনশ্রুতিতে একই ঘটনা একাধিক ভার্সানে উপস্থিত। বা, মূল কাহিনি একই, সময়ান্তরে বা স্থানান্তরে বদলে যাচ্ছে মুখ্য চরিত্রটি। সহজ উদাহরণ, আমাদের বটতলাপ্রতিম সংকলনে কখনো-বা একই স্টোরি-লাইনের জুড়ে যাওয়া গোপাল, বীরবল ও আফান্দির সঙ্গে। অবলীলায়। যুগপৎ। তার মানে কি সেখানে অথেন্টিক কেবল যেকোনো একটিই? বাকিগুলি মিথ্যে? লিনিয়ারিটির বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটিই একটু অন্যভাবে ফের তুলে দিলেন সিদ্ধার্থ দাস। ভেটকি। তাঁর ক্লিনিক্যাল ডেথের পৌনে পাঁচ বছর পর।

ভেটকি যেমন অনেকটাই কথায় বাঁচতে ভালোবাসতেন, তেমনই তিনি বেঁচে রয়েছেন অনেক কথায়। তাঁকে নিয়ে মধ্য কলকাতার একটি ছোট্ট এলাকায় চারদশক ছুঁয়ে-থাকা অনেক গল্প। তাকে 'কিংবদন্তি' বললে, 'মিথ' বললে, ভারী শোনাতে পারে, কিন্তু মিথ্যে শোনাবে না। 'বোধশব্দ'-র এই কাজ করতে গিয়ে দেখছি, ভেটকি প্রসঙ্গে এমন বহু কথাই অনেকে কনফিডেন্সের সঙ্গে বলছেন, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধে যার কোনো প্রামাণ্যতা মিলছে না। যেমন : ভেটকি পড়াশোনায় খুবই ভালো ছিল, কিন্তু করেনি; ভেটকির একটি কবিতার বই ছিল; ভেটকির ছন্দের হাত ছিল মারাত্মক; যেসব পত্রিকায় ভেটকির লেখা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম 'দেশ'; ভেটকিকে নিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দমেলা'-এ, যার প্রথম লাইন ছিল — 'মুখ ভেটকে আছিস কেন ওরে আমার ভেটকিরে'; 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ একবার ভেটকির ছবি ছাপা হয়! এখন সম্ভাবনা প্রবল, ঢের খুঁজেও, এসব নথি বের করায় আমরা অপারগ হয়েছি। কিংবা ধরা যাক, সবই শহরের ধুলোয় হারিয়ে গিয়েছে স্রেফ। কথা হল, এমন কিছু যদি না-ও হয়, অর্থাৎ আদপেই প্রমাণ কিছু না-ও থেকে থাকে, তাহলেও কি এইসব জনশ্রুতি মিথ্যে? নিছক তথ্য দিয়ে তো আর 'কথিত'-কে জাস্টিফাই করা যায় না, ডিনাই-ও করা যায় না! এই যেমন, এ-সংখ্যায় যেসব লেখা আপনারা পড়বেন, সেখানেও রয়েছে তথ্যের বিপুল অসাম্য। ভেটকি কোন স্কুলে পড়তেন, কোন কলেজে পড়তেন, কত দূর লেখাপড়া করেছেন... তা নিয়ে নানা লেখায় নানা তথ্য। অনেকে বলেছেন, ভেটকি মোটেই চশমার কাজ জানতেন না। কেউ লিখেছেন, তাঁর তো ঘড়ির দোকান ছিল। এখন এগুলি যদি বাস্তবানুগ না হয়, তাহলে তা সম্ভবত লেখকের অনবধানতা বা অজ্ঞানতাও নয়; তা জনশ্রুতিরই অংশমাত্র। তাই এসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম এডিটটুকুও করা হল না, লেখায়-লেখায় তথ্যের অসাম্য প্রায় অবিকলই রইল। কারণ আমরা মনে করি, কোনো তথ্যই এখানে 'ভুল' নয়! এক আর একে এখানে তিন চার পাঁচ... এমনকী শূন্যও হতে পারে। তবে হ্যাঁ, দুই হওয়ারও একটা সমান সম্ভাবনা থেকে যায় বটে! সে-জন্যই উল্লেখ করি, এই সংখ্যার 'ভেটকি কে?' অংশে পিনাকপাণি ঘোষের লেখাটির কথা। সে-লেখায় যথাসম্ভব ডকুমেন্টেশন ও তাকে যাচাই করে নেওয়ার পথেই হেঁটেছেন লেখক। তবে তাকেও চূড়ান্ত ভেবে শিরোধার্য করে নেওয়া ভেটকিকে অস্বীকার করার মতোই আহাম্মকি বা বিচক্ষণতা হবে হয়তো!

অতএব, লেখাগুলিতে রয়ে গেল কিছু পুনরাবৃত্তিও। বাধ্যত।

আর আছে কৃতজ্ঞতা জানানোর, জুকেরবার্গ সাহেবকে। তাঁর প্ল্যাটফর্মেই প্রকাশিতব্য এই সংখ্যার পোস্ট দিই ২০১৪ অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধে। বহু গুণীজন সেইখানে নানা কথা লিখে যান। তাঁদের সকলের কাছে 'বোধশব্দ' কৃতজ্ঞ। সেখান থেকেই কয়েকটি মন্তব্য 'ইমেজ' হিসেবে ছড়িয়ে রইল এই সংখ্যায়। 'faceboolি' শিরোনামে। যে বুলি আসলে ভেটকিরই কিংবদন্তি, ভেটকির মিথই।

— সম্পাদক

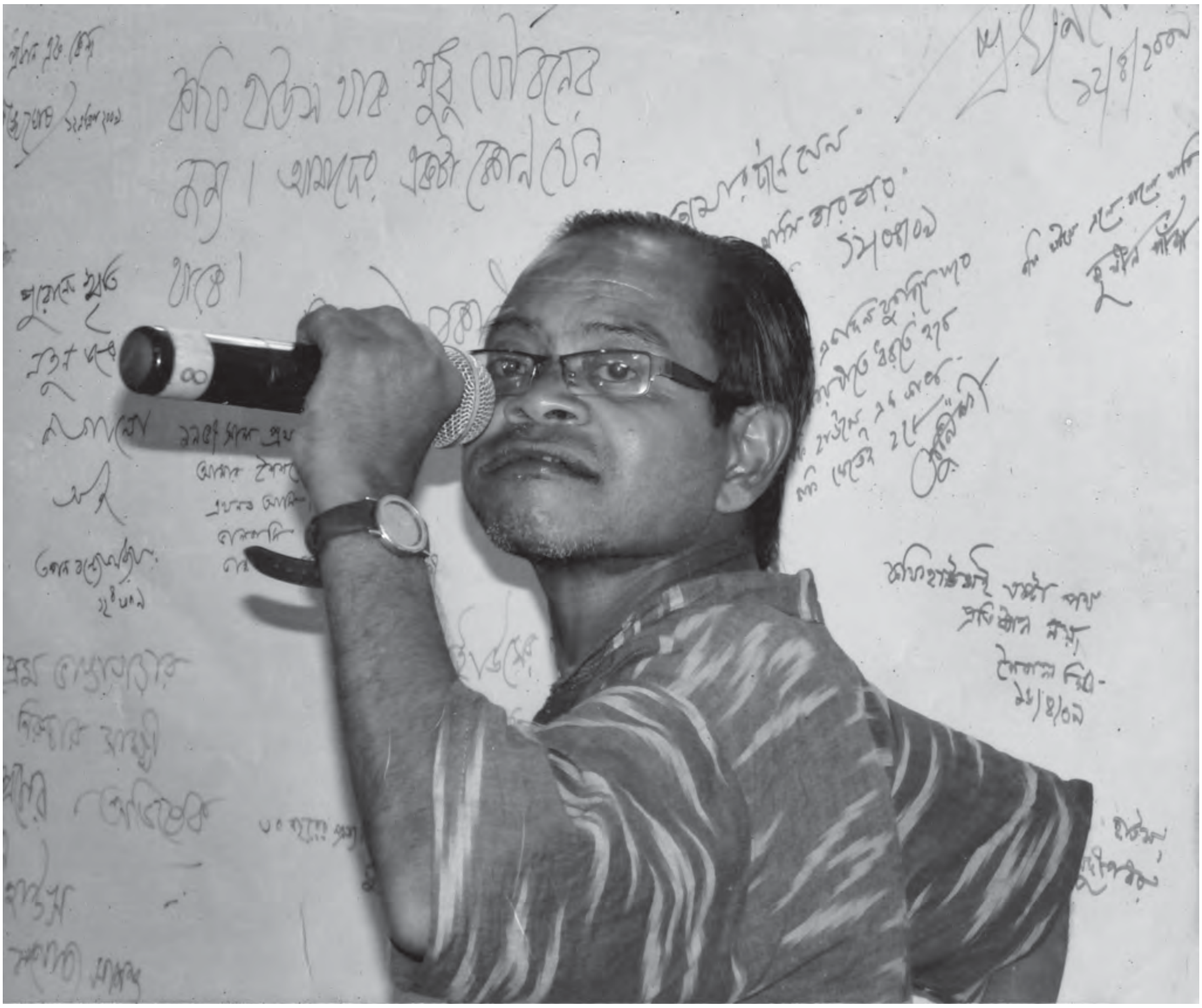


আমি ভেটকিকে চিনি না

অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে

অনির্বাণ ভট্টাচার্য

ছাতের ঘরে বসে রাজা-উজির মারাটা বেশ ভালোই জমে উঠেছিল চা-টার সঙ্গে। কথায়-কথায় সম্পাদক সুস্নাত হঠাৎ বলল 'ভেটকিকে নিয়ে একটা সংখ্যা করছি, তুমি কি চিনতে ওকে?' এই প্রশ্নটার নানারকম উত্তর হয় বা হতে পারত। যেমন, 'কে ভেটকি?', 'কোন ভেটকি?', বা 'না, তেমনভাবে চিনতাম না', কিংবা 'হ্যাঁ চিনতাম, মানে ওই এক-দু-বার দেখা হয়েছিল আরকী' ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু এসবের বদলে অনেকটা অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভেটকিকে আবার কে না-চেনে'! প্রকৃত প্রস্তাবে এই উত্তরটি মিথ্যাকথন, কেননা জন্মসূত্রে বাঙালি বা বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করতে সক্ষম বা বিভক্ত-অবিভক্ত বঙ্গদেশের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত এমন কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে অতীব কোয়ার্ক-শতাংশ মানুষই মানুষ-ভেটকিকে চেনেন বা তার নাম-মাহাত্ম্যের বিষয়ে ফার্স্ট, সেকেন্ড বা থার্ডহ্যান্ড তথ্য রাখেন। নিজের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের বশে বড্ডজোর এটাকে অতিকথন বলে চালানোর চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বস্তুত এটি কলেজস্ট্রিট-কফি হাউস-প্রেসিডেন্সি কেন্দ্রিক বঙ্গসংস্কৃতির যে বৃত্ত, সেখানে একটি সীমাবদ্ধ সময়-পরিসরে উদ্ভূত, লালিত এবং যাঁরা ওই স্থান-কালে জন্ম কর্ম ধর্ম ইত্যাদি সূত্রে যাতায়াত করতেন বা যাতায়াত করতে হত, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্ধিত একটি কনসেপ্ট, যা কালেক্টিভ কনশাসে 'অতিকথা'-র আকার নিয়েছে।



কফি হাউসের ক্যানভাসে

এখন ভেটকিকে চেনা বা না-চেনার প্রসঙ্গে এই সাধারণীকরণ করার পর প্রসঙ্গান্তরে চলে না-গিয়ে যে কারণে এটাকেই কাটা-ছেঁড়া করছি, তা হল, আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে ভেটকির সঙ্গে আমার একমাত্র সাক্ষাৎ — এরপরে আজ হঠাৎ তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল আর আমাদের মুখ দিয়ে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো তার একটা উত্তর বেরিয়ে এল, এবং যে দ্রুততার সঙ্গে যে সাবলীলতায়, তাতে অসততার কোনো লক্ষণ ছিল না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ-দলে আমি একা নই, একটা বিশেষ সময়কালের আশেপাশে যাঁদের জন্ম এবং ওই চত্বরে যাতায়াত ছিল বা কোনো সূত্রে ওই চত্বরের ঘটমান বর্তমান সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁদের একটা জনসমীক্ষা করা হলে আমার উত্তরের সমধর্মী আরও কোনো অতিকথন-দুষ্ট উত্তর পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; যেমন, 'কলেজস্ট্রিট গিয়ে যে লোকটাকে দেখে মনে হবে যে এ ভেটকি, সে-ই ভেটকি'... ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'আমি' বা গৌরব / অগৌরবে বহুবচন করে 'আমরা' যারা প্রকৃতই ভেটকিকে চিনি না; তারা ভেটকিকে চিনি, অন্তত কিছুটা হলেও, এটা প্রমাণ / প্রকাশ / প্রচার করার জন্য এত তৎপর কেন? কেন কুড়ি-কুড়ি বছরের পার হয়ে যাওয়া স্মৃতির উদ্ধার এত সহজ-সাবলীল-অনায়াস — এমনকী বলা চলে, নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থও নয় — যে-কারণে বলে ফেলি যে ভেটকিকে আমি চিনি, চিনতাম, এবং গড়গড় করে বিবৃত করতে পারি সেই দ্বিপ্রাহরিক সাক্ষাতের খুঁটিনাটি, যার স্থায়িত্ব ছিল সাকুল্যে একটি ঘণ্টা!

স্মৃতির স্থায়িত্ব সবসময় সুখ-দুঃখের কোয়ান্টার উপর নির্ভর করে না — জৈবিক নিয়ম অনুসারে আমাদের একটি স্মৃতি অন্যান্য আরও সব স্মৃতির সঙ্গে যত বেশি সখ্যতা তৈরি করতে পারে এবং সেই অন্যান্য সমস্ত স্মৃতির বৈচিত্র্য যত বেশি হয়, ততই প্রথমোক্ত স্মৃতির শিকড়-বাকড় বিস্তৃত হতে থাকে মাথার ভেতরে। প্রতিনিয়ত আমাদের পরিপার্শ্বে যা-যা কিছু ঘটে চলেছে, মস্তিষ্ক সে-সবই নির্বিচারে দেখে, শোনে, শোঁকে, ছোঁয় — কিন্তু, ধরে রাখে না। সহজ যুক্তির বিষয় হল যে আমাদের এই মস্তিষ্ক প্রায় সোনার তরী-র মতোই — তাতে সমস্ত স্মৃতি ধরে রাখার ঠাঁই নেই, তাই ক্রমাগত 'অপ্রয়োজনীয়' স্মৃতিকে বর্জন বা ধ্বংস করে নতুন-নতুন স্মৃতির জন্য জায়গা তৈরি করতে হয়। মস্তিষ্কের এই গৃহিণীপনা আমাদের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করার একটি আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া। কিন্তু তাহলে কীভাবে নিরূপণ করা হয়, কোনটাকে রাখা হবে, আর কোনটা যাবে নিরুদ্দেশে?

ভেটকির সঙ্গে আমার মোলাকাতের দুপুরটাকে ধরেই যদি ভাবি, তাহলে ভেটকি-সংক্রান্ত স্মৃতির প্রথম উপাদান হল স্থান — অর্থাৎ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

কলেজের গেট দিয়ে ঢুকে, বামপন্থী না-হয়ে দক্ষিণপন্থী হলে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' কলেজ ক্যান্টিন এবং তারও ভেতরের কমনরুম-জাতীয় একটি ঘরে সম্ভবত একটি টিটি টেবিল — আমি বহিরাগত, বন্ধু ওই কলেজে পড়তেন, আমার সবে পাখা গজিয়েছে এবং নিজেকে আঁতেল মনে করতে শুরু করেছি, তাই কাঁধে ঝোলাব্যাগ নিই এবং সে-ব্যাগে বোতল রাখি / রেখেছিলাম এবং 'সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা'-র খাতিরে প্রেসিডেন্সির ফেস্ট-এর প্রস্তুতিপর্ব কেমন হয়, সেটা চাক্ষুষ করার জন্য গিয়েছিলাম — এটি হল দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ স্মৃতির 'প্রসঙ্গ' বা 'কনটেক্সট'। এবার ফিরে আসি সেই টিটি টেবিলের কথায়, অর্থাৎ ঘটনাক্রমের বিবরণে — টিটি টেবিলের উপরে তিনটি চায়ের ভাঁড় রাখা হয়েছে, ভেটকি অত্যন্ত দায়িত্ব ও সহমর্মিতাবশত এগুলি জোগাড় করে এনেছে, কারণ আমি ক্যান্টিনে পা দেওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে সে বুঝে গিয়েছে যে আমি বহিরাগত, আমার ঝোলাব্যাগে মূলত আয়তঘনকাকৃতি বই-এর সাথে আরও এমন একটা-কিছু আছে যেটা বেলনাকার, এবং অভিজ্ঞতাসূত্রে, ফলত আমার এবং আমার বন্ধুবরের অদূর ভবিষ্যতেই প্রয়োজন পড়বে একটু নিরালা জায়গা এবং পাত্রের — যার আগাম ব্যবস্থা নিতে তার বিলম্ব হয়নি। যাই হোক, এসব উদ-যোগের নিট ফল অবশ্য খুব-একটা কার্যকরী হয়নি। কারণ, কাঁপা-কাঁপা হাতে অতিউৎসাহবশত বোতলের ছিপি খুলতে গিয়ে প্রথমত সে ছিপির প্যাঁচটা কেটে ফ্যালে, পরে দাঁত দিয়ে সেটাকে খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে প্রতিহত হয়ে সেটাকে ঠুকে ভাঙে ও শেষে মাপের আন্দাজ করতে না পেরে বেশ কিছুটা তরল মাটিতে ফেলে ও অনেকটা সেই না-ভেজানো মাটির ভাঁড়ে শোষিত হয়ে শেষাবধি যেটুকু আমাদের ভিতরে পৌঁছোয়, তাতে আমোদের চেয়ে আফশোসই উৎপাদিত হয় বেশি — বিশেষত, হাত-খরচের জমানো টাকার এমন নিষ্ফল অপচয় দেখে! এটি হল, আমার ভেটকি-সংক্রান্ত স্মৃতির ভিসুয়াল কনটেন্ট বা স্মৃতির তৃতীয় উপাদান। এখন এই বর্ণনা ও তার পূর্বপ্রেক্ষিত থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে অভিজ্ঞতাটি অত্যন্ত সুখের না হলেও, অভিনব এবং বর্ণময়। আমি তো ওই বিশেষ স্থানে ও কালে বর্ণময়তার সন্ধান করতেই গিয়েছিলাম — আমার মনও তাই প্রস্তুত ছিল সেই ঘটমান বর্তমানের মধ্যে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বর্ণময়, তাকে শনাক্ত ও সংগ্রহ করতে। তদুপরি এসব ঘটে যাওয়ার পর যখন বন্ধুবর অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে আলাপ করিয়ে দেন — 'এ হল ভেটকি', তখন এই বিশিষ্ট চরিত্রের মুখশ্রী, ব্যবহার, বাচালতা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এই নামটি ওইদিনের এবং ওইসমস্ত ঘটনাপরম্পরার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে দাঁড়ায় — স্মৃতির গুরুত্ব নির্বাচনের জন্য যে-পরিমাণ অভিঘাত প্রয়োজন হয়, সম্ভবত সেই মাত্রায় পৌঁছোয়। কে জানে, ভেটকির নাম 'ভেটকি' না-হয়ে 'অনির্বাণ' হলে, আদৌ তা মনে রাখা যেত কিনা।

এসবের পরেও আরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কুড়ি বছর আগে বা ওইসমস্ত সময়ে আমি কি আর-কোনো বর্ণময় চরিত্রের সাক্ষাতে আসিনি? তাদের আটানব্বই শতাংশের কথা তো আজ আর মনে নেই! আমার জীবনে গুরুত্বের বিচারেও ভেটকির প্রভাব নগণ্য, এমনকী নেই বললেই চলে — শয়নে-স্বপনে-জাগরণে এতদিনে যে কখনো তার প্রসঙ্গ সক্রিয়ভাবে স্মরণ করেছি, বলা যাবে না তা-ও — কিন্তু মনে করিয়ে দিতেই, সমস্ত ভিসুয়ালটাই হুড়মুড়িয়ে মাথার মধ্যে চলে এল কী করে? কেন? নিশ্চিতভাবে এর অন্যতম কারণ 'অ্যাসোসিয়েশন'। আমি হয়তো সজ্ঞানে ভেটকিকে নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিনি আজ উনিশ বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন হল, কিন্তু এর মধ্যে ভেটকির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, ব্যক্তি ও বিষয়, যা ওই মোলাকাতকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল — ওই ঘটনার মধ্যে উপস্থিত উপাদানগুলি, যেমন বন্ধু / বন্ধুত্ব, বোতল, বই, কলেজস্ট্রিট, কলেজ ও পঠনপাঠন, ব্যাগ, বহিরাগত, ভাঁড়, বঙ্গসংস্কৃতি, আমোদগেঁড়েমি ইত্যাদি — এবং ওই ঘটনার পরবর্তী আরও বিবিধ ঘটনাবলি যেখানে সরাসরি বা পরোক্ষে ভেটকি বা ভেটকির সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় এমন কোনো বিষয়ের চর্চা হয়েছে বা তির্যক উল্লেখ এসেছে — সেগুলো সবই ওই মোলাকাতের স্মৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করার সক্ষমতাবশত কোনোভাবে সেই স্মৃতিকেই মস্তিষ্কের আরও গভীরে প্রোথিত করেছে। এরই পাশাপাশি বঙ্গসংস্কৃতির খাসতালুকে গিয়ে ভেটকি-সন্দর্শনের যে ক্লোজার — মানে, জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়ে গেল (তখন মনে হয়েছিল) — টিক মেরে দিলাম — পরে যখন দাদারা জিজ্ঞেস করবেন, তখন পিছিয়ে পড়তে হবে না — এই যে নিশ্চিন্ততা, নিজেকে নম্বর দেওয়ার আত্মপ্রসাদ, এ-সবই মিলেজুলে আমার মধ্যে 'ভেটকি' ও তাকে চেনার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে, আমার অজান্তেই। বস্তুত মনে হয়, ভেটকিকে উপলক্ষ করে আমার মস্তিষ্ক মনে রেখেছে আমাকেই — ধরে রেখেছে আমার জীবনের একটি বিশেষ সময়কালের একটি স্ন্যাপশট — যাকে অস্বীকার করলে বা ভুলে গেলে হয়তো ছেদ পড়ে যেতে পারে আমার স্মৃতি-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার বিন্যাসে — যেভাবে মাছধরার জালে একটি সুতো কেটে দিলে, প্রথমে ছোটো, পরে বড়ো-বড়ো মাছ জাল থেকে বেরিয়ে যায়, আর শেষাবধি জালটাই হয়ে পড়ে অনর্থক! আবার এমনও হতে পারে যে এই ভেটকি-স্মৃতির আড়ে আমার মস্তিষ্ক লুকিয়ে রাখছে কোনো প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপ্রিয় স্মৃতি — অর্থাৎ এমন কোনোকিছু, যা ঘটেছিল এই সাক্ষাতের সমসময়ে বা একটু আগে-পরে, যেটাকে উপরিতলে আসতে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়, তাই এই আপাত-নিরীহ স্মৃতিটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, যাতে তার আগে-পরে কী আছে বা ছিল, তা নিয়ে বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানো না হয় — হয়তো কোনো আশা বা মোহভঙ্গ হয়েছিল — অথবা নিজেকেই জেনেছিলাম কোনোভাবে, যেটাকে মানতে পারি না আজও।

মোটের উপর বিষয়টা এই দাঁড়ায় যে ভেটকিকে যদি আপনি না চেনেন, তাহলে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কারণ যাঁরা বলবেন, যে তাঁরা ভেটকিকে খুব ভালোভাবে অথবা হাড়ে-হাড়ে চেনেন, তাঁরাও যে খুব সক্রিয়ভাবে বা জেনে-বুঝে তাকে মনে রেখেছেন, তেমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

একটি ঘণ্টাখানেকের খননপ্রক্রিয়া

রণিত চক্রবর্তী

না, ভেটকিকে আমি অন্য অজস্রদের মতো একেবারেই চিনি না। তবে কোনো এক তারুণ্যের আচম্বিত সুরাসফরে অথবা কলেজস্ট্রিটের ঘোষিত প্রতিভাগোষ্ঠীর অনাগত স্টার জলসায় কেউ আলাপ করিয়েছিল। ঘণ্টাখানেকের অভিঘাত তারপর তার সাথে, তাহার সাথে আর দেখা হয়নি।

দেখেই চমকে উঠেছিলাম। অতিসাধারণ অথচ বেশ রোমাঞ্চকর, কার সাথে খুব মিল অথবা কারো সাথে কোনো মিল নেই। বেঁটেখাটো, টাকমাথা, ছানা-ছানা জলকাটা ঘষা চশমার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্যারাবলিক চোখের একদৃষ্ট তুঙ্গভদ্রার বুকে উলটোনো ভেলার মতো মণির মারাত্মক অন্তরাত্মা শুষে-খাওয়া চাহনিতে আমাকে সেদিনের বিকেলের পড়ে-পাওয়া নেশা ভেবেছিল হয়তো। এভাবেই নতুন যাকে যখন দেখে তাকে স্যালিভায়িত চেখে নেয়।

শোনা গেল এ প্রণালীতেই অমাতাল অথচ মৌলিক সুরার শ্রেণিবিভাগে অবিশ্বাসী হয়ে চেখে এসেছে আবহমান। তাহলে কি অনেককালের কেউ! কিছুই তো জানি না তার। নামকরণে বিব্রত বোধ করে ভেটকি সে কখন হয়ে উঠল। কীই বা তার প্রকৃত প্রস্তাবের বিবর্তনের ইতিহাস, ভূগোল, জ্যঁর, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব... কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে বুঝতে পারছি, গবেষণাপত্রে লেগে থাকা অক্ষম পিঁচুটি এর জন্য নয়, সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠার বিষয়ও সে নয়। তবু গবেষণা-লেখালেখি হয়ে ওঠার ভ্রান্তির খাদের ধারে দাঁড়ানো মালমশলা নাকি ছ-এর দশকের দুর্দমনীয় তুর্কিদের মতো এরও ছিল, শুনলাম। শুধু

প্রতিভাজীবিতার রসায়নে বারবার এক্সপ্লয়েটেড অধঃক্ষেপ হয়ে গেছে। তাই কি 'শোষিত', 'বঞ্চিত'-র ডায়ালেকটিক্‌সে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সমাহিত সিদ্ধার্থ। মুখে সুজাতা-দেখা ফিচেল হাসি নিয়ে হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য ভেবে-ভেবে দ্রষ্টাপুরুষ। অথচ নাশকতার মধ্যেও গুছিয়ে বসে যারা বীজবপণ করে গেছে তাদের মতো কিছুই কি পেয়ে বসেনি কখনো! জানি না, হয়তো হয়েছে। পাড় থেকে কখনো কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে স্রোতে চুবিয়েছিল। তারপর থেকেই নাকছাবি স্থির, তদ্গত; শুধু নাসারন্ধ্রের বদলে যাওয়া। কাহিনির জন্ম। কিন্তু এসব হলে কী হবে, মুনিঋষির স্থবিরতা নেই। ভীষণ ক্ষিপ্র। দোলমঞ্চে সবসময়ই উত্তেজনা। কে একজন দু-জন অন্যস্থানে চলে যাচ্ছে তো অন্যপাঠের স্থানাঙ্কবদলের মতো তার বা তাদের হাত ধরে বাধ্য পোষ্যের মতো উঠে গেল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। তারপর আরও একজন। ফিরে এল দলে, আবার বসল নতুনের সঙ্গে। টুকটাক কথা, শোনা বেশি, অপরিচিতের স্তরায়ণকে মেপে নেওয়া, ত্রৈলোক্যবাবুর ডমরু-চরিত থেকে উঠে এসে এখুনি সে কখনোই কুমিরের পেটে বসে অলৌকিক আত্মজৈবনিক বেগুনটা বেচবে না।

ভেটকি কি তাহলে চেতনাপ্রবাহের স্রোত। নাকি মেধাপ্রণালীর বহমানতার কালচারাল কাউন্টারপয়েন্ট। জীবনযাপনের স্থানীয় মিথ করে তোলাই যায়, কিন্তু কোথায় একটা আটকায়। ভীষণ জ্যান্ত। অস্বস্তির মতো। জেতা-হারার মাঝখানে দাঁড়ানো ব্রুসলিগণ নেচে-কুঁদে সেই স্তরায়িত আয়নায় একটার পর একটা নিজের ছবি দেখতে পাচ্ছে, অথচ অনিমিখ এক ড্রাগন তাদের মগ্ন সরলতায় লক্ষ করছে। লোকটাকে চিনতে পারছি মনে হচ্ছিল আস্তে-আস্তে। প্যারির বিখ্যাত মুলা রুজ-এ প্রায় একশো বছর আগের পানপাত্রসহ একটা টেবিল-চেয়ার। বসে আছেন সদ্য আত্মপ্রতিকৃতির খসড়া এঁকে ফিরে আসা তুলুজ লোত্রেক। একটু পরে ঈষৎ বেসামাল বেরিয়ে যাবেন। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা পেরিয়ে বইপাড়ার এ-গলি ও-গলি ঘুরে সংলগ্ন ফুটপাথে খসড়া ছাড়াই শীতরাত্রের মধ্যে গনগনে আঁচে শুয়ে শিখার রুমাল নাড়বেন। ভোরের প্রথম মানুষটিকে মুখ ভেটকে বলে উঠবেন — ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন, ভেটকি ছিল কিনা।

যে ছিল বন-মাঝে

সুমিত দাশ

'কলেজস্ট্রিট মোড় থেকে কফি হাউস পৌঁছোতে একজীবন সময় লাগে।' প্রশ্নকর্তার কৌতূহল আলটপকা হলেও, ঠোঁট-ছড়িয়ে হেসে ফেলার আগে, ভেটকিদার উত্তরে আড্ডার কেউ তাজ্জব বনে যায়নি। কেবল বেগতিক ছিলাম আমি। মানে? কে যেন উত্তর দিলেন, কলেজস্ট্রিট টু কফি হাউস = এক ভেটকি।

একদিন কাকভেজা এক পশলার পর মোড় থেকে বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে গন্তব্য কফি হাউস। চেনা বইওলা আওয়াজ দিতেই চশমার মধ্যে খলবল করে উঠল কবেকার চোখ। খালাসিটোলা বলে ওঠে — 'শালা পেঁচি মাতাল, পাঠ বেচে পাঁঠাজন্মের প্রায়শ্চিত্ত করছ!' ফুটপাথ-সমকাল-আকাল-মাকালের পাশ কাটিয়ে ভেটকি পৌঁছোলেন কফি হাউস। এই সিনের দৈর্ঘ্য ১০ মিনিট। সময়টা ডিসেম্বর, ২০০২।

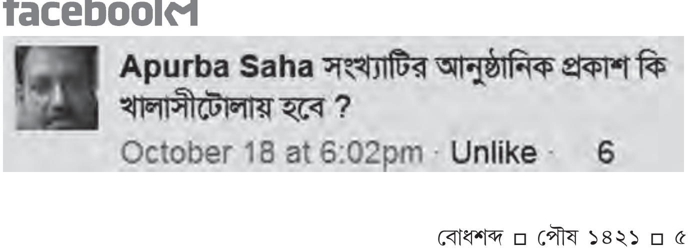
কলকাতায় পাকাপাকি চলে আসার আগে যা ছিল, তা ছিল। পরে মনে হল, কলেজস্ট্রিট আদপে একটা অরণ্য। প্রজাতি আর প্রজন্মের নানান পাল। বিভিন্ন বাঁচা। কবেকার কলকাতার উদ্গিরণ আর সমকালের দিনকেলি। অ্যালবার্ট হলটায় ভূপেন দত্তরা গোপনে বিপ্লব খুঁজতেন। আজও আইবি-র লোকজন সকাল-সন্ধ্যা চোখ ঘুরিয়ে যায়। একদিন এক বিরল প্রজাতির আইবি দেখতেই ভেটকিদা বলে উঠলেন — 'কী খুঁজছিস রে শালা? এই তো আমি সরোজ দত্ত।' আমাদের হাসি আর থামে না। ভেটকিদা বলে চলেছেন — 'সরোজ দত্ত চেনে না। সুভাষ মুখুজ্জে চেনে না। কবি না অফিসিয়াল লেফ্‌ট মাইরি! সুভাষের কবিতা ছাড়া বাংলার বামপন্থা হচ্ছে না, হবে না। সব ফেক মাল।'

কফি হাউসের সিঁড়িতে পা দিলেই বোধহয় চলা খানিক বদলে যেত। দূর থেকে পছন্দের দঙ্গল খুঁজে সটান টেবিলে হাজির হতেন। একদিন ছোটো চেহারাটা সেঁধিয়ে বাঁ-হাত চেয়ারের কাঠে রাখলেন। জর্দাপান আর বাংলার বিচিত্র গন্ধে কফিও কাবু। চোয়াল বেয়ে নেমে আসা পানের পিকে জামাটিও রঙিন। যেন এসে বসলেন ওয়াজেদ আলি স্বয়ং। মাঝে-মধ্যেই শুনতাম, তিনি প্রেমে পড়েছেন। আর যদি কোনো টেবিলে তাঁর সদ্য প্রেমিকাটি অতীত হওয়ার আগে থাকতেন — তাহলে হামি ছেয়ে যেত মুখমণ্ডলের সমস্ত পেশিতে। গল্পে-গল্পে নেমে আসতেন বিস্মৃত বীর-বীরাঙ্গনারা। আর আমাদের মিসিং-লিঙ্কে জুড়ে যেত অব্যর্থ সত্তর দশক। নানান মাইলস্টোনে ঠায় দাঁড়িয়ে শক্তি চাটুজ্জে। তখন কফি হাউস চাইলে বা না-চাইলেও ঠেস ছেড়ে চেয়ারে সটান দাঁড়িয়ে বলেই চলেছেন হয়তো —

> আসলে তুমি ক্ষুদ্র ছোট, ফুলের মতো বাগানে ফোটো —
> বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো, ভূতের মতো দেখায়!

জন-অরণ্যটা আজও আছে। প্রজাতি ও প্রজন্মের বিচিত্র মিশ্রণে আজও পিছু ফেরে কলেজস্ট্রিট। যাদবপুরে কলরব হলে, দোহারি দেয় প্রেসিডেন্সি। ছাত্রমনের ফিসফিস পোস্টার হয় অবলীলায়। ২০০৫-এর জুনে যাদবপুরে মধ্যরাতে অনশনরত ছাত্রদের অকথ্য পুলিশি মারের পরদিন সকাল থেকে কলেজস্ট্রিট-কলকাতা-যাদবপুর একাকার। প্রেসিডেন্সির দলের সঙ্গে অতীতের মতোই ভেটকিদার প্রবেশ। ছোটো জটলা, বড়ো সভার নিবিষ্ট শ্রোতা — খবর জুটিয়ে রাখতেন। রোজ। যেন উত্তাল দিনগুলি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে ভবিষ্যতের সঙ্গে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের মিছিল পেরিয়ে ২০১৪-র লাখো 'বহিরাগত'-র ভিড় ভিজিয়ে দিল সেপ্টেম্বরের টানা বৃষ্টি। ভেটকিদা আসেননি। ভেটকি আর আসবেন না। জানি না, শহিদ হওয়ার পর দেওয়ালে কেউ লিখেছিল কি না — 'কমরেড ভেটকি — তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলব না'!

ভেটকিদার মৃত্যুর খবর পেতেই সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী বলে উঠেছিলেন — 'শালা, ভেটকিটাও চলে গেল! আটের দশকের গোড়ায় প্রেসিডেন্সির জিমে রীতিমতো র‍্যাগ দিতে আসত। দুলে-দুলেই বলত — পেশি যত বাড়বে, মগজ ততই হলহলে হয়ে যাবে রে!' হলহলে না হলাহল — জানি নে। যদি এক ভেটকি জীবনকাল উলটোদিকে যাওয়া যায়? রাত বাড়লে কলেজস্ট্রিট তো শিয়ালদা ফেরে। অনেকটা পিছু হেঁটে কেরানি বা বইওলার স্বপ্নে চে গেভারা। এই তো সেদিন, দেওয়ালে-দেওয়ালে শহর ছাড়ার ডাক দিলেন সিএম। আরও-আরও পিছনে — কয়েক যুগের পলেস্তারা খসে যায়। ক্রমাগত রং বদলায়। চিনি না সে কলকাতা। আমরা দেখি মাত্র। দেখাদেখির সরল-সরল অভ্যাসে মধ্যবিত্ত যা করে আরকী! স্রেফ দেখে। চেয়ে থাকে। মধ্যমেধা আর মধ্যবিত্ততা এককাট্টা হলে — অকারণ চোখ টেপাও হবে। চিত্তে তাহার দর্শন নাই। আমরা শুধু কথা বুনি। তথ্য দিয়ে তত্ত্ব সাজাই কফির কাপে। এক ভেটকি, দুই ভেটকি, তিন ভেটকি... কথকতার শেষে এবার নবাব ওয়াজেদ আলি বলেই উঠবেন — ছোড় চলো মথুরানগরী। কলিকাতা গল্প হলে, প্রমাদ গোনে কলকাতা।



নিজেকে সৎ মনে করি

সন্বিত পাল

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পেরিয়ে পোর্টিকোতে পৌঁছোনোর আগেই এক সন্ন্যাসী নানাভাবে আমাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। না, কোনো সম্মোহনী শক্তি দিয়ে নয়। তাঁর বিদ্যা-বিচার দিয়ে। কী কারণে তিনি আমাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে গৌণ। আমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া নিয়ে তাঁর মুখ্য যে আপত্তি ছিল তা হল, আমি নাকি তিন 'প'-এর দুই 'প'-তেই আটকে যাব। তৃতীয় 'প' গোল্লায় যাবে! প্রেম আর পলিটিক্সেই নাকি আমার প্রেসিডেন্সি-স্বপ্নের সমাধি ঘটবে। পড়াশোনা আর হবে না। তিন 'প' নিয়ে সতর্ক করলেও সমবর্গীয় 'ম' নিয়ে তিনি আমাকে কেন সতর্ক করেননি, জানি না। তবে সে 'ম' নিয়ে সতর্ক করার জন্য আমার অনেক সিনিয়র বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজেই ছিল। মদ-গাঁজার কথা ততদিনে বিস্তর শুনে নিয়েছি। মনে-মনে ভেবেও নিয়েছি — পলিটিক্স, প্রেম এবং মদ — কারো পাল্লাতেই পড়া যাবে না সেই তিন বছর।



কিন্তু কোথায় কী! সেসবের আবাহন প্রেসিডেন্সির অলিতে-গলিতে। যারা আমাকে পলিটিক্স থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে এগিয়ে এল, বিপক্ষ শিবিরের 'সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের' মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এল, সেই সিনিয়রদের একজন প্রথম আলাপেই সিরিয়াস প্রস্তাব দিল। কোয়াড্রাঙ্গেলের এককোণে। লম্বা-লম্বা চুল, দু-চার দিনের না-কামানো দাড়ি, ঢুলু-ঢুলু চোখ, জিন্স আর টি-শার্ট। বলল, 'ভাই, ওদের খপ্পরে পোড়ো না। তোমার যদি ভালো কোয়ালিটির গাঁজা বা চরস লাগে, তাহলে কারো কাছে যেও না। আমার কাছে চলে এসো, পেয়ে যাবে।' না, কোনো ব্যাবসায়িক বিজ্ঞাপন নয়। নিছকই বন্ধুতার মুখবন্ধ। আমি তখন ওর ঢুলু-ঢুলু চোখের দিকে গোল-গোল চোখে তাকিয়ে আছি। এতগুলো কথা বলে নেওয়ার পর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের নাম বলছে তখন। বুঝতে পারছি, এর কাছে সত্যিই 'সাপ্লাই' আছে। ইতিমধ্যেই আমার ক্যান্টিনের ছাদ-দর্শন হয়ে গিয়েছে। ভাঙা কাচের বোতল অনেক না-দেখা গল্প বলে দিয়েছে।

'তার' এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও, তখনও দেখা হয়নি 'তার' সঙ্গে। হল, বেশ কিছুদিন পরে। সেই কোয়াড্রাঙ্গেলের পথেই। গোল মুখ, চ্যাপটা নাক, গোল চশমার ফ্রেমের ভেতর থেকে গোল-গোল চোখ বেরিয়ে আসছে। পরনে জিন্স এবং শার্ট। ওই বিস্তৃত ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে পানের পিক না লালা, কী বেরিয়ে আসছিল, মনে নেই। তবে একটা হাসি লেগে ছিল কোণে। হাত-মেলানোর মাঝে পাশ থেকে কেউ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, 'চিনিস তো... ভেটকি।' বিলক্ষণ চিনি। এ তো লেজেন্ডারি ব্যক্তিত্ব! খবরের কাগজেও এর নাম দেখেছি। কলেজে পড়তে আসার আগেই। শুনেছি, একটা চশমার দোকান আছে কলেজস্ট্রিটের কোথাও। আর, প্রচুর মদ খেতে পারে। জলের মতো নাকি মদ খায়। প্রেসিডেন্সিতেই ঠেক। মনে আছে, হাত ধরেই বলেছিল, 'আয় একদিন, বসি।' সেই প্রথম এবং সেই শেষ কথোপকথন। মাঝে-মাঝে দূর থেকে দেখা। পাশ দিয়ে গেলে আমার মুখে-লেগে-থাকা হাসির বিনিময়। সেই 'বসা' আর হয়নি। বসতে ইচ্ছেও হয়নি।

কেন বসব? মদের গ্লাস হাতে বসা। সারারাত মদ খাওয়া। বা, হয়তো সারাদিন। পিছন-উলটে নর্দমার পাশে পড়ে থাকা। আবার সকাল হলে বোতলের ছিপি খুলে বসে পড়া। সঙ্গে গাঁজার ঝিমুনি। সারাদিন। সঙ্গে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা। কবিতা, গান... এসব। এক অন্য জগতে ভেসে বেড়ানোর স্বাধীনতা। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি। কোনো ভালোবাসার সঙ্গিনী জুটে গেলে সে-ই নর্দমার পাশ থেকে তুলে নিয়ে আসবে। টেনে-টেনে নিয়ে আসবে বাস্তবে। ঝগড়া, কান্না, ভালোবাসা। কবিতা। অথবা সে সঙ্গিনীরও তুরীয় আসক্তি হলে সে-ও সারারাত গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকবে। নর্দমার পাশেই। এ এক অমোঘ আকর্ষণ। সদ-চিদ-আনন্দ লাভ আর কীসে হয়! রেডিমেড পথ থাকতে আর কীসের কণ্টকাকীর্ণ সাধনপথ?

তবু সে পথ মাড়ালাম না। কেন? মধ্যবিত্ত ভয়? নাকি, মধ্যবিত্ত মনের বিদ্রোহ? ভেটকির সঙ্গে বসার সাহস হয়নি কোনোদিন। পথ চলতে যখনই দেখা হয়েছে, এড়িয়ে গিয়েছি। পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছি। বেশি জানার চেষ্টা করিনি ওকে। মনে তখন একটাই চিন্তা গোত্তা খায়, অবসর-নেওয়া বাবার ঘাড়ে বসে বেশিদিন থাকা যাবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকে করে নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেই স্কিম অব থিংস-এ ভেটকির বাহুল্য পরিত্যাজ্য। ভাবতে চাইনি, একদিন মদ খেয়ে এমন মাতাল হব যে সেদিন আর বাড়িই ফিরব না। ভাবতে ভয় হয়েছে, নেশা করে বাড়ি ফিরে বাবা-মা-র প্রবল তিরস্কারের মুখোমুখি হব। কল্পনাও করতে চাইনি, ধীরে-ধীরে এমন নেশায় ডুবে যাব যে কেউ আর তুলে ধরার থাকবে না। তাই ভেটকিকে দূরে-দূরে রেখেছি। যারা ভেটকির চারপাশে থাকত, তাদের প্রথম-প্রথম অবাক দৃষ্টিতে দেখতাম। সবাই মেধাবী। কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে। অনেক আলোচনার আভাস পেতাম। কিন্তু সেখানেই খচখচ করেছে। কবিতা পড়তে গেলে, লিখতে গেলে, সাহিত্য-আলোচনা করতে গেলে কি এই বোহেমিয়ান জীবনটা একান্ত প্রয়োজন? যেমন, শিল্পী হলেই জিন্স-পাঞ্জাবি কি মাস্ট! ক্যান্টিনের পিছনের ট্যাঙ্কের সেই গোপন জীবন, গোপনই থেকে গিয়েছিল। নিজের ওপর বিশ্বাসে কমতি ছিল না। হয়তো সামান্য ব্যাপারই, কিন্তু তিন বছরের প্রেসিডেন্সির পথ চলতে, একদিনও গাঁজা আর মদ না-ছুঁয়ে কাটিয়ে দিতে, কম সাহস দেখাতে হয়নি। তবে, তাতে বন্ধু-সান্নিধ্য বিন্দুমাত্র কমেনি। তত্ত্ব, কবিতা, গানের আনন্দেও কখনো খামতি পড়েনি। জীবন নিজের মতো করে নিজেই উপভোগ করে নিয়েছে। সেখানে পা-পিছলে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। 'ক্যালকুলেটেড রিস্ক' নিয়ে জীবন ধাপে-ধাপে নিজের আকার পেয়েছে। এ-জীবনচর্যায় মনে হয় অনেক শান্ত-স্নিগ্ধ চিত্ত আছে একটা। কোনো আফসোস নেই। এখন ভাবতে বসে মনে হয়, ভেটকির সঙ্গে বসে পড়লে, মা-বাবার প্রতি হয়তো বড্ড অবিচার করা হত।

যারা বসেছিল, ভেটকিকে যারা ঘিরে রেখেছিল, তারা কি সবাই বন্ধুকৃত্য করেছিল? ভেটকির মনে কি শুধুই অনাবিল আনন্দ ছিল? মদ, আড্ডা, কবিতার পিছনেও নিশ্চয়ই ভেটকির একটা জীবন ছিল। সে জীবন কেমন ছিল, আমি জানি না। মনে কোনো দুঃখ ছিল কিনা, জানি না। তবে, যারা-যারা ভেটকির সঙ্গে বসেছিল, তারা এখন কোথায়? ভেটকির জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তারা সবাই সঙ্গত দিয়েছিল তো! নাকি, ওই কয়েক বছর ভেটকির সঙ্গ নিয়ে বা সঙ্গ দিয়ে যে-যার জীবনের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়েছে। এক-আধ বার পিছু ফিরেও বা দেখেছে কতজন? ভেটকি কিন্তু স্বখাতসলিলে ডুবেছে। 'শহিদ' হয়েছে। ওর জীবনধারণের রূপ দেখে ভাবতে অসুবিধে হয় না, শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত খুব সুখের ছিল না। সেদিক থেকে, আজ নিজেকে অনেক সৎ মনে করি।

ভেটকিদের আমি চিনি না। আজও কলকাতার রাতে, নৈশ-হুল্লোড় বাহিনীদের দেখলে অনেকটা ওই ভেটকির কথাই মনে পড়ে। এদেরও আমি অবাক হয়ে দেখি। দূর থেকে। অন্য গ্রহের প্রাণী মনে হয়। যেমন একদিন মনে হত ভেটকিকে।

পুনশ্চ : যে সিনিয়র বন্ধুটি কলেজের সেই প্রথম দিনগুলিতে 'সুলভে মদ-গাঁজা পাওয়া যায়' বলে প্রস্তাবনা করেছিল, সে আমার সামনে ব্যাডি-কোর্টে বসে এক ছিপি রাম খেয়ে পার্ট-টু রেজাল্ট দেখতে গিয়েছিল। এসে বলেছিল, 'যাক, ফার্স্ট ক্লাসটা হয়ে গেল!' সে এখন বিদেশে কর্মরত। একসময়ে সে-ও ভেটকির পিরিতের বন্ধু ছিল বলেই জানি।



পাঁচজন কবি
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৪



মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৩



বিভাব কবিতা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১২



কবির প্রথম বই
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১১



সৌজন্য সংখ্যা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১০



কবি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৯



কবি প্রবীর দাশগুপ্ত
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৮

আমি ভেটকিকে চিনি



বইমেলায় ভেটকি

রূপকথার নিষ্ঠুরতা

রাহুল পুরকায়স্থ

সিদ্ধার্থকে নিয়ে যে কোনো লিটল ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ সংখ্যা করা যায়, সে-কথা *বোধশব্দ*-র আগে একমাত্র সিদ্ধার্থই ভাবতে পেরেছিল।

সিদ্ধার্থ, আমাদের ভেটকি। একটুখানি আদর ও তরল মেশালে যা মাঝে-মাঝে ভেটকু হয়ে উঠত। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে কে যেন একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভেটকি কে? সন্দীপনদা বলেছিলেন, কফি হাউসে গিয়ে যাকে দেখে মনে হবে ভেটকি, সে-ই ভেটকি। এহেন ভেটকি লোডশেডিং-গ্রস্ত কফি হাউসের সন্ধ্যায় একটি সরু মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলে-টেবিলে ঘুরছিল। মোমবাতিখানি তার বুকের কাছে। ফলে ভেটকির গলা ও মুখমণ্ডল ছিল আবছা-আলোকিত। ভাস্কর বলে উঠল — কফি হাউসে প্রেতাত্মার প্রবেশ! মোমের আলোয় চকচক করছে ভেটকির চশমার ফ্রেম। আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। ভেটকি হাসছে। ওর পান-খাওয়া লাল দাঁতে কিড়মিড়-কিড়মিড়। বলল — ছবিটা কাউকে দিয়ে তুলিয়ে রাখ, না পারলে দুলুদাকে দিয়ে আঁকিয়ে রাখ। ভেটকি সংখ্যার প্রচ্ছদে ছবিটা ভালোই যাবে!

আমাদের যৌবনের কলকাতাকে একটু রঙিন করে রেখেছিল ভেটকি, একটু আলোড়িত।

ভেটকির সঙ্গে আমার পরিচয় এমনই এক রঙিন সন্ধ্যায়। বেকার হলে অনুষ্ঠান শেষে জয়দেব আর আমি গোলদিঘির ধারে একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, সান্ধ্য মৌতাত। এমন সময় দু-জনের কানে পালা করে একটিই জড়ানো গলা — কখনো বা চাঁদ ওঠে, কখনো বা মেঘ / ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে।

— আঃ, ভেটকি, একটু থামবি বাবা? জয়দেবের আলতো ধমক।

— কী হয়েছে! ভাস্কর শোনাচ্ছি শালা, তেঁতুল-জল, নেশা কেটে যাবে। আসবে এসব লাইন?

— এসব কবিতা শুনলে নেশা আরও চেপে ধরে। জয়দেব এবার একটু ঘোরে।

জয়দেবে খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না দেখে, ভেটকি এবার আমাকে ধরল।

— রাহুল, জয়দেব কী আবোল-তাবোল বকছে! তুই একমত?

— হ্যাঁ।

— তবে এখনই চল, তোদের আরেকজন কবির কাছে নিয়ে যাই। ভেটকি আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে চলল। কলেজস্ট্রিট বাজারের উলটোদিকে ট্রাঙ্কের দোকানের পাশ দিয়ে ওই বাড়িরই একতলায়।

— এই দেখ অমিতদা, সমরদা, সূর্যদা...

তুমিই আমার মেরুন রঙের এক্কা...। অমিতদা, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত আমাদের পূর্বপরিচিত। আসর জমজমাট। গান, কবিতা, তর্ক-বিতর্ক আর অফুরন্ত অর্থহীনতা ও সুখ। সেই রাতে আমার যাবতীয় পানব্যয় বহন করেছিল ভেটকি। প্রথম পরিচয়ের স্মারক! তারপর দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছরের কত গ্রীষ্ম-বর্ষা, কত আলো-অন্ধকার! বইমেলা, লিটল ম্যাগাজিন, কবিতাপাঠ, বন্দিমুক্তির মিছিল, বন্যাদুর্গত বাংলাদেশের জন্য ত্রাণতহবিল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ কর্মকার, শৈবাল মিত্র, দরগা রোড, কলাবাগান,

ঠাকুরনগর, খালাসিটোলা, গেদে লোকালের পিকনিক... কোথায় নেই ভেটকি! শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরের দিন বাংলা আকাদেমির গেট ধরে শোকে উন্মাদপ্রায় ভেটকির কান্না কখনো কি ভোলা যায়!

পারিবারিক চশমার দোকানে সকালের দিকে বসত ভেটকি। দোকানে একটি ছোটো সিন্দুকও ছিল। ওই সিন্দুক থেকে এক বৃষ্টির সকালে ভেটকি অবলীলায় বের করে আনল বোতল-দুই দেশি আর একটা লাল-মলাটের খাতা। খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। খাতার প্রথম পাতাতেই বড়ো-বড়ো হরফে লাল কালির লেখা — 'এবার শালা তোকেই খাবো'। খাতায় বিভিন্ন কবির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা। ঠিকানার নীচে সেই কবির কাব্যগ্রন্থের তালিকা বা কবিতার পঙ্‌ক্তি। ভেটকি বলল — তোর ঠিকানাটা শুধু যেকোনো একটা সাদা পাতায় লিখে দে। পাতা ওলটাতে গিয়ে খাতা থেকে একটা সাদা-কালো পোস্টকার্ড ছবি মেঝেতে পড়ল। ভেটকি নিচু হয়ে তুলতে-তুলতে বলল — সুখলতা, খুউব ভালো রেজাল্ট, এখন গুজরাটে। ছবিটা আমাকে দেখতে দিল। তারপর খাতা থেকে চার-পাঁচ পঙ্‌ক্তির তিনটি কবিতা শোনাল। জানতে চাইলাম, কবিতাগুলি ওর লেখা কিনা। ভেটকির রহস্যহাসি! হাসতে-হাসতেই — সুখলতারও হতে পারে। ভেটকি কবিতা লিখত, ওর একটি কবিতাপুস্তিকার কথাও শুনেছি। ওর প্রিয় কাব্যগ্রন্থ কত তরুণ-তরুণীকে যে উপহার দিয়েছে!

কবিতা শোনানোর মাসখানেক পর। আমার আপিস তখন পার্কস্ট্রিটে। এক শনিবার দুপুরে হঠাৎ ভেটকি! ছুটি নিয়ে নে, চলে আয়, অলিপাবে ওয়েট করছি। পৌঁছে দেখি চাঁদের হাট! অমিতাভদা, পৃথ্বীশদা, শৌভিক চক্রবর্তী, ভেটকি, আর এক-দেখাতেই চিনতে পারা সুখলতা! আসর মাঝআকাশে! একের পর এক ন্যাপকিনে ছবি এঁকে চলেছেন দুলুদা, অমিতদা আর সুখলতা একের পর এক রবি ঠাকুরের গান। ভেটকির হেড ডাউন, দাঁত কিড়মিড়, মাঝে-মাঝে মাথা তুলছে — সুখী... সুখী... সুউখ, আমার কেটি অনেক ভালো। সেদিন, কিছুক্ষণ পরেই হাতে-টানা রিকশায় শৌভিক আর ভেটকি প্রিয় কেটির, খালসিটোলার দিকে চলে যাবে, অমিতাভদা ঝোলা থেকে বের করবেন নতুন কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, দুলুদা সুখলতার শাড়ির আঁচলে আঁকবেন বাঘ!

— আপনার নামটা খুব সুন্দর, সুখলতা, কে রেখেছেন?

হাসি, দু-গালে টোল, আমাদের লাজুক কবিতা!

— রাহুল, এই নামটা যিনি রেখেছেন, একমাত্র তিনিই এই নামে ডাকেন। ভেটকিদা।

ততক্ষণে দুলুদার বাঘ আঁকা শেষ। বাঘের নীচে লিখে দেবেন, তুমি তো আর বাঘ নও, বাঘিনী, বাঘিনী সুখলতা।

এ-সবই আজ রূপকথামতো। মনে পড়ে, *রূপকথার নিষ্ঠুরতা*, তুষার চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ। মনে পড়ে, তুষার চৌধুরী। নিষ্ঠুরতা! এইসকল সময়যাপন, এই লেখার সময়যাপন যাদের সঙ্গে, তারা কেউই আর নেই। এ-পৃথিবী মৃতদের, জীবিতেরা ছলে / বশীভূত করে রাখে স্মৃতির তামাশা! আমার এইসব স্মৃতিরও অপর কোনো সাক্ষী আজ নেই, ফলে আমার লেখা আমাকে সন্দেহ করছে। রূপকথা! নিষ্ঠুরতা!

এসেছিল অন্য গ্রহ থেকে

মৃদুল দাশগুপ্ত

কোথায় ভেটকির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, সে বিষয়ে মনে ধোঁয়াশা রয়েছে। কলেজস্ট্রিটের রাস্তায় বা কফি হাউসে হতে পারে। তবে কলেজস্ট্রিট কফি হাউসেই সখ্য হয়েছিল, সেটা ঠিক। কফি হাউসে গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকটায় যখন নিয়মিত দেখা হত, তখন মনে হয় যে, একে আমি কয়েক বছর আগে অর্থাৎ আশির দশকের গোড়ায় দেখেছি।

সেসময় আমি *যুগান্তর*-এ কাজ করি। *যুগান্তর*-এর বাগবাজার অফিসে আমি ১৯৮১ সালে যোগ দিই। দু-তিন বছর পর *যুগান্তর* অফিসটি নোনাপুকুরে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। *যুগান্তর*-এ নানারকম সময়ে আমাকে কাজে যেতে হত। সংবাদপত্রটির ডাক সংস্করণের জন্য যেতে হত সকাল ন-টা নাগাদ, ছুটি হত বেলা তিনটেয়। আমি নোনাপুকুর থেকে ট্রামে ধর্মতলায় গিয়ে হাওড়ার বাস ধরতাম।

ওইরকম একদিন ট্রামে ধর্মতলা যাচ্ছি, কেটি অর্থাৎ খালাসিটোলার সামনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার নাম ধরে ডাকেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এভাবে ডাক, যাঁরা জানেন, জানবেন মানুষের ভিড়ভাট্টার যাবতীয় কলরবভেদী, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণকুহরে তা ধাক্কা দিতই, আমি ট্রাম থেকে নেমে পড়ি। নেমে দেখি শক্তির সঙ্গে রয়েছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কেটির ভেতরে ঢুকে দেখি বেশ বড়োসড়ো দল। রয়েছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, ডা. কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মিত্র; বাকি যাঁরা, তাঁরা আমার অচেনা। এঁদের ভেতর আশ্চর্য-দর্শন একজন। একেবারে গোলাকার মুখ, গোল-গোল দু-টি চোখে বেশ পাওয়ারের ডাঁটি-ভাঙা চশমা, খর্বকায়, গালে খোঁচা-খোঁচা কয়েক দিনের দাড়ি; নচেৎ বালক মনে হত। বিচিত্র হাসি তার মুখে যেন ফিক্সড। দাঁতগুলি পান-জর্দার প্রলেপে যা হয়, তেমন। সেখানে কেটি-র ওই পানোল্লাসের দিনটিতে বিচিত্র-দর্শন ওই যুবকের সঙ্গে আমার তেমন কথাবার্তা হয়নি।

(সুনীল মিত্র ও ডা. কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত এক-দু-লাইন পরিচিতি এখানে দেওয়া দরকার। সুনীল মিত্র শ্রীরামপুরে ইএসআই হাসপাতালে কর্ম-হেতু আমৃত্যু কয়েক বছর ছিলেন আমাদের শহরে। ওই কয়েক বছর আমাদের শহরখানি ছিল রঙিন। *বিভিন্ন কোরাস* নামে একটি ছোটোপত্রিকা সম্পাদনা করতেন সুনীল মিত্র। তাঁর সম্পর্কে *রূপকথার রাজকুমার* নামে আমি একটি লেখা লিখেছিলাম *কবি সম্মেলন* পত্রিকায়, লেখাটি আমার *সাত পাঁচ* গ্রন্থে রয়েছে। সাহিত্য অনুরাগী ডা. কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইরানের শাহ-এর চিকিৎসক। খোমেইনির ইসলামি বিপ্লবের সময় দেশে ফিরে আসেন। তিনি পঞ্চাশ দশকীয় লেখক-কবিদের বন্ধু ছিলেন। ইএসআই-এর উপদেষ্টা-চিকিৎসক হিসেবে তিনি মাসে দু-একবার শ্রীরামপুর ইএসআই হাসপাতাল পরিদর্শনে আসতেন।)

তাহলে ভেটকির সঙ্গে আমার কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল, তা নিয়ে আমার মনে ধন্দ রয়েছে। কলেজস্ট্রিটের রাস্তায় বা কফি হাউসে যখন ওর সঙ্গে আমার আলাপচারিতা শুরু হয়, তখন আমি ভেবেছি, একেই আমি দেখেছিলাম কেটি-তে। দর্শনে সে এমনই ছিল আকর্ষণীয়, যিনি ওকে দেখেছেন, তিনি ওর চেহারা ভুলবেন না।

এখানে একটু বলা দরকার। সত্তর দশকের প্রথম কয়েক বছর কলেজস্ট্রিট ও কফি হাউসে নিয়মিত আমি যাতায়াত শুরু করলেও, ১৯৭৮ সালে *পরিবর্তন* পত্রিকায় যোগদানের পর প্রায় বছর পাঁচেক আমি কলেজস্ট্রিট যাইনি। ১৯৮৫-৮৬ সালে আবার কফি হাউস যাতায়াত শুরু করার সময়ই ভেটকির সঙ্গে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ। একেবারে প্রথম আলাপ থেকেই ভেটকি আমাকে 'তুই' বলত, আমিও। নতুন কোনো কবিতা লিখেছি কিনা প্রশ্ন করত, আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে, ও বলত, পড়। টেবিলে একসঙ্গে অনেকে বসলে ভেটকি নিজে কিছু বলত না, কিন্তু আলোচনার সময় ওর কান দু-টি হয়ে উঠত উদ্‌গ্রীব, কানে হাত দিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিত বক্তার দিকে, চোখে-মুখে ফুটে উঠত কৌতূহল, মনে হত ও এসেছে অন্য গ্রহ থেকে। যাঁরা লেখালিখি করেন, লিটল ম্যাগাজিন বের করেন, সবার খোঁজখবর রাখত ভেটকি। নানারকম উপকার করত। কলেজস্ট্রিটে সর্বত্র চরকির মতো সারাদিন ঘুরত ভেটকি। কেউ কাউকে খুঁজছেন, কেউ কোনো বই-এর খোঁজ করছেন, সবরকম হদিশ বলে দিত ভেটকি। একটা লেখা অমুক সম্পাদককে পৌঁছে দিতে হবে, তিনি সেদিন আসেননি, লেখাটি ওই সম্পাদকের হাতে দিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিত ভেটকি। কলেজস্ট্রিটের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ওকে ভালোবাসত। কাঁচুমাচু প্রেমিকা খুঁজে পাচ্ছে না প্রেমিককে। ঠেক থেকে হিড়হিড় করে টেনে এনে খর্বকায় ভেটকি লম্বু প্রেমিকটিকে কফি হাউসের দোরগোড়ায় অপেক্ষারত প্রেমিকার হাঁটু বরাবর নত

করিয়ে দিত। মহাত্মা গান্ধি রোডে ভেটকির চশমার দোকানেও আমি গেছি। ও দোকান ফেলে কলেজস্ট্রিটে ঘুরত।

একবার হয়েছিল কী, আমরা সেবার 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'-র প্রথম সম্মেলনের (কৃষ্ণনগর) উদ্যোগে দৌড়-ঝাঁপ করছি। 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'-র সংকলন প্রকাশে কাগজ কিনতে বৈঠকখানায় ঘোরাঘুরি করছি। প্রচ্ছদের জন্য পছন্দের কাগজটি কিনতে গিয়ে পাঁচশোটি টাকার ঘাটতি হল। আশির দশকের শেষার্ধের পাঁচশো — যথেষ্ট টাকা। তখন মোবাইল ফোন ছিল না যে বন্ধুদের জড়ো করে ফেলব টাকার জন্য। আমি আর গৌতম চৌধুরী ভাবছি, হঠাৎ ভেটকি যেন রাস্তা ফুঁড়ে সামনে উঠে এল। আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ শুনে ও বলল — পাঁচশো, আচ্ছা দাঁড়া। মিনিট পনেরো পর এসে ভেটকি বলল — শত জলঝর্না-র জন্য সাতশো টাকা চাঁদা তুলে ফেললাম প্রকাশকদের কাছ থেকে!

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শবযাত্রায় সে কী বুকভাসা কান্না ভেটকির! বিবিসি-র নাজেস আমাকে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ফরাসি টিভি-র মেয়েটি ভেটকির সাক্ষাৎকার নিল।

আর লিখতে পারছি না। এখন আমি সদ্য লেখা দু-একটা কবিতা শোনাব ভেটকিকে। তার আগে এই ভোর-রাতে দু-কাপ কফি তৈরি করে আনি? প্যাকেটে ঠিক দুটোই সিগারেট আছে। খাবি, ভেটকি?

আমাদের একটা ভেটকি ছিল! তোমাদের?

কমল চক্রবর্তী

হ্যাঁ, ভেটকি! চিনি না বলা মুশকিল, আবার চিনি। কারণ সে কে? কোথায় থাকে? কীভাবে থাকে? কী করে? অনেক প্রশ্নের। তাকে দেখেছি। অনেকবার। *পরিচয়*-এর আপিসে, কফি হাউসে, খালাসিটোলায়, *পরিচয়*-এর উলটোদিকের ব্যাঙ্কের গলিতে। বাড়ি বা গলি, না। স্ত্রী, পুত্র, না। আসলে আজ যদি মনে হয়, ওই নাম আমারই দেওয়া, কোন বিমূর্ত! যাকে ওইভাবেই। হ্যাঁ, হয়তো! হয়েছে। শেক্সপিয়ারে, রামায়ণ, মহাভারতে, উপস্থিতি। আজ মনে হয়, আমাদের চরিত্রে একটা সদাহাস্যময়, 'ইয়েসম্যান', দেখতে অনেকটা এয়ার ইন্ডিয়ার, 'মহারাজ'। ওই হল, ভেটকি। গদগদে, হাসি-হাসি, ঈষৎ মোটার দিকে, নাতি দীর্ঘ, একটু ভুঁড়ি, হাত-পা ঢলঢলে, চুল অনেকটা বিন্যস্ত, একটু পুরু ঠোঁট, একটু ভাসা চোখ। অনুজ্জ্বল জামাকাপড়। ঠিক বুক টান-টান নয়, ঈষৎ কোলকুঁজো। এবং অস্তিত্ব-সচেতন, নয়। আরও, যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গা ফুঁড়ে, উদয়। আরও, তাকে অনেকে চেনে, অনেক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক! আরও, কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। ছবি আঁকিয়ে বা নাটক / সিনেমার, দেখিনি। ঠেক, দিশি। ভেটকি! বয়স বা আয়ুরেখা জানি না। কী করে চিনেছি, জানি না। আমি যেমন ভাবছি, ভেটকি আমার একইরকম, অমিতাভ দাশগুপ্ত বা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ বাংলাবাজারে কোনো গ্রুপ ডি স্টাফও বলেনি — ও শালা বোর করছে।

খালাসিটোলায়। ওকে টাকা, ছোলা, বাতাবি ছাড়ানো, আলুসেদ্ধ, বিটনুন ছড়ানো, আলাদা করে, কাঁচালঙ্কা। এবং দেখায়, ওর উপস্থিতি, ওই পর্যন্ত। কারণ আমরা কেউ-কেউ গান গেয়েছি, কেউ-কেউ কবিতা, কেউ-কেউ পরবর্তী আক্রমণ ও আক্রান্ত কাহিনি। এমনকী ফিসফিস নয়, মেয়েমানুষের, কবি-মেয়েছেলের, ডিসেকশন। তাদের পাবার না-পাবার, তাদের সঙ্গে কীভাবে যৌন, কে-কে যৌনে, প্রায় জৈন দিগম্বর, ভেটকি, হুঁ, না, দেয়নি। আমাদের হাসি, শীৎকার, 'মা গো' ইত্যাদিতেও না। ও নির্লিপ্ত, পানে বা পরিবেশনায়।

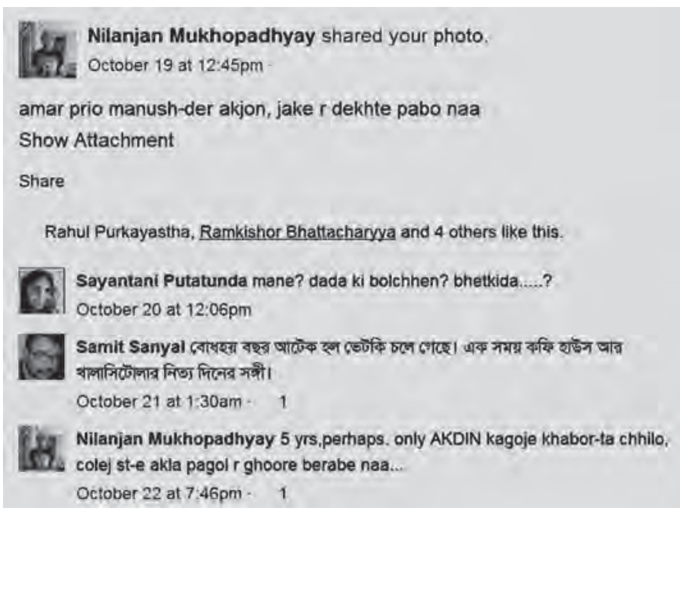
কফি হাউসে গুলতানি — অমিতাভদার সঙ্গে দেখা করনি? *পরিচয়*-এ গতকাল থেকে আসছেন। দশদিন বাইরে ছিলেন। বা নীচে সিগারেট, দুলুদাকে পরশুদিন কলাবাগানের ছেলেরা কেলিয়েছে। কলেজস্ট্রিট দিয়ে, ভেটকি — কফি হাউসে যাবে না! অনেকটা কি, যাত্রার বিবেক, না! আমার সঙ্গে ওর চলে বুঝল কী করে। বা আমি ওর উপস্থিতিতে, বিরক্ত হই না! আর দশটা অচেনা, অজানার মতো রহস্যহীন, বাস্তুচ্যুত, সাদামাঠা, নয়। সে ছিল প্রগাঢ়! গূঢ়! রহস্য মলমল। শেষ অবধি কোনো ঠেকে, না! ফলে তাকে শেষ বিদায়, বা বাড়ি যাবার সময়, আমরা যেমন — 'ও কে, তবে কাল দেখা হচ্ছে!' অথবা 'চল্লাম!' বা 'বাই-বাই'। আবার 'যাচ্ছি রে!' 'আসছি, হ্যাঁ!' ভেটকির ক্ষেত্রে মনে পড়ে না। কোনোদিন, খালাসিটোলা, আমরা! দুলুদা, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহন, চণ্ডী বা কেউ এক-আধজন, পোড়-খাওয়া বা ঝরা পাতা, পথভ্রষ্ট, ভেটকি রয়েছে। আবার সব ঠিকঠাক, আমরা নিবিড় গুলতানিতে, ও হাওয়া। ওর সঙ্গে কখনো শেষ মুহূর্তে ফেরা, না! বলিনি, বা জানতে চাইনি, অমিত কোথায়? বা কথা কিছু নেই। ও কাছে, এসেছে, ঘনিষ্ঠে, এবং খুবই অ-যৌন ফিসফিসে — অমিতদা, পূর্ণিমাকে নিয়ে ফুলিয়া কবি সম্মেলনে গিয়েছে। যেন এই খবর আমার পক্ষে। যেন আমি এসেছি এই বার্তা সংগ্রহে। ও এক অবিসংবাদিত, 'পাপারাজি', আমার চিরকালীন, ভেটকি।

বলা হয়নি, আবার আসিস! বা হয়নি, বাই-বাই! বলা হয়নি, ভালো থাকিস! বলা হয়নি, ঠিক আছে! বলা হয়নি, দেখা হবে! কিছুই, কোনোদিন! তবু খবর এল, নেই। কোনো-কোনো হাওয়ায়, শব্দে, মুহূর্তে 'পাপারাজি', কোনো-কোনো লগ্ন, তিথিতে। সে খবর দেয় — 'ভেটকি নেই'। ও, তাই নাকি! সেদিনই জিজ্ঞাসা করিনি, কী হয়েছিল? কীভাবে? কত বয়েস হয়েছিল? ও কি আসলে বাঙালি! আমার তো মনে হত, মারাঠি, গুজরাতি! কখনো ওড়িয়া, দু-একবার! তবে পাঞ্জাবি বা পাঠান, না। কখনো, সম্বলপুরিয়া বা ছত্রিশঘরিয়া! এক-আধবার যে আদিবাসী ভাবিনি তা নয়। কারণ, এত সর্বক্ষণ হাসতে, বাঙালি পারে না। সে, জিনের মতি, দুর্মতি। হাসি, বাঙালি মেয়েদের অহেতুক স্কুল-কলেজ ব্যাস, ছেলেদেরও। তারপর, ওই। ভেটকি, সেভাবে অ-বেঙ্গি।

কখনো ওকে টা-টা বাই-বাই, না। কখনো ওকে আসতে বা বসতে! 'দেখা হবে!', বা 'কথা হবে!' না। কখনো — অ্যা ভেটকি, এদিকে, তোর সঙ্গে কথা আছে রে! কফি হাউস!

— অমিতাভদা, তোমাকে খুঁজছিল!

facebook


Nilanjan Mukhopadhyay shared your photo.
October 19 at 12:45pm

amar prio manush-der akjon, jake r dekhte pabo naa
Show Attachment

Share

Rahul Purkayastha, Ramkishor Bhattacharyya and 4 others like this.

Sayantani Putatunda mane? dada ki bolchhen? bhetkida.....?
October 20 at 12:06pm

Samit Sanyal বোধহয় বছর আটেক হল ভেটকি চলে গেছে। এক সময় কফি হাউস আর খালাসিটোলার নিত্য দিনের সঙ্গী।
October 21 at 1:30am · 1

Nilanjan Mukhopadhyay 5 yrs,perhaps. only AKDIN kagoje khabor-ta chhilo, colej st-e akla pagol r ghoore berabe naa...
October 22 at 7:46pm · 1



ছবি : শমীন্দ্রনাথ মজুমদার; বোর্ডের উপর পেনসিল ও ইরেজার

ভেটকিবাবু

ভূমেন্দ্র গুহ

সবাই তাঁকে 'ভেটকি' বলত, আমি তাঁকে 'ভেটকিবাবু' বলতুম। তাঁর সোনার দিনগুলিতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। আলাপ হয়েছে তাঁর ও আমার দু-জনেরই বেলা-শেষে।

সদ্য বেকার হয়েছি, খ্রি. ১৯৯৪ ডিসেম্বর। যে-জীবনে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা বছর কাটিয়ে দিলুম, সে-জীবনে আর ফিরে যাচ্ছি না; কেন-যে, তা-ও স্পষ্ট করে জানি না। পরের কালে যে-জীবনের খপ্পরে এসে পড়ব, সুদূর দুঃস্বপ্নেও তারও কোনো হদিশ জোটেনি। একদিন রাণু মুখার্জি মহাশয়ার আর্ট মিউজিয়াম-এর সামনের চত্বরে সন্ধের দিকে কালীকৃষ্ণ গুহ মহাশয় করুণা-পরবশত আমাকে আলাপিত করে দিলেন প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন, বোঝা যচ্ছিল, তিনি কোনো একটা দুশ্চিন্তার কবলে পড়ে গিয়ে একটু নড়বড়ে হয়ে আছেন। তাঁর ছোটো জামাই-এর কী-একটা অপারেশন হবে আসছে-কাল, ছেলেটির কতই-বা আর বয়েস, কতদিন আগেই-বা তাঁর বিয়ে হয়েছে, রোগটা নাকি ক্যানসার! তা আমার কী, কথাটা যদিও ঠিক যে, বলতে গেলে এই গতকালও আমি রোগ-শোক সারাবার একটা পেশায় ছিলুম। তার পরের গল্পটা আর না বললেও চলে, প্রকাশ কর্মকারের ছোটো জামাই অপারেশনের খপ্পর থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু, আসল গল্পটা এই যে, সেদিন বিকেলে প্রকাশ কর্মকারের সহচর হিসেবে ভেটকিবাবু ছিলেন, প্রকাশ কর্মকার তাঁর স্বভাবত উচ্চকিত স্বরে ভেটকিবাবুর পিঠ-টিট থাবড়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ভেটকিবাবু ভালো কবিতা লেখেন, সেসব কবিতা তিনি আমাকে পড়াবেন; অধিকন্তু, চশমা নিয়ে আমার কোনো অসুবিধে হলে, ভেটকিবাবু ধন্বন্তরি! কবিতা নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না তখন আমার, কালীকৃষ্ণ গুহ প্রকাশ কর্মকারের খুব প্রিয় মানুষ, কালীকৃষ্ণ নামজাদা কবি, তাঁর সঙ্গী ছিলুম বলেই হয়তো আমাকে তিনি কবিতার-মানুষ বলে ঠাউরেছিলেন।

সেসময় আমি থাকতুম পার্কসার্কাসের দরগা রোড নামের একটা গলিতে, বাড়িটা ছিল বেশ পুরোনো, দোতলা; অনেক বছর থেকেছি সেখানে, সল্টলেক-এ নতুন একটা ফ্ল্যাট জোগাড় হল যখন, স্ত্রী-কন্যা সেখানে পাকাপাকিভাবে উঠে গেলেন, আমি চার দিন সল্টলেক, তিন দিন দরগা রোড করতে লাগলুম। বাড়িওয়ালা তুলে দিতে পারে, এতদিন যে-বাড়িটায় ছিলুম হাত-পা ছড়িয়ে খোলা-মেলা, চট করে ছেড়ে যেতে মন ওঠে না, এক উকিল-রুগি বুদ্ধি জোগালেন — কর্পোরেশন থেকে একটা ট্রেড-লাইসেন্স জোগাড় করে নিয়ে একটা চেম্বার-মতো সাজিয়ে বসুন, তুলতে পারবে না; দরকার হলে কোর্ট থেকে একটা হুকুম বার করে এনে দেবেন, যাতে তুলে দিতে না পারে। বললেন না শুধু, নিজে থেকেই করে দিলেন সব, মায় চেম্বার সাজানো; সাজাতে গিয়ে যে-চেয়ার-টেবিল-আসবাব লেগেছিল, তার দামটাই শুধু নিয়েছিলেন। ভাবলুম, যাক গে, ভালোই হল, উঠে যাওয়ার ভয়টা আর থাকল না, হয়তো দু-চার জন রুগিও জুটে যেতে পারে, এবং তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে দু-চারটে পয়সাও হাতে এসে যেতে পারে।

রুগিরা আসতে খুব একটা গা করলেন না (আমার হাতের সেই ঊর্ধ্বমুখী রেখাটা মোটেই জোরদার নয়, তা কোনো একজন বন্ধু-জ্যোতিষী আগেই বলেছিলেন; আর, জ্যোতিষী ও ডাক্তারি জিনিস দুটো কোন মানুষই-বা মোটামুটি না জানে!), পরিবর্তে অনেক অ-ডাক্তার সাহিত্যিক-শিল্পী বন্ধু ধীরে-ধীরে আমার জুটে গেল, বলতে গেলে কালীকৃষ্ণরই মধ্যস্থতায়, তাঁরা আমার পার্কসার্কাসের ডেরায় আসতে লাগলেন। যে ক-দিন আমি থাকতুম সেখানে, দয়া-পরবশতই, সমবয়েসি বন্ধুরা আসতেন, তাঁদের অনেকে তখনই যথেষ্ট বিখ্যাত, কবি অথবা শিল্পী অথবা মনস্বী; সিনেমা বানান, কবিতা লেখেন, আবার পুলিশের বড়ো অফিসারও; ছবি আঁকেন, সভায়-সমিতিতে বক্তৃতা দেন, কলেজে পড়ান; কচি-কাচারা ও তরুণরাও আসতেন, পুরুষ এবং নারী, তাঁদের কেউ কবিতা লেখেন, কেউ গল্প লেখেন, কেউ রবীন্দ্র সংগীত গান, কেউ-কেউ শুধুই এঁদের বন্ধু। এঁদের প্রায় সবাই প্রচুর ধূমপান করেন, নিষিদ্ধ খাদ্যসহ মদ্যপান করতে ভালোবাসেন, এক-একজনের এক-একরকম মদ্য পছন্দ, কেউ-কেউ একটু বেশিই পান করে ফেলেন, আর নিষিদ্ধ খাদ্যের এলাকা হিসেবে পার্কসার্কাস তো বিখ্যাতই। প্রকাশ কর্মকার সেই সুদূর বালি থেকে আসেন, যেদিন আসেন, সঙ্গে তাঁর দু-একজন শিষ্য থাকেনই, তাঁরাও প্রত্যেকে সুরা-অনুরক্ত মানুষ; প্রকাশের কন্যাও কোনো-কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আসেন, প্রকাশ তাঁকে একটু-আধটু মদ্য খেতে পিড়াপিড়ি করেন খুব, কিন্তু তাঁকে নরম করতে পারেন না; ভেটকিবাবুও প্রায়ই প্রকাশের সঙ্গে এসে পড়েন, তিনি মোটেই মদ্য-বিরাগী নন, পোশাকে-আশাকে এলোমেলো, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, কথায়-বার্তায় মোটেই চালাক-চতুর নন, একটু অগোছালোও, কিন্তু হৃদয়বান মানুষ, সহজেই বোঝা যায়। কেন-যে বিষ্যুদবার, জানা নেই, তবু বিশেষত বিষ্যুদবারের আড্ডাটা খুব জমজমাট হত।

তখনও আমি পুরোপুরি বেকার হইনি, হব-হব করছি। কালীকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন যে, বেকার হওয়ার পরে ব্যাবসা-বাণিজ্যে আমি খুব একটা সুবিধে করতে পারব না; সুতরাং বিনা-কাজের সময়টা কাটাবার জন্য একটা কিছু অকাজের-কাজ জোগাড় করে নেওয়া উচিত আমার। সেই কোন কালে বিগত শতকের পাঁচের দশকে একটা কবিতার পত্রিকা করেছিলুম, *ময়ূখ*, বছর ছয়েক চলেছিল, দু-চারটে কবিতাও লিখেছিলুম, সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই, একটা কবিতার পত্রিকা করার জন্য খুব তাতাতে লাগলেন কালীকৃষ্ণ, তিনি নিজে কবি, তাঁর পরামর্শের প্রবণতাটা স্বভাবতই তা-ই হওয়ার কথা। আলোক সরকার, উৎপলকুমার বসু ও প্রকাশ কর্মকার হবু পত্রিকাটার সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হতে রাজি হলেন, কালীকৃষ্ণ তো রইলেনই, কাগজ বেরোল, *দরগা রোড*, যেহেতু বেরোচ্ছে দরগা রোডের একটা ঠিকানা থেকে। কবিতার কাগজ, সুতরাং স্বাভাবিক যে, তরুণ কবিদের ভিড়টা এগিয়ে থাকবে। ধীরে-ধীরে এমন হল যে, প্রকাশ কর্মকার না থাকলেও ভেটকিবাবু একা এসেই হাজির হয়ে যেতেন। ভেটকিবাবুকে চিনতেন না, আড্ডায় এমন মানুষ কখনো আমি দেখিনি, অতএব ভেটকিবাবুর অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ থাকত না। এরকম সব আড্ডায় কারুর সঙ্গে নিরিবিলি কোনো কথা বলা যায় না, কেউ নিরিবিলি হয় না, কাউকে নিরিবিলি হতে কেউ দেখেও না — যাঁরা আসেন-যান, যাঁদের সঙ্গে মুখ-চেনা হয়, কথাবার্তা ঠাট্টা-ইয়ার্কিও হয়, আবার বছর খানেক দেখা-সাক্ষাৎ না হলে তাঁদের অনায়াসে ভুলেও যাওয়া যায়, চিনে ফেলেতে পাঁচরকমের রেফারেন্স খুঁজতে হয়। ভেটকিবাবুর সঙ্গে আমার এই আসরে নিকট-আলাপ হয়নি।

তাঁর সম্বন্ধে, অবশ্য পাঁচরকম খবর পাওয়া গেছে কথায়-কথায় পাঁচজনের কাছে। তিনি কবিতা লেখেন। হ্যারিসন রোডে দিলখুসা কেবিন-এর লাগোয়া ওঁদের একটা পারিবারিক চশমার দোকান আছে, ভেটকিবাবুর উপর এখন দোকানটার ভার, এককালে দোকানটা বেশ চালু অবস্থায় ছিল, এখন ভেটকিবাবুর হাতে পড়ে দোকানটার হাঁড়ির হাল। দোকানটার লোহার সিন্দুকে টাকার তাড়ার বদলে এখন কয়েক বোতল বাংলা মদ পাওয়া যেতে পারে, বন্ধুদের আপ্যায়ন করতে লাগে তাঁর। ভেটকিবাবুর পোশাক-আশাক প্রায় ট্রেড-মার্ক হয়ে গেছে, ক্বচিৎ কেউ একটু সেজে-গুজে থাকতে দেখেছে তাঁকে।

একদিন ভেটকিবাবুর দরকার হল আমাকে, হঠাৎ না বলে-কয়ে সোজা এসে হাসপাতালে হাজির হয়েছেন। এবার আমি আর ভেটকিবাবু মুখোমুখি হলুম, মাঝখানে কোনো ভিড়ের দেয়াল নেই। ডেভিড হেয়ার-এর তিনতলায় আমার ছোট্টো চেম্বারে ঢুকলেন এসে, বাইরে চপ্পল খুলে রেখে। আমি হা-হা করে বলে

উঠলুম, ‘মশাই, এটা কালীঘাটের মন্দির নয় যে জুতো খুলে ঢুকতে হবে, জুতো পা-এ রেখেই আসুন।’

ভেটকিবাবু আবার বাইরে গেলেন, পা-এ জুতো গলালেন, এলেন। বললুম, ‘বসুন।’

বসতে-বসতে বললেন, ‘পাড়ায় ফিরে এসে আপনার বাড়ির আড্ডাটার কথা বলাবলি করি কি-না, কী জম্পেশ, ছাড়ল না!’

বললুম, ‘কী ছাড়ল না!’

চেয়ারে বসে পড়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিতে-নিতে বললেন, ‘ওই আরকী! মেডিক্যাল কলেজ বলে কথা, এখানে কি এলাম আর দু-পাঁচ মাস ঘোরাঘুরি না করে ভর্তি হয়ে গেলুম, তা হয় নাকি! অথচ ব্যাপারটা জরুরি, এই আছে তো এই নেই, টাকা-কড়ির ব্যবস্থাতেও রাজা নবকৃষ্ণ দেব!’

‘তা ব্যাপারটা কী বলবেন তো?’

‘ওই হল আরকী! পাড়ার ছেলে-ছোকরারা ধরল এসে চেপে, খুব তো বাড়-ফট্টাশ মারেন, বাঁচান তো মানুষটাকে, কেমন পারেন? দৌড়টা বোঝা যাবে!’

‘মশাই, দৌড় আমার মোল্লার দৌড় মসজিদ, থুড়ি, দোকান অব্দি, বড়োজোর কফি হাউস অব্দি, সবাই জানে, তা নিয়ে আর খোঁটা দেবার কী আছে? তবু বলল তো! আঁতে বড়ো লেগে গেল। ভাবলুম, লোকটাকে তো একরকম নিরীহই মনে হয়, তার মানে কিছুটা বোকা-টাইপেরও, (কিছু মনে করবেন না!) গিয়ে দেখি না একবার।’

এবার একটু রেগে গিয়েই বললুম, ‘ভণিতা অনেক হয়েছে, ভেটকিবাবু, এবার আসল কথাটা বলে ফেলুন তো।’

একটু থমকে গেলেন ভেটকিবাবু, তারপর বললেন, ‘জানেন, মশাই, আমার কেউ হয় না, আমার চোদ্দো গুষ্টির কেউ নয়, চিনিও না ভালো করে, দু-এক বার দেখেছি-টেখেছি, কথাও হয়তো বলেছি, এই আরকী ‘কেমন আছেন, ভালো তো সব’ গোছের কথাবার্তা; কিন্তু এখন দেখছি-শুনছি, মশাই, পাড়ার ইয়ংস্টাররা ওঁর খুব ভক্ত — পাড়ার পুজো-টুজো, ফাংশান-টাংশান, খেলাধুলো, লাইব্রেরি, বসে আঁকো-টাঁকো — সবকিছুতে উনি আছেন। আমি, মশাই, এসব সাতে-পাঁচে থাকি না কখনো, সে আপনি ভালো বলুন অথবা খারাপ বলুন। রাইটার্স-এ সরকার মশাই একটা চাকরি করেন বটে, কিন্তু লাইব্রেরি-ক্লাব-ট্লাবের নানারকম বায়নাক্কাতেই মাইনের অনেকটা খরচ করে ফেলেন, সংসারে রোজকার-রোজ বাজার-খরচে টানাটানি চলতেই থাকে। তা, যার যেরকম স্বভাব, যার যেরকম ভালো লাগবে, করবে; তাতে আমার-আপনার কী!’

একটু অধৈর্য হয়ে পড়ে আমি বললুম, ‘তা আপনি হঠাৎ-যে কেন এসে পড়লেন, তা কিন্তু এখনও ভাঙেননি —’

‘সেটাই তো বলছি, আপনি কিছু করে উঠতে পারবেন কিনা, তা জানি না, না পারলেও আমি কিছু মনে করব না, সবই তো আর হাতের মোয়া নয়, আর সবাই তো আর জ্যোতি বসু-ও নন, সবারই লিমিটেশনস আছে, তবু এলুম, আঁতে বড়ো লেগে গেল কিনা!’

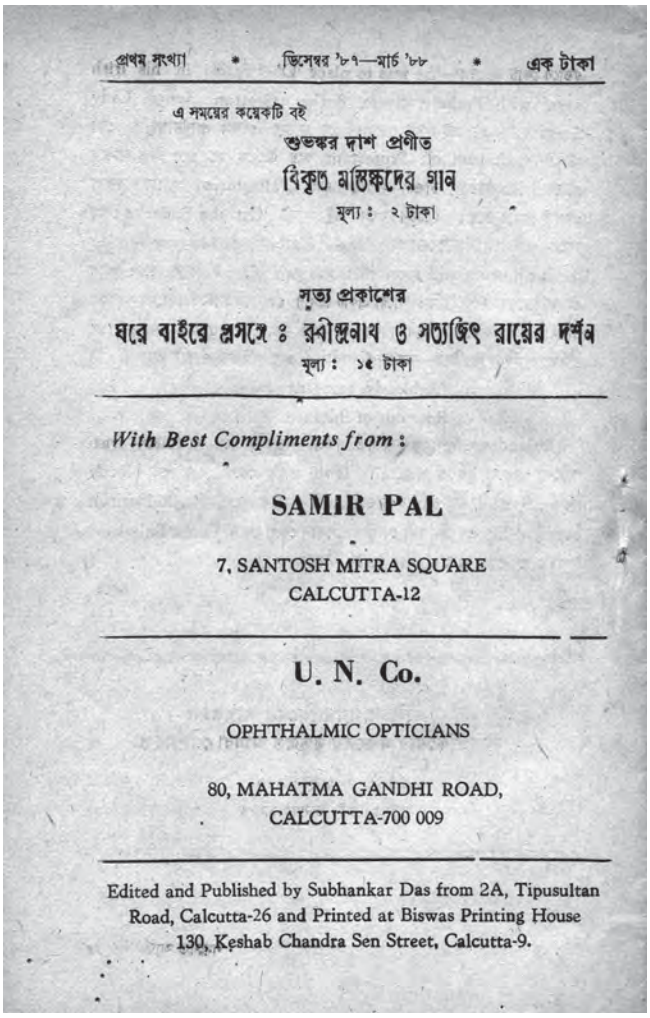
‘ভেটকিবাবু, এবার কিন্তু আমি সত্যি রেগে যাচ্ছি, আপনি শুধু বিটিং দা বুশ করে যাচ্ছেন — পাখির নামে দেখা নেই —’

‘আসলে আমি গোড়ার কথাটা বলে নিতে চাইছি, যাতে আপনি আমার সঙ্গিন অবস্থাটা বুঝতে পারেন। আপনাকে এই উটকো ঝামেলাটায় টেনে আনতে হচ্ছে আমাকে, দোষটা আমারই, একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে বলেছিলুম কাউকে-কাউকে হয়তো, এখন ছেলেগুলো এসে বলছে, মুরোদটা দেখান তো দেখি —’

‘ভেটকিবাবু, আমিও খুব করেই চাই আপনি আপনার মুরোদটা দেখিয়ে দিন, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটেছে, তা আগে বলবেন তো —’

‘সেই তো বলছি, আমার কী দায়, বলুন, কিন্তু আমাকেই শেষ পর্যন্ত গোলে বলটা পাঠাতে হবে, অথচ কোনো দলেই আমি নেই, ত্রিসীমানায় নেই। আমাদের পাড়ার পি কে সরকার মশাই চা-এর দোকানে আড্ডা মারতে-মারতে হঠাৎ দাঁত-মুখ খিঁচে পড়ে গেলেন মেঝেয়, গোঁ-গোঁ করলেন কিছুক্ষণ, মুখে ফেনা-টেনা উঠল একটু, নাকে-মুখে জল ছিটোতেই খাড়া হয়ে উঠলেন, বললেন, ‘ও কিছু না, ও আমার প্রায়ই হয়! আমার শরীরের ধাত বলতে পারো। হাসপাতালের ডাক্তার-শালারা বলছে মেশিন লাগাতে হবে, হাজার তিরিশেক খরচ, টাকা খাওয়ার ধান্দা আরকী, বুঝতে পারি না!’

চ্যালা-চামুণ্ডারা ছাড়বার পাত্র নয়, দাদাকে এইভাবে তো ‘তাঁর শরীরের ধাতে’-র উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না, দাদা হয় টাকা-কড়ির দিক দিয়ে কাহিল, নয় খুব ভয় পাচ্ছেন, তারা আঁচ করল; হ্যারিসন রোডের অলি-গলির একটা পাড়ায় তারা থাকে, সোজা দাদাকে প্রায় ঘাড়ে তুলে নিয়ে, অর্থাৎ ধমক-ধামক দিয়ে জবরদস্তি করা একটা রিকশায় তুলে নিয়ে, তারা মেডিক্যাল কলেজ-এর দিকে রওনা দিল; মেডিক্যাল কলেজ-এর জুনিয়র ডাক্তারবাবু তাদের সঙ্গে কথা বলে, দেখে-শুনে, প্রেশার-ট্রেশার দেখে-টেখে তাদের পিজি হাসপাতাল দেখিয়ে দিল।



পত্রিকায় প্রকাশিত ভেটকির চশমার দোকান ‘ইউ এন কোং’-এর বিজ্ঞাপন

ছেলে-ছোকরাগুলি হাসপাতালের পিণ্ডি চটকাতে-চটকাতে ফিরে এসে বসল সেই চা-এর দোকানে আবার, দাদাকে বগল-দাবা করে, দাদারও খুব মন-মরা ভাব, সে-তেজ আর নেই; ব্যাপারটা যে আর হেলা-ফেলার স্টেজে নেই, তা তিনি বুঝতে পারছেন।

দোকানি কী ঘটেছে অথবা ঘটে থাকতে পারে আঁচ করে মনে-মনে হাসল, অভিজ্ঞতা তার চুল-দাড়ি পাকিয়ে দিয়েছে, এরা তার খদ্দের হলেও প্রায় কনিষ্ঠ বন্ধুর মতনই, বিরাট কেটলি থেকে কাপে-কাপে চা ঢালতে-ঢালতে অল্প হেসে বলল, 'দাদাবাবুরা, ক্যাচ ধরো, ক্যাচ, নইলে কোনো হাসপাতালেই কোনো কালে সুবিধে করতে পারবে না, কেউ পারেনি।'

'ক্যাচ' কথাটা সবার কানে 'শিওর শট'-এর মতন শোনাল, আর আমার কথাটা অবিলম্বে তাদের মনে পড়ে গেল। বিপদটা আমিই বাঁধিয়েছি। এমনিতে তো আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ছাড়া খুব একটা কথা চালাচালি করি না, তবু কেন যে এমন হয়ে গেল! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, বুঝলেন!'

আমি ভেটকিবাবুর লজ্জা-কাতর দুরবস্থাটা আন্দাজ করতে পারছিলুম, তাঁকে আবার তাঁর পাড়ায় ফিরতে হবে, ছেলেগুলির সামনে গিয়ে পড়তে হবে আবার, আবার সেই মুরোদ দেখাবার কথাটা উঠবে, মেডিক্যাল কলেজ-এর একজন কেউকেটা ডাক্তারকে তিনি চেনেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা-টাড্ডা মারেন, এমন কথা সোজাসুজি না বললেও কাউকে-কাউকে বুঝতে দিয়েছেন তিনি, অতএব ফেঁসে গিয়েছেন। সে-অবিমৃশ্যকারিতার দাম তাঁকে এখন চোকাতে হচ্ছে; কী-ই যে সাধু ভালোমানুষ ছিলেন ভেটকিবাবু!

আমি খুব শান্ত গলায় বলেছিলুম, 'লজ্জা-টজ্জা পাওয়ার কোনো মানে হয় না, ভেটকিবাবু। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা এখন এরকমই দাঁড়িয়েছে বটে। তা, আপনি-আমি কী করব! এখন আপনি সোজা আপনার পাড়ায় চলে যান, সরকার মশাইকে ও পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে আমার চেম্বার-এ চলে আসুন; সরকার মশাই সঙ্গে-সঙ্গে ভর্তি হয়ে যাবেন, তারপর যা-যা করা দরকার, করা হবে। আপনার দৌড় কতটা লম্বা, তার কিছুটা আন্দাজ পাড়ার ছেলে-ছোকরারা পেয়ে যাবে হয়তো। তারা আর আপনার পেছনে লাগতে আসবে না।'

ভেটকিবাবু একটুখানি আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'তা হলে আমার আন্দাজটা একেবারে ভুল হয়নি, আপনিই বলুন!'

ভেটকিবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর যা হওয়ার ছিল, তা হল। সরকার মশাই আমাদের ডিপার্টমেন্ট-এ ফ্রি-বেডে ভর্তি হলেন (ডিপার্টমেন্ট-টায় কোনো পেয়িং-বেড ছিল না), প্রথামাফিক ভর্তির জন্য কাগজপত্র লেখালিখিটা তাঁর বাড়ির লোকেরা একতলায় নেমে গিয়ে করে এলেন। তাঁর রোগটা ছিল হার্ট-ব্লক, একটা পেস-মেকার বসাবার দরকার ছিল, আমার লেখা সরকার মশাই-এর সই করা একটা দরখাস্ত পকেটে পুরে নিয়ে রাইটার্স-এ গিয়ে চিফ-মিনিস্টার-এর রিলিফ ফান্ড থেকে টাকা জোগাড় করে নিয়ে এসে একটা পেস-মেকার-এর ব্যবস্থাও হয়ে গেল, সরকার মশাই ভালো হয়ে উঠে বাড়ি চলে গেলেন। অপারেশন হবে সরকার মশাই-এর, ভেটকিবাবু রোজ বিকেলবেলা এসে রুগিদের লোকজনদের জন্য পেতে রাখা চেয়ারে বসে থেকে ভিড় বাড়াচ্ছিলেন।

ভেটকিবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা পেকে উঠল।

এখন থেকে বইপাড়ার দিকে গেলেই হ্যারিসন রোড-এ দাঁড়িয়ে একবার চেয়ে দেখি, ভেটকিবাবুর চশমার দোকান খোলা আছে কিনা, প্রায়ই থাকে না, কেন যে থাকে না, ভেবে অবাক হই, প্রশ্ন করলেও যে-উত্তরটা পাই, তার নানারকম মানে হতে পারে। তা যা হোক, খোলা থাকলে তাঁর দোকানে ঢুকি গিয়ে একবার, একটুক্ষণ বসি, এটা-সেটা কথা বলা-বলি হয়, তেমন জরুরি কিছু নয়; আমি যদি-বা আগ বাড়িয়ে নিজের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা-দুটো কথা বলে ফেলি, তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রায় চুপচাপই থেকেছেন সবসময়ে। তাঁর দোকানে খদ্দেরের ভিড় কখনো আমার চোখে পড়েনি, হতে পারে, ভিড়ের দিনগুলিতে আমি তাঁর দোকানে যাইনি, অথবা যাইনি যথাযথ সময়ে। কখনো-কখনো হয়তো আমি উঠে পড়তেই তিনিও আমার সঙ্গী হয়ে যেতেন কফি হাউস পর্যন্ত, দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে; তার আগে যেতেন আমার সঙ্গে পুরোনো বই-এর দোকানের লাইনেও, সেখানে বই-এর দোকানিরা নির্বিশেষে তাঁকে সম্ভ্রম দেখিয়ে কথা বলতেন, খবরাখবর নিতেন-দিতেন। কফি হাউস-এও দেখেছি তিনি খুব জনপ্রিয়, একটা চেয়ার দখল করে বসে এক কাপ কফি ও সামান্য কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে পড়ে কোথায় যে হাওয়া হয়ে যেতেন, বলে যেতেন, 'ফিরবার পথে দোকানটা ঘুরে যাবেন'।

আমার এক বন্ধুকে ভেটকিবাবুর কথা বলতেই তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠেছিলেন, 'ও ভেটকি! প্রেসিডেন্সির ভেটকি বলুন!'

আমি বলেছিলুম, 'ভেটকিবাবু প্রেসিডেন্সির ডাকসাইটে ছাত্র ছিলেন বুঝি, এই যেমন কাকা?'

'অতটা ঠিক জানি না, তবে জানি যে, ওঁকে ছাড়া প্রেসিডেন্সির শিক্ষক-অশিক্ষক কারুরই চলত না। কবিতা লিখতেন। শুনেছি, ওঁর একটা কবিতার বইও ছিল; আমি দেখিনি।'

'দেখিনি তো আমিও! কবিতা যে লেখেন, সেই খবরটাই ওঁর মুখ থেকে আমি বার করতে পারিনি', আমি বলেছিলুম, 'কবিতার বই তো আরও পরের কথা।'

একদিন খাড়া দুপুরবেলা, হাসপাতালে কোনো একটা ছুটির দিন হবে, হাসপাতালে যাইনি আমি আর, টেলিফোনে কাজ সেরেছি, পার্কসার্কাস-এর বাড়িতে শুয়ে-বসে পড়ার নাম করে ঝিমুচ্ছি, দরজার বেল বাজল, ভেটকিবাবু।

'কী ব্যাপার, ভেটকিবাবু, এই খাড়া দুপুরবেলা?', আমি বললুম।

'না, কিছু না, সরকারি ছুটির দিন আজ, আমি বেসরকারি ছুটির দিন নিয়ে নিলুম। এ-পাড়ায় এসেছিলুম, কাজ ছিল, হঠাৎ মনে হল, এ-পাড়ায় এসে পড়লুমই যখন, আপনার ঠেকটা একবার ঘুরে যাই, আপনাকে পেয়ে যাব, ভেবে আসিনি, অবশ্য।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে উনি বললেন।

'তা, বেশ করেছেন', আমি বললুম, 'জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

মেঝের রং-চটা সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্পেটের উপর বসলুম আমরা দু-জন; তার আগে চেরা কাঁচালঙ্কা ও লেবু চিপে দেওয়া ভদকা বানিয়ে নেওয়া গিয়েছিল দু-গ্লাস। কয়েক চুমুক খাওয়া হলে আমি বললুম, 'আমাকে আপনার কবিতা আপনি দেখাননি, আমি কবিতার লোক নই বলে, মনে হয়; কিন্তু সেই কোন কালে, পাঁচের দশকে, আমিও কবিতা লিখতুম, জানেন কি, জানেন না, তা যাক, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু বয়েস যখন আপনার এতটা পাকেনি, তখন নিশ্চয় প্রেমের কবিতা লিখতেন, লিখতেন যখন প্রেমিকাও একজন অথবা বহুজন ছিলেন নিশ্চয়, আজকে তাঁদের একজন দু-জনের সম্বন্ধে আবছাভাবে হলেও কিছু বলুন, আমার থিওরিটা পাকা হোক যে, লোকটা আধ-পাগলা না বাউন্ডুলে অথবা টনটনে বুদ্ধিওয়ালা মেকিয়াভেলি, তাতে একজন বিশুদ্ধ প্রেমিকার কিছু যায়-আসে না; অবশ্য, যদ্দিন তিনি প্রেমিকা থাকেন; ঘরনি হয়ে উঠবার মতন দুর্বুদ্ধি তাঁকে পেয়ে বসলে অঙ্কটা উলটে যেতে পারে।'

ভেটকিবাবু অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ ছোটো-ছোটো চুমুকে মদ খেলেন, আনুষঙ্গিক উপকরণ গেলাসেই রয়ে গেছে, অতএব আর-এক কিস্তি করে ভদকা নেওয়া গেল, তারও পরে ভেটকিবাবু ছোটো করে বললেন, 'কতকগুলি এমন ব্যক্তিগত জিনিস থাকে যে, নিজে থেকে তাদের প্রকাশিত করে দিতে গেলে তাদের স্ব-মূর্তিগুলিকে অথবা স্ব-সম্মোহনগুলিকে হারিয়ে ফেলতে হয়, তাদের চিনতে তখন নিজেরই অসুবিধে হয়; হয় না? আপনিই বলুন। আমি আপনাকে

এরকম অসম্ভব সব প্রশ্ন করতে যাব না, করাটা অনুচিত হবে বলে, বুঝতে পেরেছেন, এত তো বিজ্ঞ মানুষ আপনি?'

কিছুক্ষণ তারপর ঝিম মেরে রইলেন ভেটকিবাবু, চুপ করে রইলেন। ছোটো-ছোটো চুমুক দিতে লাগলেন গেলাসে, বললেন, 'বেড়ে হয়েছে কিন্তু প্রিপারেশনটা। আমেজটাও। না, শুয়ে পড়ব না, উপভোগ করব।'

আমি তার তাঁকে বিরক্ত করতে গেলুম না। আমি বরং কার্পেটের উপর একটুখানি কাত হলুম; ভাবতে লাগলুম, এখন যদি নিমাইবাবু (আমার সহবাসী বন্ধু) থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর সাহচর্য ছাড়াও অধিকন্তু আমাদের গরম-গরম পকোড়া জুটত। তিনি নেই, আমি একটা অস্বাভাবিক অভাববোধে পীড়িত হতে লাগলুম।

ভেটকিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসেছিলুম তাগাদা দিতে, একজন চোখের ডাক্তার, মুসলমান, বললেন কথায়-কথায় যে, আপনার ক্লাসমেট, ভদ্রলোক খারাপ বলতে পারি না, কিন্তু কাজ করিয়ে নেন, টাকা দিতে গড়িমসি করেন, এই আরকী — আমাকেও তো সংসারের কথাটা ভাবতে হয় —'

টপ করে বলে ফেললুম, 'ভেটকিবাবু, বিয়ে করেছেন আপনি? ছেলেপুলে রয়েছে?'

ভেটকিবাবু কথাটার ধার দিয়েও গেলেন না, 'অনেকগুলি টাকা। আজ দিয়েছেন কিছু, পরে আবার দেবেন, খেপে-খেপে, এই আরকী —! আর একটা হলে হত, হবে?'

'সে কী! হবে না কেন? আধ-বোতলেরও তো বেশি রয়েছে এখনও!'

হল। ভেটকিবাবু আবার চুপ করে গেলেন, পা-এর নখ খুঁটতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে চুমুক।

আমিও আর খোঁচাতে গেলুন না।

'জানেন, আমার ঢের কাজ। যতধরনের কাজ বাধ্য হয়ে আমাকে করে বেড়াতে হয়, তার হিসেব দিলে আপনি হাসবেন। সব কাজ তো সবার কাছে সমান মূল্য ধরে না, কারুর-কারুর কাছে ধরে। তবে, আমি ভাগ্যবান, আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে ভালোবাসে, অনেকেই তারা আমার চেয়ে ঢের উঁচু দরের, যেমন ধরুন, প্রকাশ কর্মকার, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, এমনকী কমল মজুমদার; বন্ধু হয়ে উঠবার আগেই অনেকে ভালোবাসে আমাকে, এই যেমন ধরুন, আপনি নিজে, এত বড়ো ডাক্তার —'

ভেটকিবাবু তাঁর খালি হয়ে যাওয়া গেলাসটা আমার সামনে এগিয়ে দিলেন, ততক্ষণে চিপে দেওয়া লেবু ও চিরে দেওয়া লঙ্কা তাদের তেজ হারিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়, সুতরাং নিঃশৌখিন ভদকা দিতে হল তাঁকে জল মিশিয়ে (নিজেকেও), তা-ই সই।

গেলাসটা শেষ হলে ভেটকিবাবু বললেন, 'অনেকক্ষণ হল। উঠি এবার তা হলে। অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। আজ তো আর দোকান খুলব না, আজ ছুটি। আপনার ছুটিটা মাঝখানে থেকে মাটি করে গেলাম!'

ভেটকিবাবুকে আমি রাস্তার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম।

তখন পর্যন্ত কলেজস্ট্রিট পাড়ায় রোজই তো যেতে হত আমাকে। যদিও প্রায়ই বলতেন, 'ফিরবার মুখে আমার দোকানটা একটু হয়ে যাবেন', হয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠত না; তা হলেও, বিকেলবেলার দিকে কখনো-কখনো ভেটকিবাবুর দোকানে একবার ঢুঁ মেরে আসতুম এবং বসতুমও কিছুটা সময়, তা স্বীকার করতে হবে। হঠাৎ একদিন ভেটকিবাবুর মেজাজ খুব শরিফ হয়ে আছে, দেখা গেল, কারণটা আমার জানবার কথা নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যে খুব সংগোপন, তা বোঝা হয়ে গিয়েছিল; কাজেই পাশেই দিলখুসা-র দোকান থেকে যখন একজোড়া কবিরাজি কাটলেট দিয়ে গেল একটা ছোকরা এবং তাঁর চশমার দোকানের সিন্দুক থেকে টাকার বদলে বাংলা মদের বোতল বেরোল, আমি একটুও অবাক হলুম না। বিকেলটা আমরা উপভোগ করলুম, কাউকে কেউ খোঁচাতে গেলুম না, তাই বলে কথায়-বার্তায় একদম নিরামিষ থাকলুম, তা-ও নয়। ভেটকিবাবু মাঝামাঝি একটা সময়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন শুধু, 'আপনি যখন পুরোপুরি রিটায়ার করে যাবেন, তখন আপনার বাড়িটা সত্যিই একটা 'শান্তিনিকেতন' হয়ে উঠবে, দেখবেন।' 'শান্তিনিকেতন' শব্দটার একটা আলাদা মানে ছিল তাঁর নিজের, বলতেই হয়।

এবার আমাকে পাকসার্কাস-এর বাড়িটা ছেড়ে দিতেই হবে। পাড়ার প্রমোটাররা পেছনে লেগেছে খুব, ইট-পাটকেল মেরে জানালার কাচ ভেঙে দিচ্ছে, পাড়ার ছেলেরা এসে ভদ্র ভাষায় বলে যাচ্ছে, 'দাদু, দিন-কাল ভালো নয়, দেখতেই তো পাচ্ছেন, কে কবে রাস্তাঘাটে একটা আধলা ইট ছুঁড়ে মাথাটা ফাটিয়ে দেবে, তার চাইতে বাড়িটা ছেড়েই দিন, আপনাকে আমরা এত ভালোবাসি! বিপদে-আপদে তো আপনি সবার উপকারই করেছেন, আপনার বাড়ির টেলিফোনটা তো আমাদের নিজেদের বাড়ির টেলিফোনই ছিল, বলতে গেলে, গলা তুলে কারুর সঙ্গে একটা কথা বলেননি, তবু দিন-কাল ভালো নয়, বুঝতেই তো পারছেন!' বোঝা গেল, পাড়ার ছেলেরাও এভাবে না-হোক অন্যভাবে প্রোমোটারের লোক হয়ে গিয়েছে। বাড়িটা আমি ছেড়েই দেব, ঠিক করলুম।

এরকম একটা সময়ে একদিন হঠাৎ আবার উদয় হলেন ভেটকিবাবু, প্রথামতো বিষ্যুদবার নয়, সন্ধ্যার সময়ের তথাকথিত সাহিত্যিক আসরেও নয়, দুপুরবেলা। এ-পাড়ায় কাজেই এসেছিলেন, কিন্তু ফেরার পথে তাঁর হঠাৎ মদের তৃষ্ণা পেয়েছে, 'গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হত', খোলাখুলিই বললেন। চলে এসেছেন, রবিবার, আমিও কোনো কারণে আর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে যাইনি সেদিন, পার্কসার্কাসের ছাড়ি-ছাড়ি আধ-খ্যাঁচড়া বাড়িটাতেই থেকে গিয়েছি, আপ্যায়ন করে তাঁকে উপরের তলায় নিয়ে এলুম। মেঝের কার্পেটের উপর বসতে-বসতে বললুম, 'আজ কিন্তু রাম ছাড়া আর কিছু জুটবে না, আর কিছু ভাঁড়ারে নেই, টাকার টানাটানি।'

'টানাটানি, কেন?'

'এজি বেঙ্গল-এ কাগজপত্রে কী এক গোলমাল বেঁধেছে, ঠিকঠাক নিয়মমাফিক পেনশন পেতে মাস কয়েক সময় লেগে যাবে।'

আমি তখন পাকাপাকিভাবে বেকার হয়ে গিয়েছি।

'শুনে খারাপ লাগল। এ-সুনামটা আছে তো আপনার ঠেকের যে, যে যা খেতে চায়, পেয়ে যায়; নানা লোকের নানা পছন্দ, 'সাহিত্যিক আড্ডা ওরফে শুঁড়িখানা' নামটা তো ঢের সম্ভ্রমের, না কি!

'তা সে সম্ভ্রমের হোক, অথবা না হোক, যাঁরা ভালোবেসে আসেন, তাঁদের সুখ-সুবিধের দিকে নজর দেওয়ার একটা চেষ্টা তো থাকে, মায় সিগারেটটা, শিক-কাবাবটা অব্দি —'

'স্যাড, স্যাড, স্যাড! তা যা হোক, আমি তো সর্বপায়ী, আমার কোনো অসুবিধে হবে না, রাম-ই হোক!'

ভেটকিবাবু এবং আমি রাম-সহযোগে পরস্পর সান্নিধ্য উপভোগই করলুম। তাঁর গলা যখন যথোপযুক্তভাবে ভিজে গিয়েছে, তিনি বললেন, 'চলুন, এবার ওঠা যাক।'

'কোথায়?'

'আমার দোকানে, হ্যারিসন রোডে —'

'আজ তো রবিবার, দোকানপাট সব বন্ধ থাকে —'

'খুললেই হল —'

আমি একটু অবাক হলুম। আমি তাঁর দোকানে খানিকটা সময় বসে গল্প-সল্প করে উঠে পড়লে তিনি তাঁর দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে কখনো-কখনো আমার সঙ্গী হয়েছেন বটে, কিন্তু আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হয়েছে, এবং তাঁর ইচ্ছায়, এমনটা কখনো ঘটেনি আগে; কিন্তু আজ ঘটল। তাঁর প্রস্তাবটায় এমন একটা দীন

আন্তরিকতা অন্তর্লীন ছিল যে, হাতে কাজ থাকলেও আমি হয়তো 'না' বলতে পারতুম না, বাড়িটার রাস্তার দরজায় তালা মেরে দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

হ্যারিসন রোড। ভেটকিবাবুর দোকান। তালা খুলে তিনি শাটার টেনে দু-পাশে জড়ো করে রেখে দরজা খুললেন। দু-পাশে শাটার টানতে-টানতে আচমকা তিনি বললেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, মশাই, সবাই আমাকে 'ভেটকি' বলেই জানে ও ডাকে, আপনি আমার ডাকনামের সঙ্গে একটা 'বাবু' যোগ করেন কেন?'

কথাটা ভেবে দেখবার মতন, সত্যিই।

'কেন যে, তা তো ভেবে দেখিনি। তবে, বাংলা ভাষায় কাউকে সম্মান জানাতে চাইলেই তো মানুষ তাঁকে অমুকবাবু, তমুকবাবু বলে সম্বোধন করে। তাই তো না কি?

দরজার তালাটা খুলে ফেলে ভেটকিবাবু বললেন, 'সে কথাটা ঠিক। কিন্তু আলাপটা যখন আর নতুন থাকে না, পুরোনো হয়ে ওঠে, তখন কী হয়? সম্বোধনের থেকে 'বাবু'-টা ঝরে যায়। কিন্তু আমার বেলা আপনার ক্ষেত্রে তা তো হল না। তার মানে আমি সেই নতুনই রয়ে গেলুম!'

আমি বললুম, 'ওভাবে না নিয়ে এভাবেও তো জিনিসটা নেওয়া যায় যে, ওটা আমার অভ্যেস-বশত হচ্ছে। আমার থেকে কনিষ্ঠদেরও তো অনেক সময়ে আমি আদর করে অমুকবাবু বলে ডাকি। যে ছেলেটি আমাকে দোকান থেকে নানা কিসিমের মদ কিনে এনে দেয়, বদলে দুটো-পাঁচটা টাকা পায়, তাকে তো আমি 'পল্টুবাবু' বলে ডাকি।'

'বোঝা গেল, আসুন, এবার চেয়ার দখল করে বসে পড়ুন।'

বসলুম। তিনি তাঁর দোকানের সিন্দুক খুলে দেশি মদের বোতল বার করলেন। আমি আগ বাড়িয়ে বললুম, 'দুপুরে অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে, আর খাব না কিন্তু আমি'।

'আপনি না হয় না খাবেন, আমি একটু খাব।'

টেবিলে মদের বোতল সাজিয়ে রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আবার তাড়াতাড়ি ফিরেও এলেন। 'সারাটা দিন মদ খেয়েছি, কিন্তু পেটে কিছু পড়েনি, কিঞ্চিৎ খাদ্যের ব্যবস্থা করে এলুম।'

গেলাসে মদ ঢেলে জম্পেশ করে বসতে না বসতেই মোগলাই পরোটা এসে পড়ল। উনি প্রথমত এক গেলাস মদ জল-টল না মিশিয়েই চোঁ করে খেয়ে ফেললেন, তারপর আদ্ধেক জল আদ্ধেক মদ ঢেলে নিলেন গেলাসে। ধীরে-সুস্থে খাবেন।

দু-জনে সমান ভাগে মোগলাই পরোটা খেতে লাগলুম।

পরোটা, মাঝে-মাঝে গেলাসে চুমুক, তিনি হঠাৎ বললেন, 'হাসপাতালে দেখেছি তো আপনার কীরকম উঁচু একটা সম্মান ছিল; আপনার বাড়ির আড্ডাতেও দেখেছি, আপনাকে যারা এক্সপ্লয়েট-ও করত, করতে আসত, তারাও আপনাকে একধরনের মান-সম্ভ্রম করত। কিন্তু, সেই আপনার বাড়িতে আজ টাকার টানাটানির জন্য রাম ছাড়া আর কোনোরকমের মদ নেই, যারা আড্ডাতে আসবে তারা না পছন্দ করলেও রাম খেতে বাধ্য হবে, অথবা খাবে না, জল খাবে শুধু, আপনার মান-সম্ভ্রমটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! ভাবতে আমার খুব লাগছে।'

তাঁর চোখ একটু চিকচিক করলও, মনে হল।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'সরকারি ব্যাপারে ওরকম হয়, আবার মিটেও যায়। দু-এক মাসের ভিতর পেনশনের ব্যাপারটা আমার মিটে যাবে, খুব ঘোরাঘুরি করছি আমি। আপনার কথা-মতো আমার যে মান-সম্ভ্রম, তাতে কোনো টোল পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তা হলেও', বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, গিয়ে তাঁর দোকানের সিন্দুকটা খুললেন, সিন্দুকে যা থাকার কথা সেই টাকা বেরোল এবার, ফিরে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, 'তা হলেও', বন্ধুবান্ধবের একটা কর্তব্য থাকে।'

তিনি টেবিলের উপর একশো টাকার পাঁচখানা নোট রাখলেন।

'আপনি আপাতত আপনার বাড়ির আড্ডার ব্যাপারটা আপনার সম্ভ্রম অনুযায়ী সামলে নিন, তদ্দিন সরকারি অফিসের কাগজপত্রের গাঁট কাটাবার ধান্দা করুন। টাকাটা পরে একদিন না হয় দিয়ে দেবেন।'

ভেটকিবাবুর মতন দুর্বল একজন মানুষের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার না করলে আমার বাড়ির আড্ডাটা অচল হয়ে পড়বে, এতটা গরিব হয়ে পড়িনি আমি। 'বাড়িতে রাম ছাড়া আর কোনোরকমের মদ নেই' সেদিনের দুপুরবেলার এই কথাটা সত্যি ছিল, পল্টুবাবু হয়তো হরেকরকমের মদ সন্ধেবেলাতেই এনে জোগাড় করে দিতেন, মদের দোকানও ধারে মদ দিতেন আমাকে, মাস-কাবারি টাকাটা দিয়ে দিতুম; 'টাকার টানাটানি' কথাটাও সত্যি ছিল, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে গেলে এরকম একান্তই ব্যক্তিগত কথা কখনো-কখনো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে, 'আমার এগারো বছরের বাড়ির মানুষ-হয়ে-ওঠা কুকুরটা পরশু দিন মরে গেল, জানিস, বড়োই কষ্টে আছি।' কুকুর নিয়ে বন্ধুটির বিশেষ কোনো সেন্টিমেন্ট আছে কিনা, না জেনেও এরকম কথা তাকে বলে ফেলা যায়।

যা হোক, টাকাটা আমি নিলুম। আজ রবিবার, বাড়িতে আড্ডার দিন নয়, ধীরে-সুস্থে বাড়ি ফিরলেও চলে, তবু আমি বললুম, 'বন্ধুকে সাহায্য করতে পেরেছেন, কাজেই এখন তো আপনি সুখে কিঞ্চিৎ এনজয় করে মদটা খাবেন, আমি তা হলে চলি।'

ভেটকিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

তারপর আবার তাড়াতাড়ি সামান্য জড়ানো গলায় হাঁকপাঁক করে বললেন, 'আপনার মতন মানুষের কাছে মান-সম্ভ্রম জিনিসটা একটা বড়ো জিনিস, বুঝলেন? ওটা খোয়া যেতে দেবেন না। মরে গেলেও না।'

আমি খুবই বিনত গলায় বললুম, 'ভেটকিবাবু, আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে।'

ভেটকিবাবুর দোকান থেকে আমি বেরিয়ে গেলুম। মনে পড়ল যে, আমার চশমা নিয়ে ছোটো-খাটো অসুবিধে সামলে নিতে আমি কতবার যে এসেছি এই দোকানে, এই যেমন, চশমার ডাঁটের ইস্ক্রুপটা খুলে পড়ে যাওয়া, কাচটা খুলে পড়ে যাওয়া, ঢলঢলে হয়ে চশমাটার নাকের ডগায় নেমে আসা, ইত্যাদি, তার সঙ্গে আলাপটা তত গাঢ় হয়নি তখনও, তিনি কাজটা সানন্দে করে দিয়েছেন, পারিশ্রমিকের কথা আমিও তুলিনি, তিনিও না।

রাস্তায় নিরুদ্দেশ্য কিছুটা হাঁটলুম, তারপর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলুম। কেমন যেন মনে হতে লাগল, ভেটকিবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আজ ক্লাইমেক্স-এ এসে পৌঁছে গেছে।

এর কিছুদিন পরেই আমাকে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে সল্টলেকে চলে যেতে হল। কবিতার কাগজটা তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। 'সাহিত্যিক আড্ডা ওরফে শুঁড়িখানা'-টারও অতএব এন্তেকাল হল।

কলেজস্ট্রিট থেকে সল্টলেকের করুণাময়ী অনেকটা দূর, আমার নিজের গাড়ি-ঘোড়া নেই, কলেজস্ট্রিটের ওদিকে যাওয়াটা আমার ধীরে-ধীরে কমে এল। সুতরাং কফি হাউসে যাওয়াটাও। কিন্তু ভেটকিবাবুর কাছে ধারটা রয়ে গেছে।

যেদিন গেলুম, তাঁর দোকান বন্ধ নয়, কিন্তু দোকানে কেউ নেই। হঠাৎ-ই নজরে পড়ে গেল, তিনি কলেজস্ট্রিট হ্যারিসন রোড জংশনের কাছে ব্যাগওয়ালাদের ব্যাগে-ব্যাগে আপাদমস্তক মুড়ে থাকা যে মহাপুরুষের মূর্তিটা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে, রাস্তা পেরোবার ধান্দা করছেন বোধহয়। তাড়াতাড়ি করে ছুটে গেলুম সেখানে, তাঁকে ধরে ফেললুম, দ্রুত তাঁর জামার পকেটে টাকাটা গুঁজে দিলুম। দাঁড়ালুম না।

তিনি শুধু একবার চেঁচিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এইরকমই সাধারণত হয়, হল।'

ভেটকিবাবুর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

আমার গুণগ্রাহী ছিল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমেই বলি, ভেটকিকে আমার বাড়ি আসতে বারণ করেছিলাম। কখন কী অবস্থায় আসবে, তা তো জানি না। এমনকী শক্তিকেও বারণ করতাম — খবরদার আসবে না। শক্তি আর ভেটকি একইসঙ্গে একইরকম ব্যাপার ছিল। আমরা পারিবারিক লোক, প্রায় গ্রামে থাকতাম, লোকজন বলবে যে অতীনবাবুর বাড়িতে সব মাতালের দল আসে! শক্তি শোনেনি। একবার দু-বার এসেছিল। ভেটকি আসেনি কখনো। কেননা কী অবস্থায় থাকবে, সে-এক প্রশ্ন! আমার একটা ভয় ছিল। আমি তখন কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকি। শিয়ালদা ট্রামডিপোর ওখানে। সেখানে দশ বছর থেকেছি। কারখানার ম্যানেজারি করতাম। সে যা হোক, ভেটকি মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিল। সাহিত্যপাগলা মানুষ। কবি-শিল্পীদের সঙ্গে ওঠা-পড়া করত, কিন্তু নিজে কিছু লিখেছে বলে তো আমি জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হত কখনো কফি হাউসে, কখনো কলেজস্ট্রিটে। আমার নিজেরও তখন বয়স হয়েছে। ভেটকি আমার খুবই গুণগ্রাহী ছিল। সে বলত — যা করে গেলেন, শুয়োরের বাচ্চাদের আর কারো এ-লেখার ক্ষমতা হবে না! আমি পাগলের প্রলাপ ভাবতাম। বই তার নিজের জোরে বেঁচে থাকে, কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। যতই বই সম্পর্কে যে যা-ই বলুক, তার ভেতরে যে শক্তি আছে, তার ভেতরে যে কাব্য আছে, যে জীবন আছে, যে কাহিনি-সময়কাল, সেটা যদি মানুষ জরুরি বলে মনে করে, তখনই লেখাটা থাকে। *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* সিরিজটা একটা যুগের কথা। যখন দেশভাগ হল, উদ্বাস্তু সমস্যা এল — তো, দেশভাগ নিয়ে কাউকে জানতে হলেই এই বইটা অবশ্যপাঠ্য। শুধু ইতিহাস থেকে কী জানা যায়? কিছু সন-তারিখ; কিন্তু এই যে মানুষগুলো কীরকম ছিল, কীভাবে হাঁটাচলা করত? ফলে এই বই-এর মূল্য অসীম। যত দিন যাবে, তত গুরুত্ব বাড়বে।



পাবলিশারের ঘরে

ভেটকি যদিও আমার মনে তেমন কোনো রেখাপাত করেনি। আমার লেখায় ভেটকি চরিত্র হিসেবেও আসেনি। অবশ্য আসতেও পারে দু-এক জায়গায়, অনেক তো লিখেছি! আমার ঠিক মনে নেই। কখনো কফি হাউসে গেছি, চেয়ার নেই। ভেটকি কাকে গিয়ে বলল — অ্যাই ওঠ! দেখছিস তো কে এসছে! ওর খুব প্রভাব ছিল। আমার লেখা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা হয়নি। তবে ও আমার গুণগ্রাহী ছিল। দেখা হলেই দৌড়ে আসবে! খুব আবেগপ্রবণ ছিল। বাড়িতে বিধবা মা; মায়ের কথা খুব বলত। আমি বলতাম — ভেটকি তুই আজ কী খেলি? ভালো-ভালো সব খাবারের ফিরিস্তি দিত, কিন্তু আমি জানতাম, ভেটকির পেটে হয়তো সেদিন কিছুই পড়েনি। আর পাঠকসত্তা ছিল কতটা জানি না, কিন্তু উত্তেজনা যথেষ্ট ছিল। বাউন্ডুলেপনা ছিল। একটা লাইন পড়ল, অমনি ব্যস! ওটা নিয়েই চলতে থাকল! খুব পড়েছে বলে তো মনে হয় না। একধরনের উচ্ছ্বাসের মধ্যে আবিষ্ট থাকতে ভালোবাসত। তবে ও নিঃসন্দেহে কিন্তু একটা রিমার্কেবল চরিত্র। ভেটকিকে নিয়ে এই যে তোমরা কাজ করছ, এটা মোটেও অবান্তর নয়। সব মানুষই আমার কাছে প্রয়োজনীয় আর ভেটকি তো একদিক থেকে কলেজস্ট্রিট পাড়ায় তখন বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুনীল-শক্তি সকলকেই ও চেনে। সুতরাং... প্রয়োজনীয় কাজই। এটুকুই বলার। আর, শেষদিকে আমি এদিকে চলে আসবার পর ভেটকির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অনুলিখন : রাজদীপ রায়

আবছা মানুষ

পার্থ মুখোপাধ্যায়

আমরা যখন প্রথম কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে পা রাখলাম, সময়ের বিচারে সেটা আটের দশকের গোড়ার দিক। পড়তাম স্কটিশচার্চ কলেজে ঠিকই, কিন্তু সকাল ন-টা থেকে প্রায়ই আমাদের দিন কাটত হয় হেদুয়ার পাশেই বসন্ত কেবিনে, নয়তো কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে। এবং দিন বলতে সকাল ন-টা থেকে কম করেও রাত ন-টা। ততদিনে কলেজস্ট্রিটের কফি হাউসি আড্ডায় পঞ্চাশের দিকপালদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়েছে কিছুদিন হল, কিন্তু পুরোনো বাড়িটার তিনতলায় আনাগোনা শুরু হতে চলেছে সদ্য বিদেশ-ফেরত শিবনারায়ণ রায় মশাই-এর। *জিজ্ঞাসা* নামে সুখ্যাত একটি পত্রিকার যাত্রাও শুরু হবে তাঁর সম্পাদনায়, প্রায় ওইরকম কোনো-একটা সময়েই। প্রত্যেক শনিবার আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম বিকেলে কফি হাউসের আড্ডাটার লোভে — যেখানে কোনো টেবিলে মধ্যমণি থাকবেন কবি-সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায়সহ *কবিপত্র* পত্রিকার কুশীলবরা, কোনো টেবিলে জমা হবেন অতীন্দ্রিয় পাঠক, রমানাথ রায়, শেখর বসু, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্তদের মতো শাস্ত্রবিরোধীরা, কোনো টেবিলে আবার সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক চক্রবর্তীদের মতো কবি-ব্যক্তিত্বরা — যাঁদের অবাক চোখে দূর থেকে দেখতাম আমরা। টুকটাক লেখালেখির সূত্রে আমরা নিজেরাও তখন সবে সংহত করতে চেষ্টা করছি নিজেদের ভাবনা-চিন্তাকে। বামফ্রন্টের সদ্য যাত্রা শুরু করার সেইসব দিনগুলোয় খোলামেলা রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার একটা গোড়াপত্তন তলায়-তলায় তখন চলছে বটে, কিন্তু কোথাও তার তেমন সচকিত বহিঃপ্রকাশ হয় নজরে পড়ত না, নয়তো পড়লেও তেমনভাবে দানা বাঁধেনি বলে নাড়া দিতে পারত না। তবে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপারটার মৌল পরিবর্তন বোধহয় তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে, ব্যাপকার্থে সবাই তখন বামমনস্ক। কেবল কিনা ভেতরে-ভেতরে কে কী ভাবছে, তা কে বলবে! এইরকমই একটা সময়ে, অক্লান্ত আড্ডার এক দুপুরে তেমন-লম্বা-নয় একটি যুবাকে নজরে এল, যে কিনা সেই ভরদুপুরেই আসবপানে টলটলায়মান। অবিশ্রান্ত পান খাবার দরুন বলে জেনেছিলাম পরে, কিন্তু সেদিন তার আজুলপি বিস্তৃত দুই ঠোঁটের টকটকে লাল রং আমাদের ব্যাপক চমকেছিল,

এখনও বেশ মনে আছে। ততদিনে কিঞ্চিৎ অন্তরঙ্গ হয়ে যাওয়া কবি অজয় নাগের সূত্রেই জেনেছিলাম, যুবাটি কেবল কফি হাউস নয়, গোটা কলেজস্ট্রিট চত্বরেই যথেষ্ট পরিচিত। 'সিদ্ধার্থ' ওরফে 'ভেটকি' নামে ব্যক্তিটি চেনা হয়ে গিয়েছিল অব্যবহিত পরেই। মিথপ্রতিম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়দের অকুতোভয়ে স্রেফ সুনীল-শক্তি-দুলু বলে সম্বোধন করার মতো বুকের পাটায় উজ্জ্বল যুবাটির মধ্যে প্রথম দর্শনেই যেটা নজরে পড়ত, সেটা হল তার নির্বিকার হাসিটি।

ক্রমশ বদলে যেতে থাকা কলেজস্ট্রিট পাড়ায় কোথাও ছিল শুনেছি ভেটকিদের সাবেক আমলের বাড়ি। হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিল সে। শেষ-সত্তরের কখনো বা তারও আগে প্রথাগত লেখাপড়ায় ইতি-টানা যুবাটি কি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল সেই আস্থায় যে : এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয়! কে জানে, প্রশ্ন করেও উত্তর পাইনি কোনোদিন। ছোট্ট একটি চশমার দোকানের মালিক করে দেওয়া হয়েছিল তাকে পারিবারিক সূত্রে, আর সে নির্বিকার উত্তাপে প্রায় বিলিয়ে দিয়েছিল মধ্যবিত্ত আত্মপরিচয়ের ছোট্ট সেই দাঁড়াবার জায়গাটুকুও। তার বন্ধু ছিল, মানুষ নয়, কেবল কতকগুলি মিথ এবং ফেলে আসা দিন আর বর্ষে-বর্ষে দলে-দলে ভেসে আসা কলেজস্ট্রিট-কেন্দ্রিক শিক্ষায়তনগুলির ছাত্র, এমনকী কখনো-কখনো ছাত্রীরাও। না, আরও বন্ধু ছিল তার। নিশ্ছিদ্র মদ্যপান ছিল তার সেই বন্ধুর আসল পরিচয়। দশকে-দশকে কলেজস্ট্রিট যখন এগিয়ে অথবা পিছিয়ে যাচ্ছে, ভেটকি তখন কিন্তু অমলিন আবেগে আরও বেশি-বেশি করে জড়িয়ে ধরছে তার এই নিত্যকার সঙ্গীরই গলা। অথচ, মদ্যপ বলতে যা বোঝায়, ভেটকিকে কখনো কি তা-ই মনে হয়েছে কারো? কলেজস্ট্রিট পাড়ার ছোটো-বড়ো-মাঝারি যেসব প্রকাশকের ঘরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় তথা ঠেক ছিল তার, তাঁদের জিগ্যেস করুন; মনে তো হয়, নঞর্থক উত্তরই মিলবে। তাহলে? মদ খেতে ভেতর থেকে যে ভালোবাসে কেউ-কেউ, সেটা আর যা-ই হোক মদ্যপ হিসেবে নাম / দুর্নাম কেনবার জন্যে তো নয়। ভেটকি মন ভালো থাকলে যেমন মদের দোকান থেকে একপাক ঘুরে আসত, মনখারাপ থাকলেও তেমনি। ওতে ও ভেতরে-ভেতরে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার জোর পেত। কখনো শুনিনি ভেটকির মদের আড্ডার কোনো সঙ্গীর কথা। সম্ভবত সেখানেও সে ছিল একা, নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। কোনো দুঃখ থেকে মদ খেত না সে। একবার ঠান্ডা মাথায়, স্রেফ কফি খেতে-খেতে সে বলেছিল, দেবদাসদের সে নাকি ঘেন্না করে। জিগ্যেস করেছিলাম, 'শরৎচন্দ্র পড়েছ তুমি?' খুব মোটা কাচের চশমার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া দুটো চোখ উত্তরে কিছু বলেনি। কেবল তাকিয়ে থেকেছিল। ওই তাকিয়ে থাকাটাই ছিল তার উত্তর। নিঃশব্দে।

যতদূর মনে আছে, আমাদের এক অগ্রজ বন্ধু যখন ভেটকিকে বড়ো কাগজের এক আলোচনায় আউটসাইডার একটি চরিত্র হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, অনেকে বিব্রত হয়েছিলেন। বিরক্তও। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, ভেটকিকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখাবার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না কেউ। তাঁরা ভেটকিকে আলোচনার বাইরে রাখতেই আগ্রহী ছিলেন। ওকে প্রকৃত অর্থে চিনতে অস্বীকার করেছিলেন তাঁরা, আজ টের পাই। এভাবেই একেকজনকে আমরা ক্ষমতা-নির্মিত বৃত্ত থেকে সরিয়ে দিই। দিই আমাদের ক্ষমতার সূত্রেই। প্রত্যেক পাড়াতেই, প্রতিটি আড্ডাতেই এরকম কেউ-না-কেউ থাকে, খেয়াল করলে দেখা যায়। ক্ষমতা তাদের ব্যবহার করে, করে ছিবড়ে হিসেবে দূরে সরিয়ে দেয়। মুছে দেয় তার পরিচয়। ভেটকিরা ক্ষমতাকে সঙ্গ দেয় নানা মুহূর্তে, কিন্তু সঙ্গী হতে পারে না। তাদের সঙ্গী করা হয় না বলেই পারে না। এবং সবথেকে বড়ো কথা যেটা, তা হল, ভেটকিরা ক্ষমতার ভাষায় কমিউনিকেট করতে পারে না যেহেতু, ফলে ক্ষমতাও তাদের দূরে সরিয়ে রাখে। একদিকে তাদের নতুন করে কোনো পরিচয় তৈরি হয় না, অন্যদিকে মুছে যায় পুরোনো পরিচয়ের গণ্ডিও। এই যে না-হয়ে যেতে থাকা অবিরাম, এর বিপরীতে ভেটকিদের তাই আশ্রয় নিতে হয় স্মৃতিতে। ফেলে আসা দিনগুলো থেকে তারপর আর বেরোতে পারে না তারা। যেমন ভেটকিও পারেনি। চাইতও না। বেরোতে। সুনীল-শক্তি-পৃথ্বীশ-অমিতাভ দাশগুপ্তরা তার ফেলে আসা দিন। তার কাছে ওই দিনগুলো আজীবন থেমে রয়ে গিয়েছিল — যে থেমে থাকার ট্র্যাজিক চারিত্র্য টের পাবার উপায়গুলো অব্দি ধীরে-ধীরে মুছে গিয়েছিল তার কাছে।

যেভাবে বলছি কথাগুলো, হয়তো তাত্ত্বিক শোনাচ্ছে খুব। গম্ভীর শোনাচ্ছে। কিন্তু ভেটকিকে বা ভেটকিদের যাঁরা দেখেছেন বা দেখে থাকেন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, ট্র্যাজেডি হল — তাদের ট্র্যাজিক এই অবস্থানটাকে আমরা নিজেরাও টের পাই না। আর সেই না-পাওয়ার মধ্যেই মুছে যাওয়া আবছা পেন্সিল-স্কেচের মতো সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়ে যায় ভেটকিরা। রয়ে যাবে। আজীবন।

একটি উজ্জ্বল মাছ

সুমন ধর

১৯৮৮ সালের এক সান্দ্র হেমন্তের রাত্তিরে একটি বীভৎস রসে পূর্ণ, হাড়-হিম করা, অবমানবিক দৃশ্যের অসহায় সাক্ষী হতে হয় সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত সম্প্রতি-মফস্বলাগত হতভম্ব এই লেখককে। কলেজস্ট্রিট থেকে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে আলম্বিত যাওয়ার স্মৃতির পি সি সরকার সরণির গোড়ায় একটি খোলা ম্যানহোলের গহ্বর থেকে একার প্রচেষ্টায় প্রায় মিনিট দশেকের অসম লড়াই-এর পর আবির্ভূত হল এক আপাত বিজাতীয় মৎস্যবদন মদালস বিগতযৌবন মানুষ। সারা শরীর বর্জ্যবারিতে সিক্ত, প্রাগ্রসর *কাগজের বাঘ*-এর বিপ্লবী গুমটি ও বুড়োদার চা-এর দোকানের বনসাই আঁতেলদের (ব্যতিক্রম শুধু গরহাজির গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং দীপক মজুমদার) সমবেত করতালি ও উৎসাহবর্ধক শীৎকারের মধ্যেই সেই কোণঠাসা আহত মানুষটি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য এক মহান ট্র্যাপিজশিল্পীর অভ্যস্ত নিস্পৃহতা নিয়ে ঠোক্কর খেতে-খেতে নিষ্ক্রান্ত হল অভিশপ্ত ভূখণ্ডটি থেকে। ওই ঘটনাটি একরকমের প্রত্যাখ্যানের স্থায়ী স্মৃতির মাইলফলক হিসেবে থেকে গেল এই লেখকের মনে। অত্যাশ্চর্য বোধ হয়েছিল মানুষটির অপরিমেয় একাকিত্ব, তার নির্বিকার স্পৃহাহীনতা, প্রত্যাশার বৈরাগ্য, মধ্য আশির লিটারারি ও আর্ট গ্রুপিস-এর প্রতি তার নিরাসক্তি, পরিবার ও বান্ধবতার বাইরে তার নিশ্চিত অবস্থান এবং একটা গোটা জীবন ধরে হৃদয়হীন তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা এবং অবমাননার জন্য তার প্রস্তুতি। শরীরী ভাষায় ছিল অবধারিত এক প্রান্তিকতার অ্যান্টিসিপেশন। 'ভেটকি'-কে আমি অবশ্য ঘটনাটির বছর দেড়েক আগে থেকে চিনতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই পরিচিতির বছর চারেক ধরে দেখেছিলাম কলেজস্ট্রিট এবং তার আশেপাশে ভেটকির কিম্ভূত সেনোফবিক হননপ্রক্রিয়া।'

একধরনের রহস্যময় অবধারিত ইন্ট্রিগে ভরা ছিল আমাদের সঙ্গে ভেটকির পরিচয়পর্ব। সে ছিল ভীষণভাবে কমিটেড সারোগেট প্রেমিক। কেমন যেন চোরাপ্রেম এবং শক্তিশালী অবদমিত যৌনতায় তাকে মনে হয় *হারবার্ট*-এর প্রোটোটাইপ। একক মানুষের প্রতি ভেটকির আসক্তি ছিল ন্যূনতম। শিকারির অদম্য সন্ধানীদৃষ্টিতে সে ঘুরে বেড়াত প্রেসিডেন্সির কন্দরগুলিতে। নরম-সরম হিউম্যানিটিসগন্ধী যুগলদের ঘনিষ্ঠতা বাড়া-কমাটা দক্ষতার সঙ্গে পরিমাপ করত সে। সম্পর্কের স্থায়িত্ব নাসারন্ধ্রে সমবেত করে ঝাঁপাত। এভাবেই সে সঞ্জয়-অপালা, অচ্যুত-দেবারতি, অরুন্ধতী-যে কেউ, এবং এই লেখক-রশ্মিকে শর্টলিস্ট করে নেয়। তবে অনুদ্ধারণীয় ট্যাঁশ বা প্রশ্রয়-কৃপণ কারো সংসর্গ সে বেশিদিন করত না। এই জোড়াগুলির সাথে নির্বিচারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো, তাদের অবাক-সবাক সংলাপের নিবিষ্ট শ্রোতা হওয়া, শিহরণ-খোয়ানো বিবাদ-বিচ্ছেদ বীতস্পৃহ অনীহায় উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করা, একধরনের ফ্যাসাইল আনুগত্য ও উদারতায় তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ছোটো-বড়ো সমস্যায় অদ্ভুত তুঘলকীয় সমাধান হাজির করা — এগুলি

ধারাবাহিক একনিষ্ঠতায় সম্পন্ন করত সে। বিশেষ করে মেয়েটির কাছ থেকে স্বীকৃতির সামান্য ইঙ্গিত পেলেই এক অদ্ভুত তুরীয় পুলক অনুভব করত। এই জুড়িগুলিকে রক্ষা, পোষণ ও উৎসাহের ব্যবস্থা করার একটা ইন্টারনাল ইমপারেটিভ বোধ করত। মায়ার বাৎসল্য এবং তির্যক যৌনতার একটা সংমিশ্রণ ছিল তার মধ্যে। এই অধমর্ণ এবং তার প্রেয়সীকে নিয়ে সাবির, অনামিকা, দিলখুসা, স্বপ্নলোক, আপ্যায়ন, মিনি, প্রেসিডেন্সির প্রমোদদার ক্যান্টিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাখালদার ক্যান্টিন চষে বেড়িয়েছে সে। সম্পূর্ণ খরচ তার, এ নিয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেনি সে। নিজেদের কখনো ওই সময়ের চেয়ে বেশি সুযোগসন্ধানী পরজীবী মনে হয়নি। জাদুকরি বহু অবসন্ন রাতে হিন্দু হোস্টেলে একাকী প্রবাসী প্রেমের শিশিরে ভেজা এই অধমের ঘুম ভাঙিয়ে সে বর্ষণ করেছে রয়্যালের বিরিয়ানি, যুগলের জয়নগরের মোয়া, আশ্চর্য তৎপরতায় গরম-রাখা ফেভারিট ক্যাবিনের টোস্ট, স্বপনদার গরম প্যাটিস বা চানাচুর মিক্সচার। অলীক রাতগুলিতে প্রায় সম্পূর্ণ মদমত্ত অবস্থায় চলমান অশরীরীর মতো সে পৌঁছে যেত তিনতলার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। খাবারের পরিমাণ ও অর্থমূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতনারহিত হয়ে অবিমিশ্র প্রেম-বাৎসল্যে সে দেখতে চাইত আমার খাওয়া। একটা ভূতুড়ে বিকল্পতা টের পেতাম — আসলে সে হয়তো খাওয়াত রশ্মিকে। আজ মনে হয়, কয়েক দশক ধরে সে এই অলৌকিক সম্পর্কগুলি স্থাপন করেছে কয়েক প্রজন্মের প্রেমিকযুগলের সঙ্গে — প্রজন্মের দূরত্ব সে সেতুবন্ধন করেছে তার প্রবহমাণ উদারতায়। এটাও এখন মনে হয় যে অভিশপ্ত, ভবিষ্যৎহীন, মৃত সম্পর্কগুলি আমরা অনেকেই কি প্রলম্বিত করেছি ভেটকির সম্ভাব্য হতাশা বা উদারতার সমাপন আটকাতে? এই বিকল্প সমান্তরাল প্রেম-যৌনতার উষ্ণতা কিন্তু আশ্চর্যভাবে অথচ অবধারিতভাবে অনুপস্থিত থাকত সম্পর্কের শুরুর আগে এবং বিচ্ছেদ-পরবর্তী অবস্থায়। প্রায়োগিক এবং চলমান প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া কারো ক্যারিশমা একেবারেই অনুভব করতে ব্যর্থ হত সে। বিপ্রতীপে, এই উপকৃত, অনুগৃহীত প্রেমিক-প্রেমিকাদের রোজকার শোষণ, উদাসীনতা, অবমাননার পৃষ্ঠচাপড়ের মালিন্য ও গ্লানি সে প্রতি সন্ধ্যায় ধুয়ে ফেলত খালাসিটোলার স্বর্গীয় সোমরসে।

প্রেমের কৌণিকতা ব্যতিরেকেও আশি-নব্বই দশকে ভেটকির লেজেন্ড প্রতিষ্ঠার আরও কারণ ছিল। সকাল-দুপুর-রাতে তার অনিবার্য আবির্ভাব ছিল সত্তর মিলিমিটার পর্দার বক্স। রহস্যময় আধা-অন্ধকার গলি, অতর্কিত প্যাসেজওয়ে, ছায়াময় অলিন্দ বা জনাকীর্ণ মোড় থেকে সহসা দৃশ্যমান হত সে দু-পা সার্কাসের জোকারের কায়দায় ফাঁক করে, বিকল রোবটের মতো ডিফায়েন্ট প্রমিথিউসের রংবাজিতে রঞ্জিত হয়ে। রশ্মির জন্য চিকিৎসকের শংসাপত্রের সন্ধানে আমাকে সে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার শম্ভু পান-এর চেম্বারে। শংসাপত্রটি হাতিয়ে নিয়ে আমার কানে সে বলল, 'দৌড়ো'। সন্ধের ব্যস্ত সূর্য সেন সরণির দোকানদার, পথিক ও গাড়িচালকদের স্তম্ভিত দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সে দিল এক মৃত্যুছুট, পেছনে ধাবমান বিমূঢ় এই লেখক। 'মৌচাক'-এর কাছাকাছি এসে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মুখে ননীচোর কৃষ্ণের হাসি মাখিয়ে। এই ডাক্তার ভদ্রলোক অর্থের বিনিময়ে শংসাপত্র বিলি করে বদনাম কুড়িয়েছিলেন। ভেটকি তার চেম্বারের নাম দিয়েছিল — 'পানের দোকান'। আজকের দুঁদে রাজ্য সরকারি প্রশাসক অপালা তার তখনকার প্রেমিক সঞ্জয়ের ধারাবাহিক গালাগালি সহ্য করতে না পেরে ভেটকির কাছে অনুযোগ করার পর আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় গরলতর গালাগাল অভিমানী কন্যাটিকে শিখিয়ে দেওয়ার। কাজ হাসিল হওয়ার পর অপালার বয়ানে হতবাক সঞ্জয়ের প্রতিক্রিয়া জানতে পেরে ভেটকির রবিনহুডীয় দন্ত-ঘর্ষণ হাসি আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। জীবিকার প্রয়োজনে ভেটকি একটি রূপকথার চশমার দোকান চালাত মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল-এর শাড়ির দোকানের বিপরীত ফুটপাথে। এক বৃষ্টিভেজা সন্ধেয় ভেটকি, আমি এবং বিস্মৃত আরও দু-একজন বসে আছি। অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত ভেটকি মুড়ি, চানাচুর, আলুসেদ্ধ, পেঁয়াজ-লঙ্কাকুচি মিশিয়ে ঝালমুড়ির আতিথেয়তায় ব্যস্ত। দুই পরমাসুন্দরী যুবতী হঠাৎ দোকানে ঢুকে পড়ে চশমার ফ্রেম পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। চোখ-ফেরানো-যাচ্ছে-না এমন রূপে বিমোহিত হয়ে আমাদের ঝালমুড়ির চিন্তা মাথায় উঠেছে। যুবতীরা চশমার ফ্রেম দেখানোর দাবি করাতে অপাপবিদ্ধ তিব্বতি লামার অনাসক্তিতে ভেটকি তাদের বলে যে, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের চোখ যথার্থই ত্রুটিপূর্ণ বলেই তারা সেটা বুঝতে ব্যর্থ এবং ইচ্ছে করলে তারা মুড়ি-মাখায় ভাগ বসাতে পারে। এর বেশি সে তাদের জন্য কিছু করতে অপারগ। যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিভ্রান্তি আমি ওই দু-জন রমণীর চোখে লক্ষ করেছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য, তা নিশ্চয়ই ভেটকি অনেকবার লক্ষ করেছিল তার বহু আশ্চর্য অভাবিত কীর্তির সাক্ষীদের মধ্যে।

ভেটকির সমাপ্তিটা বড়ো অকরুণ বিয়োগান্তিক। কৈশোর থেকে আমৃত্যু প্রায় চল্লিশ বছরের দৈনন্দিন অপরিমিত মদ্যপানে তার লিভারের অবস্থা হয়ে উঠেছিল ঘোর বিপর্যস্ত। মনটাও নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছিল। শেক্সপিয়রের ফলস্টাফের মতোই রম্যতা ও কৌতুকের মোড়কে মলাটবদ্ধ মানুষটি একটি গভীরভাবে বিপন্ন ও অসম্পৃক্ত জীবনের শেষ প্রান্তে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় পূর্ণ কেরিয়ারসীমায়িত, বীতরোম্যান্টিক ছাত্র-যন্ত্রদের কাছে রোদ-বৃষ্টির পরিচর্যা না পেয়ে মুমূর্ষু মহাবৃক্ষের মতো এলিয়ে পড়ল। কলেজস্ট্রিটের কলেজ-ক্যাম্পাসগুলি ছিল ভেটকির মতো প্রতিচরিত্রগুলির নার্সারি। নব্বই দশকের মাঝামাঝির পর থেকে সেসব জায়গায় চলভাষ-আন্তর্জাল-আক্রান্ত এক যৌন সমঝোতা কবর দিল নরম মানবিক রোম্যান্সকে। নতুন শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবধারিত সংবাদ পাওয়া গেল ভেটকি অন্য কোনো গ্রহের প্রেমলোকের খালাসিটোলায় ঘাঁটি গেড়েছে। সংবাদপত্রে তার আত্মীয় ভাই-বোনেরা তাকে স্মরণ করে বিজ্ঞাপন দিলেন। তা দেখে দূর-দূরান্তে জীবনের জোয়াল টেনে যাওয়া একসময়ের স্বপ্নের যুবক-যুবতীরা নিশ্চিত আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। আজ ফিরে দেখলে মনে হয়, অচ্যুত ও তাপস লায়েক নিজেদের জীবন নিজেরাই নিয়ে নিয়েছে মধ্য চল্লিশের শূন্যতা সহ্য না করতে পেরে, সঞ্জয় জীবনবিমা নিগমের চাকরির গদ্যময় সমঝোতায় ব্যস্ত, প্রশাসনিক সোপানের অবধারিত পঙ্কিলতায় বিদীর্ণ অপালা, রশ্মি রাজধানীর বিস্মৃত সংসারী, আত্মহননের নেশায় ওঁত পেতে আছে শিল্পী তন্ময়, পঁচিশ বছর আগেই নির্বাপিত প্রবীর দাশগুপ্তের প্রতিভাবান জীবন, চিরঞ্জীব কোনো কলেজের অনুপ্রেরণাহীন শ্রেণিকক্ষে বাংলা ক্লাসের অন্ধকূপে কোণঠাসা, ল্যাডলি, অঞ্জন, রজতের জীবন অস্তমিত স্তাবকতাবহুল চ্যানেলদাস সংবাদজীবীর মালিন্যে, পত্রপত্রিকার কবিতার পাতা থেকে অন্তর্ধান ঘটেছে বিশ্বজিৎ-মহুয়ার, আর এই লেখকের মতো প্রতিভাহীন কাপুরুষরা পতিত ধ্বস্ত পেশায় নির্মম উদ্ধারহীন খাবি খাচ্ছে। সাংস্কৃতিক সাবঅল্টার্নদের প্রাণ এবং সত্তর-আশির দশকের মহান রেলিক ভেটকি, আমরা অনেকেই কেবলই বেঁচে আছি। তুমি কিন্তু বেঁচে গেছ।

facebook

Debasis Mukhopadhyay ওহ , ভেটকি-র সময়টা চোখের সামনে উঠে এলো ... কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে হেলতে দুলতে উঠে আসছে ভেটকি ... অপেক্ষায় রইলাম ...
October 18 at 11:58pm · Edited · Unlike · 3

Amar Mitra ভেটকি! সন্ধেয় টেমার লেনের মুখে দাঁড়িয়ে। একটি ফিল্টার উইলস আমার জন্য। অনেক দিন খুব বন্ধুতা হয়েছিল। করুণা প্রকাশনীতে তারপর। তোর মুখে পান জর্দা। শক্তিদা,আয়ান রসিদ খান, খালাসিটোলার গল্প। ভেটকি বেঁচে থাকুক। চশমার দোকানটি উঠে গেল। কাঁচা টাকা সুরায় গেল।
October 20 at 4:53pm · Edited · Unlike · 3

ভেটকিদা, জীবন অপার

বিপ্লব নায়ক

ভেটকিকে 'ভেটকি' নাম কে দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, জানি না — হয়তো বা সে-নাম দেওয়ার মধ্যে অবজ্ঞা বা বদ রসিকতা মিশে ছিল, কিন্তু সেসব হেলায় উপেক্ষা করে ওই নামকে সদাহাস্যময়ভাবে বহন করত যে, তার চাপা পড়ে যাওয়া নামটা ছিল সিদ্ধার্থ দাস। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯০ সালে। আমার বয়স তখন কুড়ির দিকে ধাবমান, আর ভেটকি তখন চল্লিশের শেষ কোঠায়। ভেটকি তাই আমার 'ভেটকিদা'। আমি তখন যুবক, আর ভেটকিদা চিরযুবক। কিছু-কিছু সম্পর্ক যেমন প্রমিত ব্যাকরণ মেনে হয় না, ভেটকিদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটিও তেমনই নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছিল। সূচনায় ছিল 'কবিতা' ও 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়' যোগ — কীভাবে তা কিছু বলি। সেই বছরই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি আর যুক্ত হয়ে পড়েছি কলেজ চত্বরে 'কবিতার কাছে' নামে একটি উৎসবের আয়োজনে। বহু কবি কবিতা পড়তে এসেছেন, এসেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও। শক্তি সবে তাঁর প্রথম কবিতার কয়েক লাইন পড়েছেন, এমন সময় অভাবিতভাবে বিদ্যুৎ-আলো নিভে গেল, সবাই হতচকিত। অন্ধকার সভাঘরের পিছন দিক থেকে জোনাকির মতো একটা আলো ধেয়ে চলল মঞ্চের দিকে, সঙ্গে পুরুষকণ্ঠে জড়ানো উচ্চারণ : 'শক্তিদা দাঁড়াও, আলো নিয়ে যাচ্ছি।' অচিরেই মঞ্চে পৌঁছে সে-কণ্ঠের অধিকারী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়ের উপর দিয়ে একটা ছোটো টর্চের জোনাকিসুলভ আলো কবির হাতে ধরা কাগজের উপর ফেলে বলে উঠল, 'শক্তিদা, পড়ো'। সে-মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ-আলো ফিরে আসায় দেখা গেল কবির পাশে দণ্ডায়মান অতি সাধারণ জামা-প্যান্ট পরা এক খর্বাকৃতি চেহারা — কালো ফ্রেম চশমার পিছনে চোখ-দুটো বড়ো আর গোল-গোল, ক্ষয়াটে দাঁতের আগল উপছে পানের পিক গড়াচ্ছে গালে, পাতলা হয়ে আসা চুল এদিক-ওদিক ছড়ানো। সেই প্রথম ভেটকিদাকে দেখা, এটাই ছিল ভেটকিদার সাধারণ চেহারা।

অচিরেই ভেটকিদার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল, কারণ তার চোখে আমার পরিচয় তখন এইভাবে বিশেষত্বমণ্ডিত যে 'যারা শক্তিকে প্রেসিডেন্সিতে এনেছে, এ তাদের একজন'! প্রেসিডেন্সির প্রমোদদার ক্যান্টিনে, গাড়ি-বারান্দায় বা কোয়াড্রাঙ্গেলে সকাল থেকে সন্ধ্যা ভেটকিদার অবারিত যাতায়াত ছিল। বহুজনের ঘাড়ে হাত রেখে, প্রায় একপ্রকার তার কাঁধ ধরে ঝুলতে-ঝুলতে ভেটকিদা যাতায়াত করত, বহু আড্ডায় অযাচিতভাবে গা-ঘেঁষে বসে পড়ত। তার আর আমার মধ্যে একটা বিষয়ে মিল হয়ে গিয়েছিল — আমাদের দু-জনের হাতেই তখন অফুরন্ত সময়। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভিক উচ্ছ্বাসে আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করে 'শ্রেণিচ্যুত', আর ভেটকিদাও তার কলেজস্ট্রিট মোড়ের চশমার দোকানটার ঝাঁপ খুলে দিয়ে সে-দোকানের কাজকারবার কোনো অদৃশ্য শক্তির হাতে সঁপে কলেজ চত্বরে বিচরণরত। ফলত একে অপরের সান্নিধ্যের জন্য আমাদের কোনো সময়াভাব হত না। ভেটকিদার স্বভাব ছিল ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতে দাঁত ঘষে অদ্ভুত একটা শব্দ তৈরি করা, আর সে-শব্দের আবহেই তার জড়ানো-উচ্চারণ বোধ্য শব্দও তৈরি করত। ভেটকিদার কাছে শোনা যেত কখনো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, কখনো বিনয় মজুমদারের গল্প, কখনো-বা তুষার রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা আয়ান রশিদ খানের গল্প। সেসব গল্প কোনোটাই ভণিতাবশে কথকের নিজের ঢোল নিজে পেটানোর পর্যায়ভুক্ত হত না, বরং ব্যক্তিমানুষদের কিছু অনাড়ম্বর মুহূর্ত হাজির করত। এইসমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ভেটকিদা নিবিড় নেশাতুর সময় কাটিয়েছে খালাসিটোলায় বারদুয়ারিতে অথবা অন্য কোনো পানশালায় — সেসবের ছটাও লেগে থাকত ভেটকিদার গল্পে। আবার কখনো ভেটকিদা হঠাৎ কিছু কবিতার লাইন আউড়ে জিজ্ঞেস করে বসত : 'বল তো, কার লেখা?' না পারলে খ্যা-খ্যা করে খুব একচোট হেসে কবির নাম বলত জাঁক করে। এইরকমই একদিন ভেটকিদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল : 'বল তো — 'তোমাকে নিয়ে আমি বাংলাদেশ যাব' — কার লেখা?' অনেক ভেবেও বলতে পারলাম না। খ্যা-খ্যা করে হেসে খুব একচোট পানের পিক ছিটিয়ে ভেটকিদা বলল : 'সিদ্ধার্থ দাস'। বোঝা গেল যে চাপা-পড়া নামে লালিত পরিচয়ে ভেটকিদার কিছু চাপা-পড়া জীবনবৃত্তান্ত আছে।

ভেটকিদাকে নিয়ে আমার মনে নানা বিস্ময়রেখা তৈরি হত। যেমন ধরা যাক, আমি তখন অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার জলাঞ্জলি দেওয়াকে মহান কর্তব্য হিসাবে ধরে জপছিলাম। এই মহান পথ থেকে কত বিচিত্র উপায়ে পদস্খলন ঘটে অর্থ-মান-যশের মোহিনী মায়ায় ভুলে, তা নিয়ে এক গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আশঙ্কা ছিল। এর পাশে ভেটকিদা ছিল এক অলীক মানুষ। এমন একজন মানুষ, যার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, মান-যশ বিষয়ে যার কোনো হুঁশই নেই। সে কীভাবে



মিছিলে ভেটকি (*আমার সময়*-এ প্রকাশিত)

নিজের জীবনে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে, আত্মপ্রয়োজনীয়তা নির্মাণ করে, তার সুখ-দুঃখ বোধগুলো কীভাবে কাজ করে, তার জীবনাচরণ কীভাবে সামাজিকতার উপর স্থিত হয় — এসব প্রশ্নের উত্তর-উপলব্ধি আমার সাধ্যে কুলোত না। দস্তয়েভস্কির সঙ্গে ভেটকিদার পরিচয় হলে দস্তয়েভস্কি হয়তো এইসব প্রশ্নের নিরসন করে ভেটকিদার চরিত্র-অঙ্কন করতে পারতেন।

রূপ, যশ, সমাজগ্রাহ্য গুণ — এ কোনোকিছুই ভেটকিদার ছিল না, কিন্তু ভেটকিদার যা ছিল অফুরান, তা হল জীবনের আনন্দ। এ এক কূটাভাসই হয়তো-বা। কলেজস্ট্রিটের প্রতিটা দোকানদার যাকে অবজ্ঞাভরে পরিহাস করে মাতাল পরিচয়ে চিনত, যার ন্যূনতম কোনো সামাজিক সম্মান ছিল না, যার পানশালার 'বিখ্যাত' বন্ধুরাও তাকে বন্ধুত্বের কোনো প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানা নেই, সেই ব্যক্তিটির মধ্যেই অফুরান জীবনের আনন্দ! সদাহাস্যময়, চিরউষ্ণ এক হৃদয়ের স্পর্শ তার প্রতিটা আচরণে! নাকি, এখানে কোনো গভীর অদৃশ্য নেতিকরণ কাজ করেছে? আসলে কি ভেটকিদার অন্তঃস্থলে জমাট-বাঁধা কোনো বেদনার আকর ছিল, যে বেদনা এত স্পর্শকাতর, এত গভীর যে তার মুখোমুখি হওয়া যায় না, তা প্রকাশ করাও যায় না, তাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে-রাখতে বিকল্প প্রকাশভঙ্গি গড়ে ওঠে অনাবিল এক চিরহাস্যময়তায়? এমনই কোনো নেতিকরণ কাজ করত কি ভেটকিদার মধ্যে? তল পাইনি, দস্তয়েভস্কি হয়তো পেতে পারতেন।

মাঝে-মধ্যে ভেটকিদার ব্যক্তিজীবনের কিছু ডুবে থাকা আভাসকে ভেসে উঠতে দেখেছি। ভেটকিদার মুখেই শুনেছি যে, সে সংস্কৃত স্কুলে পড়ত, অষ্টম কি নবম শ্রেণি হবে, তখন সে সংস্কৃত কলেজের এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে যায়। সে প্রেম কি প্রকাশিত হয়েছিল, হলে তার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল — জানি না, ভেটকিদার অতল তল থেকে তা আর ভেসে ওঠেনি। তার কিছুদিন পরেই ভেটকিদার প্রথাগত পড়াশোনায় ইতি পড়ে গিয়েছিল, কবিতা ও নেশার যুগলবন্দি তার জীবনকে সর্বব্যাপ্তভাবে অধিকার করে নিয়েছিল — এর সঙ্গেও কি এই প্রেমপর্বের কোনো যোগাযোগ ছিল? — জানি না। তবে ভেটকিদাকে পরে বহুবার বহু মেয়ের প্রেমে পড়তে দেখেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু ছাত্রীর সঙ্গে তার আলাপচারিতা ছিল নানা মাত্রায়, তাদের অনেককে ভেটকিদার 'ভালো লেগেছে' — কারো জন্য তার 'বুকে বড়ো ব্যথা' হয়েছে — কিন্তু সেসব প্রেম বড়ো কুঁকড়ে থাকা, অনাগ্রাসী, ব্যর্থতাবিলাসী আর অগোচরে জেগে উঠে অগোচরেই মিলিয়ে যেতে অভ্যস্ত।

ভেটকিদার বাড়ি ছিল তার অদ্ভুত চশমার দোকানের কাছেই মহাত্মা গান্ধি রোডের গায়ে দোতলায়। ভেটকিদার মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা, দাদা চার্টার্ড, পরবর্তীকালে বউদি হয়ে যিনি আসেন, তিনি এক কলেজের শিক্ষিকা। একাধিকবার সে বাড়িতে গিয়েছি। সে বাড়ির পরিবেশে ভেটকিদার অবস্থান বেশ অভাবনীয়।

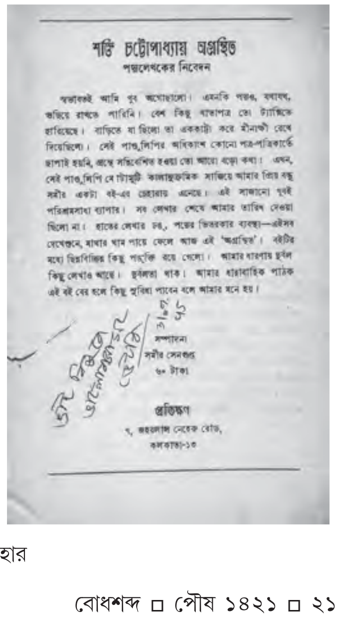
যতদিন ভেটকিদাকে দেখেছি, সন্ধ্যার পর থেকে তার দিনলিপি ছিল স্থিরীকৃত। সে-সময় বাংলা অথবা বিলাতি সুরায় নিমজ্জনের সময়। বেশির ভাগ সময় সে তার বাড়িতে ঘরে বসেই এ তপস্যায় রত হত, তবে মাঝে-মধ্যে সে বাইরেও নানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসত। এমন এক কাণ্ডের কথা বলি। একদিন সকাল সাড়ে ন-টা দশটা নাগাদ কফি হাউসের সামনের রাস্তা দিয়ে প্রেসিডেন্সির গেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছি কলেজে ঢুকব বলে। কফি হাউসের সিঁড়ির দরজার আড়াল থেকে ভেটকিদা বেরিয়ে এসে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে পিছু-পিছু চলল। গেটে পৌঁছোতেই দারোয়ান জনিদা তার বিশাল বপু দুলিয়ে তেড়ে এল ভেটকিদার নামে হিন্দুস্তানি গালাগালের ফোয়ারা ছুটিয়ে। খ্যা-খ্যা করে হেসে ভেটকিদা তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে কলেজের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাগে জ্বলতে থাকা জনিদার কাছ থেকে জানা গেল যে সেইদিন সকালে ভেটকি এক মহা অনর্থ ঘটিয়েছে। কাকভোরে স্নান সেরে রোজের মতো জনিদা খালি গায়ে গামছা পরে সূর্যের দিকে জোড়-হাত করে চোখ বুজে সূর্যস্তব করছিল। উত্তরপ্রদেশের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সেই পবিত্র মুহূর্তটিতেই ভেটকিদা সারারাত খালাসিটোলায় নেশা করে বাড়ি ফিরছিল। ফুটপাথ তখন টলছিল। জনিদার পবিত্র মূর্তি দেখে ভেটকিদার মনে কী যে এক অপূর্ব প্রেম জেগে ওঠে — তার টানে ভেটকিদা পিছন থেকে গিয়ে জনিদার বিশাল ভুঁড়ি দুই-হাতে জড়িয়ে ধরে পানের পিক-গড়ানো, ভুরভুরে মদের গন্ধ-ছড়ানো মুখ জনির মুখে লাগিয়ে সশব্দে চুমো লাগায়। চোখ বন্ধ করে সূর্যস্তবরত জনিদা অপবিত্রতার এই অকস্মাৎ আক্রমণে হতবাক অবস্থা কাটিয়ে যতক্ষণে ক্রোধে ফেটে পড়ছে, ততক্ষণে ভেটকিদা তার খ্যা-খ্যা হাসি ছড়িয়ে একছুটে কফি হাউসের সিঁড়ির তলায় আত্মগোপন করেছে। সেখানে লুকিয়েই সে এতক্ষণ এই পবিত্রতাহানি কাণ্ডের স্মৃতিরোমন্থন করছিল। আমাকে আসতে দেখে আমার আড়াল নিয়ে এসে জনিদার ক্রোধানলে আরেকটু ঘৃতাহুতি দিয়ে গেল।

এমন বহু ঘটনা হয়তো আরও বহুজনের মনে আছে।

কলেজজীবনের শেষকালে একদিন ভেটকিদাকে নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে। কলেজ থেকে আমার বাড়ি বহু দূর — গড়িয়ায় ৫নং বাস-গুমটির কাছে। শিয়ালদা থেকে ভেটকিদাকে নিয়ে ৪৫ নম্বর বাসে উঠলাম। ভেটকিদা কিছুতেই বাসের পাদানি ছেড়ে উঠবে না। কনডাক্টরকে বলে দিল যে চিন্তা নেই, কনডাক্টরের কাজ সে-ই করে দিচ্ছে। এরপর প্রায় দেড়ঘণ্টা জুড়ে ভেটকিদা বাসের পাদানি থেকে ঝুলে বাসের গায়ে চাপড় মারতে-মারতে 'গড়িয়া পাঁচ', 'গড়িয়া পাঁচ' বলে চেঁচাতে লাগল — তাকে থামায় কার সাধ্য! তারপর আমার বাড়িতে ঢুকেই আমার মার সামনে ধপ করে বসে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। এত বয়স্ক একজন মানুষকে (প্রায় মায়ের সমবয়স্ক) এমনভাবে প্রণাম করতে দেখে মা তো ভ্যাবাচ্যাকা। তারপর আমার ঘরে ঢুকে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ে এমনভাবে বই-এর আলমারিতে হেলান দিল যে, আলমারির পাল্লার কাচ ফেটে চৌচির। বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হল না ভেটকিদা — যেন খুব-একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেছে, এমনভাবে উপচে উঠল সেই চিরাচরিত খ্যা-খ্যা হাসি।

ভেটকিদার সাবলীল বিচরণের আর-একটি ক্ষেত্র ছিল কলেজস্ট্রিটে তৎকালীন তৃতীয় ধারার (কংগ্রেস ও সরকারি বাম উভয়ের বিরোধী) রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মিছিল বা অন্যান্য প্রকাশ্য কর্মসূচি। এইসব সংগঠনগুলোর প্রায় সবার সঙ্গেই তার মুখ-চেনা বা তার থেকে বেশি চেনা ছিল, আর তাদের মিছিলে সে বিনা আমন্ত্রণে যেন-বা নিজ অধিকারেই সেঁধিয়ে যেত। কয়েক পা হেঁটে, স্লোগানে গলা মিলিয়ে আবার বেরিয়ে আসত। কংগ্রেস বা সরকারি বামেদের মিছিলে কখনো কিন্তু সে সেঁধাত না।




শক্তি চট্টোপাধ্যায় অগ্রন্থিত

পত্রলেখকের নিবেদন

স্বভাবতই আমি খুব অগোছালো। এমনকি পত্রগুচ্ছ, যথাযথ, গুছিয়ে রাখতে পারিনি। বেশ কিছু খাতাপত্র তো ট্যাক্সিতে হারিয়েছে। বাড়িতে যা ছিলো তা এককাট্টা করে মীনাক্ষী রেখে দিয়েছিলো। সেই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ কোনো পত্র-পত্রিকাতেই ছাপাই হয়নি, গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া তো আরো বড়ো কথা। এখন, সেই পাণ্ডুলিপি যে [illegible] কালানুক্রমিক সাজিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু সমীর একটা বই-এর চেহারায় এনেছে। এই সাজানো খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। সব লেখার শেষে আমার তারিখ দেওয়া ছিলো না। হাতের লেখার ঢঙ, পত্রের ভিতরকার ব্যবস্থা—এইসব দেখেশুনে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আজ এই 'অগ্রন্থিত'। বইটির মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিছু পংক্তি রয়ে গেলো। আমার ধারণায় দুর্বল কিছু লেখাও আছে। দুর্বলতা থাক। আমার ধারাবাহিক পাঠক এই বই বের হলে কিছু সুবিধা পাবেন বলে আমার মনে হয়।

সম্পাদনা
সমীর সেনগুপ্ত
৬০ টাকা

প্রতিক্ষণ
৭, জওহরলাল নেহেরু রোড,
কলকাতা-১৩

উপহার

ভেটকিদার কাছ থেকে নানা বই ব্যক্তিগত উপহার পেয়েছি — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, বিনয় মজুমদার বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় বা আয়ান রশিদ খানের কবিতার বই — প্রথম সাদা পাতায় অদ্ভুত আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা : 'ভাই বিলুকে ভালোবাসা সহ — ভেটকি'।

পরের দিকে ভেটকিদার জীবনের শেষ কয়েকবছর ওর সঙ্গে অত ঘনঘন আর দেখা হত না, কারণ কলেজস্ট্রিটে আমার যাওয়া কমে গিয়েছিল। তখন ভেটকিদার দেহ অতি ভেঙে পড়েছে, আর কেমন যেন মনে হত যে ভেটকিদাকে যেন বিষণ্ণতা গ্রাস করছে — তার জীবনের অফুরান আনন্দ তবে কি ফুরিয়ে এল? মনে হত যে, আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সির বহু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যেমন তার আলাপচারিতা ও মেশামেশির অবাধ ক্ষেত্র ছিল, তেমন ক্ষেত্র বুঝি আর নেই। প্রেসিডেন্সির নতুন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সে বুঝি-বা আর তেমন বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে না। ভেটকিদার বদল নাকি প্রেসিডেন্সির পরিবেশের বদল — কী তার কারণ? সম্ভবত, দ্বিতীয়টাই।

ভেটকিদা মারা গেছে, তবে আমি তার মৃতদেহ দেখিনি, তার শবদাহ দেখিনি। তাই একইভাবে ভেটকিদা এখনও আমার কাছে জীবিত কলেজস্ট্রিটের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র হিসাবে। কলেজজীবনে আমার সবচেয়ে বড়ো পাওনাগুলোর অন্যতম ভেটকিদার বন্ধুত্ব লাভ। মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতি যে কী বহুমাত্রিক রহস্য ধারণ করে অতল অপার রূপে থইথই চেহারা নিতে পারে, ভেটকিদা আমাকে তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। সে রূপের পুরো জরিপ করতে পারিনি, হয়তো দস্তয়েভস্কির মতো কেউ তা পারতেন।

ভেটকি, প্রেসিডেন্সি, কলেজস্ট্রিট ইত্যাদি

অপালা শেঠ

আসলে কোনোদিন লেখিকা, কবি বা শিল্পী কোনোভাবেই আমার পরিচিতি কখনো ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা ফোন সবকিছু বদলে দিল — অপালাদি, ভেটকিকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে!

আসলে, ভেটকি মানে তো শুধু কোনো ব্যাক্তি নয়। এর সঙ্গে আমার বা আমাদের ছাত্রজীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। সেখানে বিপ্লব (মুখার্জি), অচ্যুত (মণ্ডল) আরও আরও আরও অনেক প্রেসিডেন্সিয়ান, হিন্দু হোস্টেলের বন্ধুবান্ধবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

পিছিয়ে যাই ১৯৮৭-র কোনো এক বিকেলে বুড়োদার চা-এর দোকানে। অচ্যুত পরিচয় করিয়ে দিল — অপালা, এই হল ভেটকি! বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। বিশেষত বয়সে বেশ প্রবীণ, ছোটো-খাটো চেহারার অবিন্যস্ত খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও চুলের, চশমা-পরিহিত কোনো এক ব্যক্তিকে দেখে ভাবলাম, সবাই এই প্রবীণ মানুষটিকে নাম ধরে 'ভেটকি' কেন বলে! যাই হোক, আমি 'ভেটকিদা' বললাম — দেখি যে, ভেটকি মুখটা পুরো পাঁচের মতো করে ফেলল, আর বাকিরা আমায় বলল — তুই সম্মান দেখাতে গেলি কেন! ও রেগে গেছে।

তারপর থেকে আমিও 'ভেটকি' বলা শুরু করলাম। আসলে পুরোপুরি একটা মেয়েদের স্কুল থেকে বা রক্ষণশীল একটা পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে কোনো পরিণতবয়স্ক মানুষকে নাম ধরে ডাকাটা খুব অস্বস্তির কারণ হয়েছিল।

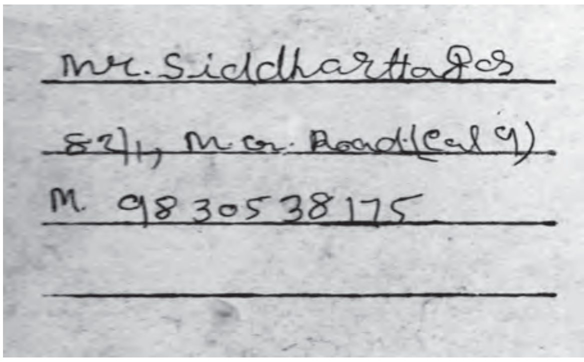
এরপর একদিন ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আমি আর রেশমি (মুখার্জি) ক্যান্টিনে বসলাম। দেখি, ভেটকি সেখানে কোনো টেবিলে রয়েছে। আবার আমাদের কাছে চলে এল। প্রমোদদাকে দেখলাম ভেটকিকে বেশ খাতির করতে। আমাদের সিনিয়র যারা, তারাও ভেটকিকে নিয়ে ব্যস্ত। কারণটা বুঝলাম না।

এর কিছুদিন পর আমার এক সিনিয়রের সঙ্গে যাচ্ছি (সঞ্জয় ভট্টাচার্য) বুকফেয়ারে। বেশ একটা অন্যরকম অনুভূতি। আমাদের বাড়িতে বাবা-মা অথবা কোনো নিকট আত্মীয় ছাড়া কোথাও যাওয়ার নিয়ম ছিল না। ভাবলাম, বুকফেয়ারে এসেছি যখন, ভিক্টোরিয়াতে একবার ঘুরে আসি। কিন্তু আমরা এত আনস্মার্ট বা লাজুক ছিলাম যে ভিক্টোরিয়াতে ঢুকেই সঙ্গে-সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ দৃশ্য হজম করতে না পেরে আবার বইমেলার মাঠে ছুটে চলে এলাম!

সবাই বলল যে কবি সিদ্ধার্থ দাসের একটা কবিতা বেরিয়েছে — দারুণ! আমি বললাম, কই তাঁকে তো চিনি না বা তাঁর নাম শুনিনি। তখন সব বন্ধুরা জোরে হেসে উঠল — আরে, ভেটকির নামই তো সিদ্ধার্থ দাস! আরেকটা সত্ত্বা আবিষ্কার করলাম ভেটকির।

এছাড়াও কলেজস্ট্রিটে ভেটকির একটা চশমার দোকান ছিল। কোনোদিন ভেটকি সেখানে বসেছে বা ব্যাবসা করেছে বলে শুনিনি। তবে অনেক কবি শিল্পী সাহিত্যিক বসতেন, সেটা আমি দেখেছি।

একদিন ওই দোকানে শৈবালদার (মিত্র) সঙ্গে দেখা। প্রচণ্ড গরম — ভেটকি শশা আর লাল চা খাওয়াল। টুকটাক কবিতা, সাহিত্য এইসব নিয়ে শৈবালদার সঙ্গে কথা হল। এত বড়ো বয়সে, অভিজ্ঞতায় বা সম্মানে — অথচ আমার মতো একটা কুড়ি-একুশ বছরের অর্বাচীন ছাত্রীর সঙ্গে কী সুন্দর কথা বললেন। তারপর বললেন, চলো, তোমরা ভালো ছাত্রী — সরবত খাবে। ভেটকিও চলল প্যারামাউন্ট-এ। এখানেই কবি সোমক দাস ও আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। যোগাযোগ নেই, বাইশ বছর বয়সে প্রশাসনে চলে আসায়। অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই।



লিখে রেখেছিলেন নাম-ঠিকানা এবং ভুল ফোন নম্বর!

অনেক ক্রাইসিসের সময় আমরা ভেটকির সাহায্য পেয়েছি। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সময় পাস ক্লাসের পারসেন্টেজ কম ছিল — সবাই ভেটকির সাহায্য চাইলাম। ভেটকি প্রায় চল্লিশজনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জোগাড় করে দিয়েছিল বিনে পয়সায়!

পরে ভেটকি মাঝে-মাঝে ফোন করে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর জানাত। তবে ভেটকির খুব পছন্দের টপিক ছিল সুনীল, শক্তি, সন্দীপন। শোনা যায়, 'ভেটকি' নামকরণও নাকি তাঁরাই করেছিলেন। আমরা মজা করে কফি হাউসে বলতাম, ভেটকি, তুই যেদিন মারা যাবি, খালাসিটোলা আর কলেজস্ট্রিট সাতদিন অন্তত বন্ধ থাকবে!

জানি না, ও চলে যাওয়ার পর কী রিঅ্যাকশন ছিল কলেজস্ট্রিটের। দীর্ঘদিন কর্মব্যস্ততার দরুন যোগাযোগ ছিল না।

তারপর একদিন কফি হাউসে এসে চারদিকের টেবিলগুলো খুঁজছি, দেখি ভেটকি নেই। পুরোনো এক সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করলাম, শুনলাম, ভেটকি আর নেই। ভেতরটা খুব শূন্য হয়ে গেল। একা-একা প্রেসিডেন্সির প্রমোদদার ক্যান্টিন, বুড়োদার চা-এর দোকান, সব জায়গায় খুঁজলাম — না, সত্যিই ভেটকিকে পেলাম না। সবার মাঝখানে এসে বিরক্তি উৎপাদন করার মানুষটি কোথায় হারিয়ে গেছে — যেমন অচ্যুত হারিয়ে গেছে, বিপ্লব হারিয়ে গেছে — অনেক ব্যর্থ ভালোবাসা যা হারিয়ে গেছে — সেখানেই।

উত্তর কলকাতার রাজপুত্তুর অথবা এক জাদুবাস্তবিক অ্যালিয়েন

অতনু সিংহ

মৃত নগর, ফাঁকা স্নায়ু, খুন হওয়া ঈশ্বর

ঈশ্বরের মৃত্যু তো দর্শনের এক ফ্যাকাসে ইতিহাস, তাঁর গায়ে লেগে থাকা পারমাণবিক ছাইও কবেই আলোয়-আলোয় ধুয়ে যাওয়া প্রবাহ, ঈশ্বরের জন্মরোধের লক্ষ্যে দেবতাদের নীল প্রকল্প... এসব টের পাই, মাথা ঝিমঝিম করে যখন, যখন মলতৃপ্তির মতোই মলের ট্রায়ালরুমগুলি ভরে যায় বডি স্প্রের ফ্লুরেসেন্ট ঘ্রাণে, যখন ফাঁকা স্নায়ু জুড়ে পলিথিন ঘোর আর 'নেক্সিটো-টোয়েন্টি' ট্যাবলেট-জড়ানো অস্তিত্বে এক মেঘমল্লার-রিমিক্স আর নীল-সাদা সরকারি রঙিন প্যাকেজে যখন মনীষামাখা ইতিহাসের খাঁজে-খাঁজে জিলেটিন স্টিক, ধড়াম-ধুম ভেঙে পড়ছে তিনশো পঁচিশটি বছরের আমার শহর ও তার দেওয়ালে-দেওয়ালে চুনের আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারা মুক্তির দশকের হরফে লেখা 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'... যখন আর চিতাকাঠ ডাকে না আয়-আয়, যখন আর গঙ্গার পাড় ডাকে না আয়-আয়... যখন ওফেলিয়ার বাতাবিবাগানে ঝোলানো মায়া-মায়া-ছুরিকার মুখে আর কেউ বলে না — হয় প্রেম নয়তো মৃত্যু, যখন খালাসিটোলা ছোটা-ব্রিস্টলছায়া ঢলে গেছে সামপ্লেস এল্স বারবিকিউ আর জিরো ফিগারমুখরিত তন্দ্রার ওয়াই জেনারেশনে, যখন ফুটপাথে আমাদের বোতলবেলা উচ্ছেদের ব্লুয়িশ প্রিন্ট, যখন রাজারহাট সেক্টর ফাইভগামী প্যারেডে আইটি-ইউথ, যখন কোথাও আর সাবোতাজ, সিভিল ওয়্যারের লাল-পরিকল্পনা নেই, যখন কবিতা ও ডিলডোর সমপ্রয়োগের এক মেল-গেইজ-এ ঝিলমিল করছে দশক... যখন আর মাদারিগন্ধ নেই হেমন্তের বিকেলে, যখন জড়িবুটি, বাবুঘাট-পরকীয়া, নুন শো-র দিকে এগিয়ে গিয়েছে বুলডোজার, যখন আর কোনো 'শেষ নৌকা' বর্ষার দিনে কুঠিঘাট থেকে বেলুড়ের দিকে টলমল করে না... যখন আর কেউ চলে যেতে হবে বলে দরজা-জানলা খুলে রেখে, গ্যাসের ওভেন জ্বালিয়ে চলে যায় না, যখন শীতকালের স্মৃতি নিয়ে সুপর্ণার চুল উড়ে গেছে সারেগামা যুগকে পেছনে ফেলে বহু-বহু দূরে, বোবা জিরাফ নিষ্পলক চেয়ে আছে কবির ফেলে-রেখে-যাওয়া চন্দনকাঠের অ্যাশট্রের দিকে... যখন ঈশ্বরের কলোনি মুছে গেছে দেবতাদের ভিডিও গেমে, আইফোনে, ওয়াইফাই বাতপতাকায়... তখন, আমার মতো এক স্মৃতিকাতর আর কী করবে, উবু হয়ে বসে বিড়ি খেতে-খেতে বিগত রাজপুত্তুর আর রাজকন্যেদের স্মরণ করা ছাড়া...

এমন সময় শ্রীসুস্নাতর ফোন। জানলাম যে *বোধশব্দ* পত্রিকাটি চিরযুবা ভেটকিকে নিয়ে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে। লেখার আমন্ত্রণ। আমার যৌবনের সূচনার স্মৃতিতে জড়ানো ভেটকিকে নিয়ে লেখা মানে তো শুধুই ভেটকি নয়, তাকে ঘিরে থাকা একটা সময়। যে সময়টা নয়া-উদারনীতির থাবায় ভেঙে যাচ্ছে। তুবড়ে যাচ্ছে। ভেটকি মানেই তো সিম্ফনি সময়, কলকাতার বিগত ম্যাজিক রিয়্যাল দিনরাত্তির...

অ্যালিয়েনের সাবভার্সান

যাঁরা হয়তো-বা ভিনগ্রহ থেকে এসেছিলেন উত্তর কলকাতার ঐশ্বরিক ধরাধামে... যাঁরা সকলের কাছেই দৃশ্যমান ছিলেন না, আলোর পোকা কখনো হতে চাননি যাঁরা, যাঁরা কেবল রাস্তায় রাস্তা খুলে কলকাতা শাসন করেছেন মধ্যরাত্রে... কমরেড সিদ্ধার্থ ওরফে ভেটকি তেমনই এক অ্যালিয়েন। যার পানের পিক আর লালা-মাখা রুমাল, ফ্রেম-ভাঙা চশমা, পারিবারিক ঘড়ির দোকান থেকে খুচরো পয়সার কালেকশন, যার সকাল কমলকুমার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত, যার দুপুর কফি হাউস, যার সন্ধে উৎপলকুমার, যার সন্ধে-রাত শক্তি সন্দীপন, যার ছায়া হেয়ার সেন্ট পল্স প্রেসিডেন্সি, যার যৌবন প্রকাশ্যে মদের দায়ে লক-আপ, যার পয়সায় শক্তির বোতলগ্ল্যামার, যার বোহেমিয়ানিজমে দীপক মজুমদার, যার সুরতালে গৌতম চাটুজ্জে... যার নাম ডাকনাম নাকি শৈবাল মিত্তিরের দেওয়া (শোনা কথা, অনেকে আবার বলেন নামটা শক্তির দেওয়া, তবে শৈবাল মিত্রর দিকেই পাল্লা ভারী!)... যার হাত ধরে রাত-বিরেতগুলো সোঁ-সাঁ ছুটে যেত হ্যারিসন রোডের ট্রাম্পেট-ক্ল্যারিওনেট থেকে শ্যামবাজার, সিঁথি, বরাহনগরে... কবিতার মতোই প্রেম পেত যার, প্লেটোনিক, যার মাথায় গিজগিজ করত ফুটপাথ বদল করা ক্ষুধার্থ মিছিল... অনুশাসনের মুখে পেদে শহরে যে ওড়াত ডাডার ছাই... মনে পড়ে, গল্পের সেই বাক্সওয়ালা টলমলে ওয়েলিংটনে বাংলার খাম্বাকে যুদ্ধাস্ত্র ধরে নিয়ে টগবগ ছুটে যাচ্ছেন কংগ্রেস, সিপিএমের বিপরীতে নকশাল কমরেডদের ঘাম মাখতে... এভাবেই একদিন 'কাকা' অসীম চট্টোপাধ্যায়কে বাঁচাতে পুলিশের মুখের ওপর সম্রাট ভেটকির উত্থিত বাঙলাস্ত্র।



ভেটকি ও লেখক

কমরেড নবারুণ কি তবে সাবভার্সানের স্পর্ধা পিয়ানোখানি বাজিয়ে ছিলেন ভেটকিদের মতো ফ্যাতাড়ুদের মনে রেখেই! ইস্, এই প্রশ্ন যদি একবার নবারুণকে করতে পারতাম... ওহে নবারুণবুড়ো, কেসটা কি এটাই? মনে পড়ছে, কয়েকবছর আগে যখন ভূমিপুত্রদের মিছিল কলকাতা শাসন করছে, অসুস্থ ভেটকি ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে লাল সেলাম জানিয়েছে তির, ধনুক, টাঙ্গি আর বল্লমবাহারকে। পরে সুস্থ হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে বোতলবন্দি থেকে বেরিয়ে বারবার আমৃত্যু ভেটকি উড়েছে মিছিলে-মিছিলে... কিন্তু যা বলছিলাম, ভেটকি তো সকলের কাছে দৃশ্যমান ছিল না। যতদিন ফিনিক্সের গল্প শুনিয়েছেন সুনীলরা, ততদিন তাঁদের সঙ্গী ভেটকি ছিল ঠিকই। কিন্তু সরষের তেল আর ইসবগুলের বিজ্ঞাপনের মডেল সুনীল, শেরিফ সুনীল, আবাপ-র ঘুঘু সুনীল আর টাটা-সালেমের স্তাবক সুনীলের কথা ভেটকিকে জিজ্ঞেস করলেই তার উত্তর ছিল — 'ওর প্রেজেন্ট কন্ডিশন নিয়ে আমার বাল কোনো মাথাব্যথা নেই'। বরং এই কিছুদিন আগেও কফি হাউসে যতদিন উৎপলকুমার এসেছেন, ততদিন ভেটকি চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছে। কমল চক্রবর্তীও কফি হাউসে এলেই খুঁজতেন ভেটকিকে।

মনে পড়ছে, কবিতা-সাহিত্য-তৃতীয় শিবিরের রাজনীতিকে যারা যৌবনের ফ্যাশান ধরে নিয়েছিল, সংশোধনবাদের সেই কৃমিকীটদের সম্পর্কে ভেটকির মূল্যায়ন — 'এদের কাছে সাহিত্য-ফাহিত্য কোনো বিষয় নয়, নকশালবাড়ি কোনো বিষয় নয়, লিটল ম্যাগের নামে স্টুডেন্টস পলিটিক্সের নামে ছেলেরা মেয়েদের মাইতে কনুই ঠেকিয়ে কফি হাউসে আসবে, অলিম্পিয়া যাবে, মেয়েরা ফেমিনিজম-টিজম বলবে, তারপর কনুই-এর দিকে ইয়েটা আরও বাড়িয়ে দেবে, বিনিময়ে কোল্ড কফি, বিয়ার... আর এইসব মাগ-মাগিরা চায় খবরের কাগজে

তাদের ছবি বেরোক। গাণ্ডুগুলো চায় টিভিতে তাদের দেখানো হোক। ক-জন আর ফালগুনী হতে পারে রে, ক-জন আর চারুবাবু হতে পারে...!'

ভেটকির শুধু সেভাবে কোনো ব্যক্ত হওয়ার মাধ্যম ছিল না। মুখে বিদ্বজ্জনের মেক-আপ কখনোই লাগাতে চায়নি ভেটকি। কোনো দার্শনিক রেফারেন্স-টেফারেন্স দিতে শোনা যায়নি তাকে। জিন্স কিংবা খাদি, বাংলা আকাদেমি কিংবা লিটল ম্যাগ লাইব্রেরি — কোনোকিছুতেই সে নেই। শুধু সাহিত্যে, সাহিত্য-রাজনীতিতে, সমাজ বদলের স্বপ্ন খুঁড়ে-খুঁড়ে সে খুঁজত নিগূঢ়ের মদ। লিটারেচার আর পলিটিক্সের ফেস পাউডার সিভিলাইজেশনে আমাদের ভেটকি আসলে আবহ প্রথা-বিরোধিতার দুরন্ত এক ম্যাডনেস। ভোলেভালা, ন্যালাখ্যাপা আচরণগুলিই যেন তার স্মার্টনেস। তাই একদা একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও আদপে এই আভাঁগার্দ কোনো মাধ্যমকেই ফোকাসড করেনি। বরং কোনো এককালে কবি হতে চেয়ে জীবনের মায়াহাতছানিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে পঞ্চাশের কবিকুল থেকে শূন্যের কবিতার কুঞ্জভুমে নিজেই সাক্ষাৎ কবিতা হয়ে উঠেছিল ভেটকি। এমনকী *দেশ*-এও নাকি একবার দু-টি কবিতা লিখেছে সে। কিন্তু *দেশ*-এর কবিবাজিকে ফুৎকারে উড়িয়ে নানা সময়েই লিটল ম্যাগের আনাচে-কানাচে ঘুরেছে সে। জীবনের অলিগলি, বারুদ, বাংলা থেকে সে কুড়িয়ে নিয়েছে কবিতা...

কবিতা ও কবির দেয়ালা মেখে আসলে সে নিজেই কবিতা, সে নিজেই কলকাতার ম্যাজিক ফিল্মের কেন্দ্রনায়ক। সে যেন নিজেই মাতাল তরণি, সে যেন চিত্রভাষ্যে জ্বলন্ত জিরাফ, সে নিজেই যেন শ্মশানে-মশানে ঘোরা তান্ত্রিককবি, সে নিজেই যেন স্কচের উদার দুনিয়ায় খালাসিটোলা থেকে বেরোনো মাতালবাংলার র‍্যাডিক্যাল কার্লো গিউলানি।

শূন্য দশক, ইমেজকাল, 'নৈঃশব্দ্যের বর্ণমালা'

সকলেই জানেন, সিদ্ধার্থ ওরফে ভেটকির সঙ্গ মানেই কৃত্তিবাসের মঁসিয়েকুল, ষাটের হাংরিবৃত্ত, সত্তরের সমাজমুক্তির স্বপ্নপ্রবাহ। কিন্তু ভেটকি কোথাও থেমে থাকেনি। পঞ্চাশের কৃত্তিবাসিদের সঙ্গে তার যেমন জাদু-মাখা রাতদিন, তেমনই সে ছুঁয়ে আছে হাংরি মলয়, বাসুদেব, ফালগুনীদের ক্ষুধাদ্রোহ। সত্তরের কবিদের সঙ্গেও ভেটকি। নব্বই-এর কবি বিপ্লব চৌধুরী, অয়ন চক্রবর্তী, চন্দন ঘোষ, সুদীপ্ত চক্রবর্তীরা তো তার আমৃত্যু সঙ্গী। আর ফকির রাজা চট্টোপাধ্যায়। প্রয়াত রাজাদা আর ভেটকি ছাড়া কফি হাউস ভাবা যেত না। এসবের পরেই শূন্য দশক। কবিতা, কবিতার ডিকশনে, গদ্যের কাঠামোয় নতুন করে যখন প্লুর‍্যাল ঢেউ খুলছে, যখন ইমেজ আর অন্তর্লীন গীতিময়তা ছাপিয়ে গিয়েছে লিরিক-আধিপত্যকে। সেই শূন্য দশকেও ভেটকি এবং ভেটকিকে ঘিরে কার্নিভাল ইমেজ।

আমার সঙ্গে ভেটকির বোধহয় পরিচয় করিয়েছিল শৌভিক দে। শূন্যের কবি শৌভিক। এক বোহেমিয়ান। রতনে রতন চিনবে, এটাই শৌভিকের স্লোগান। তো, শৌভিকরতন তার বন্ধু ভেটকিরতনের সঙ্গে পরিচয় করাল অতনুঅভাগার। ব্যস, ক্রমে ঋপন ফিও, স্বাগতা দাশগুপ্ত, অরূপ ঘোষরা। বলে রাখা ভালো, আমার অনেক আগে থেকেই ভেটকির শূন্যের সখা-সখীরা হলেন শৌভিক দে, দেবলীনা ঘোষ (ডিজি), অনুসূয়া ভট্টাচার্য (মুন্নি) প্রমুখ। শৌভিকের রোম্যান্টিসিজমে ফকির রাজাদা আর ভেটকি ইন্সপিরেশন। *প্রতিষেধক* পত্রিকার একসময়ের সম্পাদক ও কবি সৌপ্তিক চক্রবর্তী, কবি বিপ্লব ঘোষরা তার ঘনঘোর বন্ধু। একদিন মদ্যপ শৌভিক আর আভাঁগার্দ ভেটকি কফি হাউসে, সিঁড়ি বেয়ে এঁকে-বেঁকে। হঠাৎ গদাম করে দেওয়ালে নিজের কপাল চালায় ভেটকি! শৌভিক ভ্যাবাচ্যাকা, ভেটকিদার কি পুরো তারটাই কেটে গেছে! তার উত্তর, 'দেওয়াল-ফেওয়াল কিল করে দেব শালা! দেওয়াল মানি না!'

হ্যাঁ, অপরিচিতের দেওয়াল বারবার ভেঙেছে ভেটকি, পূর্ববর্তী দশকের সঙ্গে পরবর্তী দশকের জ্যোৎস্না-রাতে মায়াবী বনভোজন আর প্রেমপ্লাবনে সে আসলে অনুঘটক। আর সমাজের ছেনালট্যাবু, ভদ্র বাবুয়ানির দেওয়াল চিহ্ন-ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতেই তো চেয়েছিল এই চিরফ্যাতাড়ু।

মনে পড়ছে, *লালন* পত্রিকা থেকে যখন স্বাগতা দাশগুপ্তর কাব্যগ্রন্থ *কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক*, শৈবাল সরকারের *২১ নম্বর ভালো থাকা*, হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়ের *যারা চুরি হয়ে যায়* ও আমার *নেভানো অডিটোরিয়াম* প্রকাশ করার কাজ চলছে, তখন বই প্রকাশের নানা কাজে অগ্রজের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভেটকি। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আনন্দে খালাসিটোলায় ভেটকির বাংলা পার্টি! ওদিন একটা সিগারেট কেনার জন্যেও আমায় খরচ করতে দেয়নি।

আগেই বলেছি, ভেটকির প্রেম পেত। মুক্তির দশকের শেষ থেকে তাঁর প্রেম পাওয়া শুরু। শূন্য দশকে তাঁর প্রেম পাওয়া শেষ। ভেটকি তো বহুদিন ধরে আমাদেরই একজনের প্রেমে মাতালস্য মাতাল, তাঁকে বর্ষা-মাখানো চিঠি ভেটকির! আবার আমাদের আরেক কবিবন্ধুর প্রেমেও সে ডগমগ! এঁদের প্রেমে ভেটকি কতবার অতনু-অধমের সঙ্গে খালাসিটোলায় তরল ঢেলেছে! বেশ কিছুদিন ধরে আমার 'প্রেমিকা' আর ভেটকির প্রেমিকা একজনই। ভেটকি বলত, 'আমি কেবল ওকে মাঝে-মধ্যে ফোন করব, আর ও-তো বাংলা-টাংলা খায়, তাই একটু বাংলা খাওয়াব ওকে।' এই ছিল চিরকুমার ভেটকির আবেদন।

এইসব বলতে-বলতে একদিন হেয়ার স্কুলের কাছে হঠাৎ পড়ে যায় ভেটকি। মাথা ফেটে রক্ত। নাক দিয়ে রক্ত। আমি ও দেবলীনা সামনে। তখন আমরাও টাল্লি। ভেটকির বাড়িতে জানানো হল। ডাকা হল ডাক্তার, আমরা ভেটকির মাথার সামনে দাঁড়িয়ে, লাজুক হাসি হেসে ভেটকি আমায় বলেছিল, 'এভাবে মরে গেলে হবে স্যার? কিছু একটা ওলোট-পালোট করে মরতে হবে।' কমরেড ভেটকির এই বাক্যগুলি যেন-বা নীল ব্যালেরিনার নৃত্যের দ্রোহ, যেন-বা চোখ ফালাফালা, যেন-বা মোহমঞ্চ ভেঙে আঙিনায়-আঙিনায় ধুলোনাট্যের পার্বণ, যেন-বা ওয়াই অ্যাঙ্গেল ডিসটরশনে পর্দা ফাটিয়ে তর্জনি সরাসরি দর্শকের মস্তিষ্কের ধূসরে, রক্তজালিকায়... যেন-বা মাও-ভাষ্যের সঙ্গে ধম্মচেতনের নিগূঢ় বিস্মৃতি মিশিয়ে দেওয়া কিনো-খ্যাপার বিবৃতি, যেন-বা বলিভিয়ার জঙ্গলে মোটরবাইক। হ্যাঁ, এভাবেই ফর্দাফাঁই করতে চেয়েছে ভেটকি। নিজের রক্তমাংসে, স্মৃতির মাদকনদীতে না-পরোয়ার প্রবাহ খুলেছিল সে।

সে-যাত্রায় বেঁচে যায় ভেটকি। কিন্তু রাস্তাই যে তার একমাত্র রাস্তা। কলেজস্ট্রিট ফুটপাথে হাঁটতে-হাঁটতে বাসের ধাক্কায় আবার সে রক্তাক্ত। ইতিহাস দেখেছে শহরের ট্রামকে কবির রক্ত চাটতে। আবারও ইতিহাস, বাসের ধাক্কায় কবিতা লুটিয়ে পড়ার। মেডিকেলে চিকিৎসা চলল। কিন্তু, শূন্য দশকের শেষে ভেটকিও শূন্যলোকে চলে যায়। তারিখটা ২০১০-এর ৩১ মে। আমি তখন দৈনিক স্টেটসম্যানে কর্মরত। ব্যস্ত সাংবাদিক। বুর্জোয়া কাগজের অফিস আমার হাতে-পায়ে শেকল লাগিয়ে রেখেছিল। একটি কবিতা কিংবা একটি ফ্যাতাড়ুর মৃত্যুতে শ্মশানে যেতে পারিনি, শুয়োরের খোঁয়াড়ের রোজনামচা কাগজের চক্করে। আমি তো শালা চাকরবাকর! শুধু কমরেড শৌভিক গিয়েছিল, 'মৃত' ভেটকির পায়ে উৎসর্গ করেছিল নিজের কাব্যগ্রন্থ *নৈঃশব্দ্যের বর্ণমালা*। কোথাও কোনো তোপধ্বনি নেই। নিঃশব্দে কবিতায়-কবিতায় শৌভিকের বিদায়বার্তা ভেটকিকে। চুল্লিতে ছাই হয়ে গেল ভেটকির শরীর-ভর্তি কবিতা। ফোনে স্বাগতার গলার স্বর ভার। দেবলীনা স্তব্ধ। প্রেসিডেন্সির কদমগাছের ফুলগুলো থমকে। চাঁপাফুলের গন্ধদের হরতাল। ভেটকির জন্য নিজের কবিতার লাইনগুলি আউড়ে ছিলাম — 'এ মহাপৃথিবী, বে-তার জ্ঞাপন / বুঝবে না তুমি / কীভাবে দেওয়ালে ফাটল বাঁধে, / আলো পুড়ে যায় / নীলনীল ছাই কবির মৃত্যু / কৃষ্ণবিন্দু মদে আর গানে উল্লাসে মাতে...'

বাগবাজার ঘাটে, মুখে তখন শক্তির কবিতা!

মরফিনে একমাত্র রক্তমাংস আর স্মৃতিজাদুর স্যুরবাস্তব

এই শহরের কোনো বাগানে কে ঘুমিয়ে আছে জানি না, কারণ ফুলেরা ঘুমিয়ে পড়ার আগে এ-শহর মায়াখোক্ষসের মুদ্রাপ্রকরণ, আর তার ভেতরে যে অর্গ্যান, যে আত্মনিবিড় ধ্যান, সেসব কবেই মরে ভূত... সেসব কিছু যখন মরফিনে ঝিমিয়ে পড়ছে, পিসহাভেনের বরফে শহরের সেই মানচিত্র শুয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে একটিবার আমি চেষ্টা করেছিলাম ক্যামেরার লেন্স দিয়ে দৃশ্য বুনে-বুনে, সাউন্ডস্কেপ বুনে-বুনে, সময়ের ভেঙে যাওয়ার কবিতা ও কমেন্ট বলতে সিনেমায়। চার বছর ধরে তৈরি হয়েছিল *প্রিয় মরফিন*। টাকা-পয়সার অভাবে বহুদিন পরপর ছবির শুটিং হত। ভেটকি একবার বলল, 'শোন, ঘড়ির দোকান বেচার টাকায় তোকে হাজার তিরিশ দিয়ে দেব।' ভেটকির পকেটে কখনোই দশ-বিশ বড়োজোর পঞ্চাশ টাকার বেশি থাকত না। এককালে শুধুই খুচরো পয়সা থাকত। তা সত্ত্বেও শক্তিকে মদ খাওয়াত ভেটকি। এবার সিনেমায় টাকা দিতে চাওয়ার বাসনা তার!

ভেটকিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু মাধ্যমের শৃঙ্খলা তো তাকে বাঁধতে পারেনি। তাই, নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রে নয়, একটি মুহূর্তের জন্য কমরেড ভেটকি ছবিতে হাজির হয়েছেন 'ভেটকি' হিসেবেই। তবে নিষ্ঠা তার কম ছিল না। একবার শুটিং-এর আগের দিন ভেটকি জানায়, তার একশো দুই জ্বর। শুট-এর কলটাইম জেনে নেয়। আমরা ভেবেছিলাম, ও শুটিং-এ আসতে পারবে না। সকালেও ফোন করে জানলাম, জ্বর তখনও একশো। সকাল ন-টা তখন, সিঁথিতে পৌঁছেছি। দেখি, ভেটকির গা পুড়ে যাচ্ছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে! বলল, 'মদ খাব, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। হতভম্ব আমি মদ কিনে দিলাম। দেখি, ভেটকি লাফাচ্ছে! আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তো একটু আগেই বললে, জ্বরে শুয়ে আছ। এত অল্প সময়ে জ্বর মাথায় নিয়ে এলে কী করে?' ভেটকির উত্তর, 'উড়ে-উড়ে। তোকে ঝুলিয়ে কী লাভ? তাই উড়ে-উড়ে চলে এলাম।'

এর আগে একদিন বাগবাজারে শুটে ভেটকি... পাহাড়প্রমাণ গোপালমূর্তি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গঙ্গার পাড়ে... রতনে তো রতন চেনে, ভেটকিও চিনে নিয়েছিল শিশুশ্যাম গোপালকে... ভেটকি গোপালের ভুঁড়িতে গা এলিয়ে দিল, ক্যামেরার লেন্স তখন উড়ে গিয়েছে সিদ্ধার্থ, মানে, ভেটকির দিকে। নিষ্পাপ হাসি দিয়ে শক্তির *চাবি* কবিতাটি বলতে শুরু করল ভেটকি, তবে তা নিজের মতো করে... বলেছিল — 'তোমার কাছে পড়ে আমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি, থুতনি-পরে তিল তো তোমার আছে, ও মন কোন দেশেতে যাবি?' অসামান্য আবেদন ছিল ভেটকির বলার মধ্যে। ইউনিটের অনেকে ওই শটটিকে রি-টেক করতে বলল, কারণ, কবিতাটা তো ওরকম নয়, সঠিকটা স্মরণ করানো দরকার ভেটকিকে। কিন্তু ডিজি-র বক্তব্য ছিল, 'ভেটকির মুখে এটা শক্তি চাটুজ্জের কবিতার বিনির্মাণ... এটা রি-টেক করলে স্পিরিটটাই হারিয়ে যাবে'। ডিজি-র ওই কথা আমায় নাড়া দিয়ে গেল...। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখন মনে পড়ছে এক মহিলার প্রেমে ব্যথা পেয়ে অশ্রুকাতর ভেটকির মুখ। বলতে ইচ্ছে করছে, 'অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে / তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো / লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?'

তো, আর কীই বা বলতে পারি? ভেটকি মারা গেল যেদিন, সেদিন থেকে হয়তো আমরা রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভাবি। চলে গেছে রাজাদা। নবারুণ চলে গেলেন। কে আছে এই শহরে? বুদ্ধ? মমতা? অভীক সরকার? কে জেগে আছে এই বাফুন শহরে? আজ্ঞে, শপিং মলগুলি আর রিয়েলিটি টিভি শো আর সোপ অপেরা আর গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির 'সত্য' উৎপাদন।

উত্তর কলকাতার রাজপুত্র, ফ্যাতাড়ু ও তার সাবভার্সানকে দেখেছিলাম চাক্ষুস। আমাদের সিনেমায় সবকটি চরিত্রই ছিল মৃত। শুধু ভেটকি জীবিত। কেননা সে ভিনগ্রহের বাসিন্দা। জাদুপ্রদেশের উড়ন্ত রাজপুত্তুর।

ভেটকি-কথা

সন্দীপ দত্ত

ভেটকির পোশাকি নাম সিদ্ধার্থ দাস; ও-নামে ওকে কেউ চেনে না। 'ভেটকি' নামটাই খ্যাত হয়ে গেল সবার কাছে। এই নামেই ওর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। কে যে ওর নাম রেখেছিল! এমনতর অশ্রুতপূর্ব নামকরণ! এমন উপযুক্ত লাগসই নামও খুব কম পেয়েছি।

কলেজস্ট্রিটের ছেলে ভেটকি — বলা যায় আমাদের পাড়ার ওপারেই মহাত্মা গান্ধি রোডের ওপর ছিল ওদের দোতলা হলুদ রঙের বাড়ি। পাশে ওদের একটা চশমার দোকান ছিল। দাদা-বৌদির আদরে ভেটকি বড়ো হয়েছিল।

এমন ইনটারেস্টিং বিচিত্র চরিত্র আর দু-টি নেই; অন্তত আমার জানা নেই। ভেটকির কথা মনে হলেই চোখে ভাসে প্যান্ট-জামা পরা চশমা-চোখো একটি হ্রস্বকায় চরিত্র টলমল পায়ে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে হেঁটে চলেছে। টলতে-টলতে থলি হাতে বাজারও মাঝে-মধ্যে যেতে দেখেছি। সংসারের আর কী কাজ করত জানি না।

চশমার দোকানে বসত। দোকানের সামনে পাতা একটা কাঠের বেঞ্চিতে, কলেজস্ট্রিটে এলে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবি বিনয় মজুমদার, কবি শক্তি

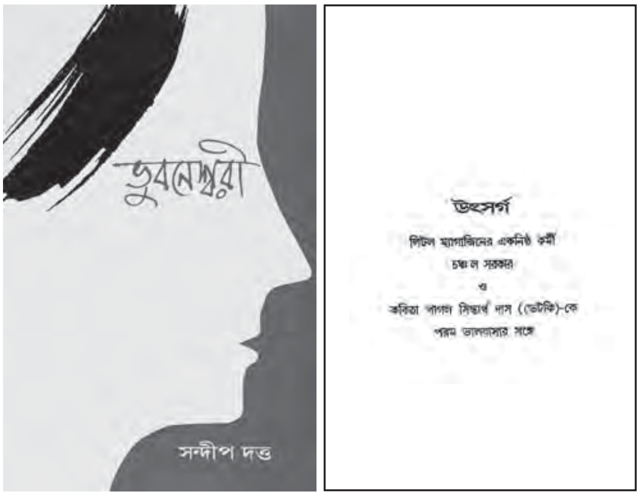
চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়রা মাঝে-মধ্যে বসতেন। দেখা হলে বলত, 'সন্দীপদা, কাল বিনয় এসেছিল'। ভেটকি কারো নামের শেষে 'দা' বা 'বাবু' সম্বোধন করত না। ওর কাছে শক্তি-বিনয়-অমিতাভ-পৃথ্বীশ। কে জানে, আড়ালে আমি 'সন্দীপ' হয়ে যেতাম কিনা! ওর এরকম আচরণে থাকত অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য। ওর পক্ষেই তো এমন বলা সম্ভব। কবিতাপ্রেম ছিল ওর প্রাণে-মগজে। গড়গড় করে আওড়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত। শক্তিদা যেদিন মারা গেলেন, সে কী হাউ-হাউ কান্না ভেটকির! সে কান্না থামায় কে! কবিতাকে ভালোবেসে কবিতার প্রেমে মজেছে, কবি তাই তার কাছে ছিল 'অন্তরের দেবতা'।

ওর প্রণাম বস্তুটাও দেখার। প্রায় রাস্তা থেকে হাত নেমে ওপরে উঠত অথবা স্যালুট নেতাজি কায়দায়! দেখা হলেই ভেটকির থেকে পেতাম নানা অজানা খবর — অমুকের অ্যাক্সিডেন্ট, তমুক হাসপাতালে। কত টুকরো-টুকরো খবর। 'বইমেলায় যাচ্ছেন? সুধাংশু লিটল ম্যাগাজিনকে জায়গা দেবে না বলেছে।' এমনসব বার্তাও থাকত ওর পকেটে। 'বিনয়ের কাল জন্মদিন, ঠাকুরনগর যাবা না?' এমন কতরকম জিজ্ঞাসা।

মদ্যপান করত। আর পান খেত। পান খেয়ে খিলখিল অবিরাম হাসি। হাসত আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে পানের কষ বেরোত। ভেটকির ঠেক ছিল অনেক। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে সান্ধ্যকালীন ঠেকে আড্ডা চলত প্রেসিডেন্সির পড়ুয়াদের সঙ্গে। অনুষঙ্গে ছিল নেশার নানা উপাদান। বলতাম, 'ওরে এসব খাস না, ছাড়।' শুনে হাসত, এড়িয়ে যেত।

একবার বইমেলার মাঠে ভেটকি মদ্যপান করে গড়াগড়ি দিল। এ-ও প্রতিবাদ, সে কথা কে জানে? লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভেটকির ছিল ভেটকির মতোই সেই প্রতিবাদী দৃশ্য। আমরা মনে রেখেছি সেদিনটার কথা। পুলিশ ভেটকিকে সেদিন স্পর্শও করতে পারেনি।

ভেটকি গোপনে কিছু কবিতাও লিখেছিল। জানি না সেসব কোনোদিনই প্রকাশিত হয়েছে কিনা। মৃত্যুর পর অবশ্য দু-একটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। আমার একটি অকিঞ্চিৎকর কবিতার বই ওকে উৎসর্গ করেছিলাম।



ভেটকিকে উৎসর্গ করা বই

২০১০ সালের পুরসভা ভোটের পরদিনই ভেটকি চলে গেল। ৩১ মে। আর ভেটকির সঙ্গে দেখা হয় না। ওদের সেই চশমার দোকান আর নেই। আর ভেটকি শুধোবে না, 'সন্দীপদা, বিনয়ের শোকসভা, যাচ্ছেন তো? অমলেন্দুরা করছে' — 'বইমেলা কবে হচ্ছে?' — 'কাল অমিতাভ, পৃথ্বীশ এসেছিল' — 'আপনার লাইব্রেরিতে কাল একটি মেয়ে যাবে কাজ করতে, কবে-কবে খোলা থাকে?'... এমনতর নানা শব্দ অক্ষর বাক্য!

ভেটকি নেই, বদলাচ্ছে কলেজস্ট্রিট। অভাব বোধ করি। কালের নিয়মে সব একসময় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু ভেটকি? ভেটকি তো কবি নয়, ভেটকি তো স্বনামধন্য কেউ নয়? ভেটকি নিয়ে *বোধশব্দ*-র কাজ করার মধ্যে আছে অপরের অনুসন্ধান। *বোধশব্দ* এর আগেও এমন কাজ করেছে। ভেটকিও বাদ পড়ল না। ভেটকিকে বাদ দেওয়া যায় না — টলমল পায়ে এগিয়ে আসছে, আর সেই আশ্চর্য সেলাম!

ভেটকি, এক অনবদ্য কবিতাপ্রেমিক

অর্পিতা মিত্র রায়

স্মৃতিচারণের শুরুতেই স্বীকার করে নিই আমার সঙ্গে ভেটকির পরিচয়ের স্থায়িত্ব তিন-চার বছরের বেশি নয়। কালস্রোতে আমরা ভেসে গিয়েছি। ভেটকি রয়ে গিয়েছিল তার নিজের জায়গায়। সহজ সরল কবিতাপ্রেমী সদাহাস্যময় উদার মনের এই মানুষটি, আমরা যতদিন কফি হাউস এবং কলেজস্ট্রিট পাড়ায় নিয়মিত ঘোরাঘুরি করেছি, তার সঙ্গে জড়িয়েছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে। কফি হাউসের আবহমানকালের গল্পের চরিত্র সে। কফি হাউসের টেবিলের মানুষগুলো পালটায়, ভেটকি তার স্বকীয়তায় রয়ে যায় একই জায়গায়।

১৯৮৪ সালের প্রথমদিকে আমাদের কবিতা পত্রিকা *কোমবিয়াঁ* প্রকাশ পায়। আশির দশকের কবিদের নিজস্ব মুখপত্রের দাবি নিয়ে প্রকাশিত হলেও সে পত্রিকা চলেনি বেশিদিন। দু-টি সংখ্যা প্রকাশের পরই ভাবনা বদলে পূর্ণাঙ্গ ছোটো পত্রিকা *প্রতিফলন* প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই আমরা। এই *কোমবিয়াঁ*-র সূত্র ধরেই বহু নবীন এবং প্রবীণ কবি, কবিতাপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের। তাদেরই একজন ভেটকি।

'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া', 'কেউ কথা রাখেনি', 'তোমার মুখ দেখলে মনে হতো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে', 'দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়' — এরকম অসামান্য সব পঙ্ক্তি বলতে-বলতে বেশ নাটকীয়ভাবে কফি হাউসে প্রবেশ করত সে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত — এমনই সব প্রথিতযশা কবিদের একনিষ্ঠ ভক্ত ও তাঁদের স্নেহভাজন ছিল ভেটকি। কখনো সদ্যপ্রকাশিত কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা হাতে নিয়ে ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়ানো পানের পিক মুছতে-মুছতে বিন্দাস ভঙ্গিতে ছিল তার প্রবেশ। কখনো এসে জানাত, খালাসিটোলা থেকে আসছে। কখনো হাতে *কলেজস্ট্রিট* পত্রিকা নিয়ে ঢুকে বলত, দেবকুমার বসুর ওখান থেকে এল।

টানা বা সম্পূর্ণ একটা কবিতা তার মুখে শুনিনি কখনো। শারীরিক অসুস্থতা তার কারণ হতে পারে। কিন্তু যেদিন যে কবিতার লাইন বলত, সারাদিন সেটা নিয়েই কাটিয়ে দিত। সঙ্গে শক্তিদা কী বলেছে, অমিতাভদা কী করেছে — এইসব টুকরো-টাকরা কথা। কবি ও কবিতার প্রতি এমন আনুগত্য ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া সত্যিই বিরল।

কোমবিয়াঁ-র পর *প্রতিফলন*। প্রথম পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকেই আমরা অনুভব করছিলাম, আমাদের পত্রিকা প্রকাশস্থল, ১/৩ এ এন সাহা রোড (পাতিপুকুর-লেকটাউন অঞ্চল) লিটল ম্যাগাজিনের প্রাণকেন্দ্র কলেজস্ট্রিট চত্বর থেকে অনেকটা দূরে। কফি হাউসে বসে আমরা যখন বিষয়টি আলোচনা করছি, ভেটকিই সমাধান বাতলাল। বলল, ৮০ মহাত্মা গান্ধি রোডে ওর চশমার দোকানের পিছনে একটা ঘর আছে। আমরা স্বচ্ছন্দে সেই জায়গাটা যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। *প্রতিফলন*-এর প্রথম দুটো সংখ্যার প্রকাশকাল ১৯৮৪-৮৫ এবং সেখানে কার্যালয় ও পরিচালনা দপ্তর হিসেবে সেই ঠিকানারই উল্লেখ ছিল। *প্রতিফলন*-ও কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। আমরা যারা এই পত্রিকাটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম (আমি, অভিমন্যু রায়, জয়ন্ত

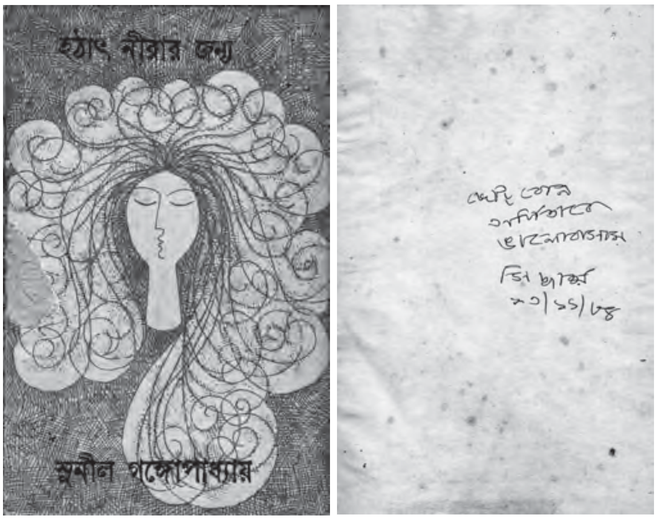
চৌধুরী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য) কর্মান্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পত্রিকা প্রকাশে দীর্ঘ বিরতি ঘটে। মার্চ, ১৯৯৬-এ তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন আমরা প্রত্যেকে নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। সেই কারণে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আড্ডা, সাহিত্যচক্র পরিচালনা, নিয়মিত বসা তখন আর আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাতানব্বই সালে *প্রতিফলন*-এর ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তখন ৮০ মহাত্মা গান্ধি রোডে আর *প্রতিফলন*-এর কার্যালয় ছিল না।

৮০ মহাত্মা গান্ধি রোডের কার্যালয়ে যখন আমরা বসতাম, ভেটকি বাইরে দোকানদারি করত। চশমার দোকান। পুরোনো কাচের র‍্যাক, আসবাব। অল্প কিছু চশমার ফ্রেম। শুনেছি সে দোকান থেকে শক্তিদা ও অন্যান্য কবিদের মাঝে-মাঝে চশমা বানিয়ে দিত সে। খুব মন দিয়ে মাপ-টাপ নিত, রসিদ কাটত। খদ্দেরের আনাগোনা বেশি ছিল না। খদ্দের চলে গেলেই আমাদের আড্ডায় চলে আসত। কবিতা ছাড়া কোনো বিষয়ে খুব-একটা কথা বলত না, মন দিয়ে শুনত। একবার, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় আমাদের সকলকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করল। দোকানের পাশেই ওদের বাড়ি। লক্ষ্মীপুজোর সন্ধ্যায় মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের পরিবেশ যেমন হয়, তেমনি এক আবহে আমরা তিন-চারজন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পরিবারের লোকেরাও যথেষ্ট ভালোভাবেই আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে অনুভব করেছিলাম, ভেটকির এই সরল, উদাস, আপনভোলা, বাউন্ডুলে স্বভাবের জন্য তাঁরা ব্যথিত, চিন্তিত।

সেদিন ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদেরও মনটা খুব খারাপ লাগছিল। ভেটকিও যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আজ যখন লিখতে বসে ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে, তখন মনে হচ্ছে, ভেটকির দিদি তো সেদিন কিছু ভুল বলেননি। আমরা সকলেই তো একটা সময়ের পর নিজের-নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছি। কফি হাউস, কলেজস্ট্রিট পাড়াকে কষ্ট হলেও পিছনে ছেড়ে এসেছি। ভেটকি কিন্তু একইরকম কবিতাপাগল সদাহাস্যময় সাহিত্যপ্রেমী রয়ে গিয়েছে। হয়তো ভেটকির বদান্যতায় আমাদের মতো আরও অনেক লিটল ম্যাগাজিনের আঁতুড়ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ৮০ মহাত্মা গান্ধি রোডের সেই অপরিসর ছোটো ঘরটি।

আচ্ছা, ভেটকি কি তার এই সর্বজনপ্রিয় 'ভেটকি' নামটাতে খুশি ছিল? কারো সঙ্গে প্রথম আলাপ হতেই, সে নিজে তার এই নামের কথা সগর্বে জানাত। শক্তিদা, সুনীলদা, অমিতাভদা এমনসব ব্যক্তিরা যে তাকে এই নামেই ডাকে এবং ভালোবাসে, সেটা জানাত — এবং সেটা নিয়েই নামের প্রতি একটা মোহ ছিল। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও একটা ঘটনা এই প্রশ্নটা আমার মনে জাগিয়েছিল। একদিন আমরা ৮০ নম্বরের কার্যালয়ে বসে আছি। ভেটকি হঠাৎ এসে আমার হাতে একটা বই দিল। তাকিয়ে দেখি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *হঠাৎ নীরার জন্য*। শুধু তখন কেন, আজও যদি কেউ হাতে *হঠাৎ নীরার জন্য* দেয়, বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠবে, তা নিশ্চিত জানি! অবাক হয়ে তাকিয়েছি। ভেটকি মুচকি হেসে বই-এর প্রথম পাতাটা খুলে দিল। অপটু হাতের লেখায় সেখানে উজ্জ্বল — 'ছোট্ট বোন অর্পিতাকে ভালোবাসায় সিদ্ধার্থ ১৩/১১/৮৪'।

আমার প্রতি এই বিশেষ স্নেহ-ভালোবাসার কারণও বোধহয় ছিল শক্তিদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কোনো কথা প্রসঙ্গে ভেটকি জেনেছিল, আমি সম্পর্কে শক্তিদার শ্যালিকা। শক্তিদার কাছের মানুষ, অতএব তারও কাছের মানুষ! এমন সহজ সমীকরণেই সে বিশ্বাস করত। শক্তিদাকেও দেখেছি, কখনো ভেটকি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে অদ্ভুত প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে। শক্তিদার অবিশ্বাস্য পরিচিতি ও ভালোবাসার জগতে তাঁর এই গুণমুগ্ধ ভক্তের এক বিশেষ স্থান ছিল। মনে আছে, শক্তিদার মৃত্যুর পর, তাঁর দেহ যখন বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে শায়িত, সেইসময়ে সেখানে পাগলের মতো ভেটকি এল; শক্তিদার সামনে এসে 'তুমি চলে গেলে, বস্!' বলে তার হৃদয়বিদারক হাহাকার; শুনে, ভেটকিকে যাঁরা চেনেন না, তাঁদের অনেকেই চমকে উঠেছিলেন। শুনেছি, তার পরের চার-পাঁচ দিন নাকি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে উন্মাদের মতো কলেজস্ট্রিট চত্বর থেকে শুরু করে কলকাতার নানাপ্রান্তে পরিচিত বন্ধু কবিতাপ্রেমীদের কাছে ঘুরে বেড়িয়েছিল এই শোকের থেকে পরিত্রাণ পেতে।



উপহার

আজ ভেটকি নেই। ভেটকিকে নিয়ে লিখতে বসে তার পুরু কাচের চশমার নীচে কৌতুক-ভরা চোখ আর সদাহাস্যময় মুখের কথা বারে-বারেই মনে পড়ছে। কবিতাকে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে নিয়ে চলার এক অননুকরণীয় চরিত্র সে। কখনো যদি কোনো প্রবন্ধকার কবিতাপ্রেমীদের নিয়ে লেখেন, তবে সেখানে ভেটকির চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হবে, একথা নিশ্চিত জানি।

স্থানাঙ্ক

কনিষ্ক ভট্টাচার্য

মহাকাব্যকার তাঁর চরিত্রদের নামকরণের ব্যাপারে নিশ্চয়ই বেশ ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। বর্ণনার বিস্তৃত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রদের নাম প্রায়শই তাঁদের চারিত্রিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, এমনকী কোথাও তাঁদের পোশাকের রঙের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। তাছাড়া পিতৃমাতৃপরিচয়, বংশপরিচয় এসব তো আছেই। এ-ব্যাপারে মহাকাব্যকার বেশ সোজাসাপটা লোক, কোনো ব্যাজস্তুতি-টুতির ধার ধারেননি তিনি, নাম পড়েই হে পাঠক বুঝে নাও কেমন লোকের কথা বলছি আমি। গ্রে-র পঞ্চাশাধিক শেড্স থাকলেও লোকটি মোটামুটি এইরকম, যেমন নাম আমি দিয়েছি। তিনি তো মহাকাব্যকার, তিনি বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারেন। কিন্তু কলেজস্ট্রিটের বাসিন্দা শ্রীসিদ্ধার্থ দাস, যে কিনা সেন্ট পল্স কলেজে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিল, তাকে এহেন নাম কে দিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলে কলেজস্ট্রিটীয় প্রায় সব মানুষই বলবে, ও-নাম, ওই নাম তো শক্তি চাটুজ্জের দেওয়া। তবু সমবয়সি কারো-কারো স্মৃতিতে আছে, তারা যখন ওই নামে তার বাড়িতে গিয়ে ডাকত, তখন একদিন তার অত্যন্ত স্নেহশীলা বউদি বলেছিলেন আস্তে-আস্তেই — শোনো, ওর নাম 'সিদ্ধার্থ', ওকে 'সিদ্ধার্থ' বলে ডাকবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সিদ্ধার্থর সেই সমবয়সি বন্ধু, বড়োবউদি কেমন আছেন, কে জানে!

এক তরুণ কবি ও পত্রিকা সম্পাদক। কলকাতার বাইরে তাঁর বাড়ি। পত্রিকা করেন জেলা থেকে। তিনি এসেছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। এক প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত কবি পরামর্শ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়? প্রবীণ জানালেন, কেন, কফিহাউসে!

— আসলে ঠিক চিনি না তো, যদি একটু লিখে দেন।

— ও লিখে দেওয়ার কিছু নেই, তুমি দেখলেই চিনতে পারবে।

— মানে, কীভাবে?

প্রবীণ জানালেন, কীভাবে। কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসেন সেই তরুণ। কাঁধে জিন্সের ঝোলাব্যাগ — ভিতরে তাড়া-তাড়া আগুন — কোনোটা পাণ্ডুলিপি — কোনোটা গ্যালি প্রুফ, লেটারপ্রেসে ছাপা। কপালে ঘাম আর শিয়ালদা স্টেশনের ধুলোর কুমিরডাঙা। পায়ে চটি। তিনি এসে দাঁড়ান কফি হাউসের দরজায়। দরজার মুখোমুখি থামের পাশে চাচা দাঁড়িয়ে, তিনি কফি হাউসের ওয়েটারদের হেড — ইয়া গোঁফ, দর্শনীয়। তরুণ ঈষৎ উঁকি-ঝুঁকি দেন এদিক-ওদিক, তারপর টয়লেটের দিকে পা বাড়াতেই কাউন্টারের কাছাকাছি একটা টেবিলে এসে দেখেন একজনকে। হ্যাঁ, প্রবীণ কবি যেমন বলেছিলেন, ক্লাস সেভেনের জীবনবিজ্ঞান বইতে ঠিক যেমন আঁকা থাকে 'একটি আদর্শ ভেটকি মাছের চিত্র', নীচের ঠোঁটের কারভেচারটা ঠিক তাই-ই! বলেছিলেন, অত ভেব না। কফি হাউসে ঢুকে যাকে দেখে ঠিক ভেটকি বলে মনে হবে, সে-ই ভেটকি।

তবে ইনিই ভেটকিদা। মুখে পান আর পানাসক্ত চোখ সমান লাল। এরই সন্ধানে এসেছেন তিনি...

মাছ কখন জল খায় আর রাজকর্মচারী কখন ঘুষ খায়, তা নাকি জানা যায় না বলে প্রচলিত। তেমনই রসিক ভেটকিদা কখন রসসিক্ত হয়ে উদ্যত লাল দোতলা বাস দু-দিকে থামিয়ে কলকাতার জিসুর মতো হ্যারিসন রোড পার হবে, তা কেউই জানত না। ভারী চশমা নেমে এসেছে নাকের ডগায়, এতোল-বেতোল পায়ে সে উঠে আসে কফি হাউসের সিঁড়ি বেয়ে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে, চশমার কাচকে অনায়াসে অস্বীকার করে তার ওপর দিয়ে তাকিয়ে অবয়ব খোঁজে, চেনা অবয়ব — চেয়ারে-চেয়ারে চেনা অবয়ব। কী করে সেই মোটা কাচকে অস্বীকার করে সে খুঁজে পেত, তা এক রহস্য — কিন্তু পেত ঠিকই। ভেটকিদার চেনা অবয়বের অভাব সেকালের সকালে কফি হাউসের দরজা খোলা থেকে চাপড় মেরে দরজা বন্ধ হওয়া অবধি থাকত না। বোধহয় ভেটকিদার স্মৃতির চেনা অবয়ব সেই মুহূর্তে কফি হাউসে কেউ ছিল কিনা সেটা বিষয়ই নয়, বরং যারা সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিল তাঁদের সকলেরই চেনা অবয়ব ভেটকিদা। ফলে সদ্য স্কুল-পেরোনো থেকে মধ্যবয়স্কদের অসংখ্য অবারিত টেবিল ভেটকিদার জন্য। সে বসল, আর তৎক্ষণাৎ সেই তরুণ কবি চিনতে পারলেন তাকে, এ-ই ভেটকি। টেবিলে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি অবাক হয়ে, কী নামে ডাকলেন ভদ্রলোক ভেটকিদাকে — সিদ্ধার্থবাবু!

— সিদ্ধার্থবাবু, আমি আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওপর একটা লেখা তৈরি করছি, তাই অমুকবাবু পাঠালেন আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে...

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যের বহু ভক্ত প্রায়শই তেমন না-পড়েও। একে তিনি নিজের জোরেই মাতাল, তার ওপর নানা নাগরিক মিথ জুড়ে-জুড়ে কবির মহাকাব্যোপম জীবন — কালিক কবিদের এক আদর্শ চুম্বক তিনি। সেদিন সেই তরুণকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন আর কথোপকথনে দেখেছিলাম ভেটকিদার স্মৃতিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক বিপুল সংখ্যক কবিতা ছেদযতিচিহ্নসহ ছাপা। অথচ মাঝে-মাঝেই আমরা অনেকেই লোকটাকে চেনা লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি হাতড়াতে দেখেছি। 'ভেটকি' নামটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া কিনা জানতে গিয়ে পাড়ার পুরোনো লোকজন বললেন,

— না-না, ছোটোবেলায় ওর নামই ছিল 'ভটকাই'।

— কেন, এমন নাম?

— জানি না।

ভেটকিদার সঙ্গে কখনো খালাসিটোলা কিংবা বারদুয়ারি যাইনি। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আড্ডার কারণে কলেজস্ট্রিটেই ভেটকিদাকে চঙ্ক্রমণ ও পুনঃচঙ্ক্রমণরত দেখেছি। চশমার দোকান ছিল ভেটকিদার একটা — নেহাত দুর্ভাগা না হলে, কিংবা ভেটকিদার সম্পর্কে পূর্ণত অজ্ঞান না হলে, সেখানে কেউ চশমা সারাতে যেত কিনা সন্দেহ। এক কলেজছাত্রী গিয়েছিল, নেহাতই ফার্স্ট কিংবা সদ্য সেকেন্ড ইয়ার। ফ্রেম থেকে কাচটা খুলে ফেলার পর, হঠাৎ কাচ-খোলা চশমার ফ্রেমটা হাতে কাজ থামিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি যথারীতি অস্বস্তিতে... তারপর পান-লালিত জিহ্বা, পানলালিমাময় চক্ষু, নাসাগ্রচশমা আর আদর্শ ভেটকি মাছের বঙ্কিম অধরসহ ভেটকিদা তাকে বলল,

— আপনি না, আর কখনো চশমা পরবেন না।

— (অনেকটা অবাক, খানিকটা বিরক্তিসহ) কেন?

— আপনার চোখ দেখলে মনে হয় যেন কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে...

হ্যারিসন রোডে প্রবল ভিড় বাস থেকে নামতে গিয়ে এক যাত্রীর চশমার ডাঁটিটা খুলে গেছে। কাছেই চশমার দোকান পেয়ে তিনি বড়োই প্রীত... গিয়ে বললেন,

— এটা একটু লাগিয়ে দিন না, দাদা।

— হুঁ...

তারপর ডাঁটি লাগানোর জন্য কাচ খোলা হল, তারপর ফ্রেমটা গরম করতে গিয়ে পুড়ে কালো দাগ হয়ে গেল, লোকটি তো প্রায় হা-হা করে ওঠেন... তারপর ফ্রেমের ওপরের একটা দিক ফেটে গেল, লোকটি এবার প্রায় মারতে যান... হঠাৎ সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে ভেটকিদা তাকে বলল — আপনি বরং সোমবার আসুন... তারপর মনে নেই আর... মার খায়নি অন্তত, এটা জানতাম।

কবিতা তো লিখতই ভেটকিদা, পত্রিকার সম্পাদকও ছিল শুনেছি, দেখিনি কখনো সেই পত্রিকা। হয়তো লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সন্দীপদা ফটোকপি দিতে পারেন। ভেটকিদার নিকট বন্ধুর থেকে শুনেছি, প্রেম করত এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। অনায়াসে বিখ্যাত ব্যক্তিকে তার অফিসে গিয়ে নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে-ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারত — অ্যাই, অমুক আছিস, অমুক...। প্রায়ই কফি হাউসে পিছন থেকে এসে প্রায় টেবিল অবধি মাথা নামিয়ে, ঝুঁকে, কম করে সাত-আট সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে বলত — ওঃ, শ্যামল নোস... ও তুই... শ্যামল কোথায় রে? *অফবিট*-এর প্রকাশক শ্যামল ধরের সঙ্গে আমার অবয়ব গুলিয়ে ও শ্যামলদাকে খুঁজে না-পেয়ে এই ছিল ওর নিয়মিত হতাশা! এইসব নিয়েই ভেটকিদা ছিল।

ভেটকিদারা ছিল। কলকাতায় তখন লাল দোতলা বাস চলত, দোতলার সিঁড়ি পিছন দিকে আর আড়াইতলা ট্রেলার বাস। তখন আমাদের চিত্র-বিচিত্র অতি-আলোকিত কফি হাউস ছিল না, সবুজ ম্যাড়ম্যাড়ে অন্ধকার ঘুপচি কফি হাউস, ভুঁড়ি আর ইয়া গোঁফ নিয়ে চাচা ছিল। আমার শহর তখন আমাদের শহর ছিল, মেগাসিটি হয়নি। পাড়ায় একটা কালো টেলিফোন ছিল, তাতেই গোটা পাড়ার ফোন আসত। একসঙ্গে গোটা পাড়া বসে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে পেত একটাই সাদা-কালো টিভিতে। চিঠি লেখা হত, লাল ডাকবাক্স ছিল, প্রেমপত্রও পোস্ট করা হত তাতে, তিনদিনে দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসত মেঘদূত। ময়দানের বইমেলা ছিল, লিটল ম্যাগাজিনের গ্যালি প্রুফ দেখা ছিল, লেটারপ্রেসে ধার-বাকি ছিল। ভেটকিদারা ছিল। একা সেন্ট পল্স কলেজে পড়া সিদ্ধার্থ দাস নয়, এমন অনেক ভেটকিদা। যারা সংসারের হোমে-যজ্ঞে জন্মে লাগত না, বেঁচে থাকার জন্য টাকা রোজগারের দায় ছিল না তাদের, কিন্তু ঠিকই চলে যেত। তেমন বউদিরা ছিলেন, যাঁরা অপেক্ষা করে থাকতেন, ভেটকি নয়, সিদ্ধার্থ এসে খাওয়া অবধি। এক বিখ্যাত কবির সহচর হিসেবেই তাকে বেশিরভাগ লোকজন চিনত, মাতাল বলে চিনত, কীই বা আসে-যায় তাতে তার। এপার-অপার কলকাতা, জেলায়-জেলায় কবিতাপাঠের আসরে থাকত সে, সে-আসরে তখন কর্পোরেট পুঁজি ঢোকেনি। মাফিয়া কিংবা বাজার কবিতার উৎসব করেনি। লোকজন কথাবার্তায় পলিটিক্যালি কারেক্ট হয়নি। রাস্তায় মূত্রত্যাগ ছিল, কিন্তু মোড়ে-মোড়ে মল ছিল না। এর মধ্যেই আমাদের সমাজ-অর্থনীতি ভেটকিদাদের একটা জায়গা করে দিয়েছিল। নিজের মতন জায়গা। ভালো কি খারাপ, সে তো দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু একটা স্থানাঙ্ক ছিল তাদের। সমাজের কেজো, রোজগেরে, প্রোডাক্টিভ না-হয়েও তাদের একটা স্পেস ছিল। বুভুক্ষু বাজার এসে সেই জায়গাটায় জুড়ে বসেছে। ভেটকিদা, এই কলকাতায় তুমি কোথাও নেই।

ভেটকিকে কি চিনতেন না?

বিলক্ষণ চিনতেন। শুধু চিনতেনই না, ভেটকিকে নিয়ে কলমও ধরেছেন — আজ্ঞে, হ্যাঁ।
বোধশব্দ-র পাতায় সেসব আগে-না-পড়া লেখায় তাঁরা সাততারা। আমরাও আহ্লাদে সাতখানা!



ভিড় কিংবা একা ভেটকি

ঋত্বিককুমার ঘটক

কলেজস্ট্রিটে মাল্টিপ্লেক্স কই! কে জানে কী করে সেখান থেকেই 'মে ঢা তা'-খ্যাত ঋত্বিকের কবেকার প্রতিবেদন জোগাড় করলেন উটকো দেড়েল **বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য**।



মেডিক্যাল কলেজের উলটোদিকের ফুটপাথ। দাঁড়িয়ে আছি। কলেজের গেটের সামনে ঝুড়িতে করে খইনি, চাবির রিং, ছোটো প্লাস্টিক বল, বিড়ি, নিরোধ নিয়ে বসে প্রবীণকুমার সাহু। অনেকক্ষণ ঠোঁটে কিছু পড়েনি। সাহুর কাছ থেকে একটা বিড়িই চেয়ে নিলাম তাই। দিল। দুটো দিল। একটা ধরিয়ে আরেকটা রেখে দিলাম। মিনিট পনেরোর আলাপ। বিহারের সমস্তিপুরে বাড়ি। ত্রিশ বছর ধরে এই এলাকায় রয়েছে। ওর বাবা বেঁচে আছে কিনা জানি না। থাকলে বোধহয় আমার কাছাকাছি বয়সিই হত। কয়েক বছর আগে বেশ কয়েকবার আমায় গোবরায় গিয়ে থাকতে হয়। সমাজ ভেবেছিল আমার মাথায় সমস্যা, আমার মনে হয়েছিল আসল সমস্যা সমাজের যোনিতে। সে যাক, ওখানে দেখা হয়েছিল

অনাদির সঙ্গে। বিড়ি চাইলে ও ঠিক এইভাবেই দিয়ে যেত। আরেকজন ছিল *অযান্ত্রিক*-এর সেই লোকটা, নাম আর মনে নেই, বি কে পাল অ্যাভিনিউ-এর ওদিকে কোথায় থাকত, একটাই দৃশ্যে ছিল, কোনো ডায়লগ নেই, পাঁচ সেকেন্ডের দৃশ্য, অনেকের মাঝে ও একজন, কাটা-সৈনিক ধরনের পার্ট। দৃশ্যটার শুট হয়ে যাওয়ার পর ওকে একটা বিড়ি দিলাম। ও সেটা না নিয়ে চুপচাপ হেঁটে মিশে গেল গাড়ি-ট্রাম-মানুষের মধ্যে। প্রবীণকে দেখে আমার ওদের দু-জনের কথা মনে পড়ল। পাতলা চেহারা, মাঝখান দিয়ে সিঁথি। দেখলে মনে হয়, কলকাতায় দীর্ঘদিন কাটিয়ে ফেললেও কর্পোরেশনের জল কোনোদিন ধস হয়ে নেমে আসতে পারেনি ওর পাকস্থলির ওপর। দুপুর খরখরে হয়ে উঠছিল ক্রমশ। আকাশের লালায় পিছল হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। প্রবীণ উঠে প্রেসিডেন্সির দিকে চলে গেল। ওদিকটায় ভিড় এখন। ছাত্রদের আন্দোলন চলছে। স্লোগান কানে আসছিল আবছা। মাঝে-মাঝে কিছু স্লোগান কিছু শির-ফোলানো দাঁড়ি-কমাহীন চিৎকার শরীরের ভেতরের বিভিন্ন জয়েন্টে সুবিধা মতো বসে গিয়ে একটা আরাম আর তৃপ্তি তৈরি করে ফেলে। আঃ! নিজেকে সরিয়ে রাখা যায় না। কয়েকজন মানুষ দেখলাম সেই স্লোগান দেওয়া ছাত্রদের উদ্দেশে খুব সহজে কিছু কটু মন্তব্য করে দিল। এরা সেই প্রজাতি, যারা নতুন কিছু দেখতে পারে না, নতুন কথা শুনতে পারে না। যারা শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে জানে। আসলে কিছু দেখে না। এদের সম্বল বলতে উটকো এবং ম্রিয়মাণ বাখোয়াজি। আমাদের সময়ও ছিল। এরা জানে না, ছাত্র আন্দোলনের সময়, ছাত্রদের কথা বলার সময় তাদের পোস্টার বা স্লোগানের কাঠিন্য নয়, আসলে দেখতে হয় তাদের চোখ। স্লোগানরত এক-একটি ছাত্রের রক্তে অচিকিৎস্য অসুখের মতো কতটা আলো ঢুকল, তার স্পষ্ট হিসাব রেখে দেয় কপালের ঠিক নীচের ওই দুই গর্ত। যে আলোটুকুর যত্ন নিতে পারলে এই নারকোলের মালার মতো পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর কোনো স্থূলতা থাকবে না। সুবর্ণরেখার শেষ দৃশ্যে ঈশ্বরকে হাত ধরে ওর ভাগ্নে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় যে কথাটা বলিয়েছিলাম, এই প্রাণীগুলোর উদ্দেশে সেটাই একটু ঘুরিয়ে এবং অনেকটা ঘৃণা মিশিয়ে বলতে ইচ্ছা করে — তুমি শালা মেরুদণ্ডটা কোথায় রাখলে, নাগরিক? করুণা করার ক্ষমতা আমার থাকলে এদের হয়তো অল্প-অল্প ক্ষমা করতাম। কিন্তু, তা পারব না। লড়াই-এর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না।

ভেটকি আসবে। আজ দুপুরে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে। এমনটাই ঠিক হয়েছে। এই মেডিক্যাল কলেজের সামনেই প্রথম দেখা হয়েছিল ছোকরার সঙ্গে। বছর খানেক আগে। জন শ্লেসিনজার কোথাও কোনো কাগজে সেইসময় একটা কথা বলেছিলেন — শিল্প শুধু শিল্পই। বাক্যটি নিয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট আপত্তির অবকাশ ছিল। মনে হয়েছিল, সিনেমা ভেরিতে, আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা, সিউডো-এক্সিসটেন্সিয়ালিজম এইসব বাড়তে-বাড়তে কিছু মানুষ কথার মোহে পড়ে গিয়েছেন। তাঁদের কৃপা করা উচিত। তাঁরা শিক্ষিত নন। শ্লেসিনজার যা বলেছিলেন, তা একটি নিরালম্ব-বায়ুভূত দর্শন। যা বাচ্চাদের মুখ থেকে বেরোনো সাবানের ফেনার বুদবুদ ওঠানোর মতোই ক্ষণস্থায়ী। কিছু-কিছু শিল্প মানুষকে অল্প সময়ের জন্য এগিয়ে দিলেও তারা আদতে হচ্ছে যমের দূত। এদের চটকদারির কথা আজকে মনে বাজলেও কাল আর কেউ মনে রাখবে না। শিল্পকে যে বরাবর হতে হবে জীবন-অনুগামী, তা নিয়ে আমার নিজের মনে কোনোদিন কোনো দ্বিধা ছিল না। যে কারণে 'তিতাস'-এর শেষটা করেছিলাম ওইভাবে। শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাওয়া মাটির চরে বাসন্তী প্রাণপণে মাটি খুঁড়ে জল বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মৃত্যুর ঘোরের মধ্যে ফুটে উঠছে এক ভেঁপু-বাজানো শিশু। শিল্পের এই জীবন-অভিমুখী দিকটি নিয়ে সেইসময় অনেকের সঙ্গে কথা হত। ভেটকির সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে-বলতে সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। ও ঢের বকছিল, আমি সেসব পুরোটা শুনিওনি বোধহয়! ততক্ষণে মেডিক্যাল কলেজ থেকে চলে এসেছিলাম খালাসিটোলায়।

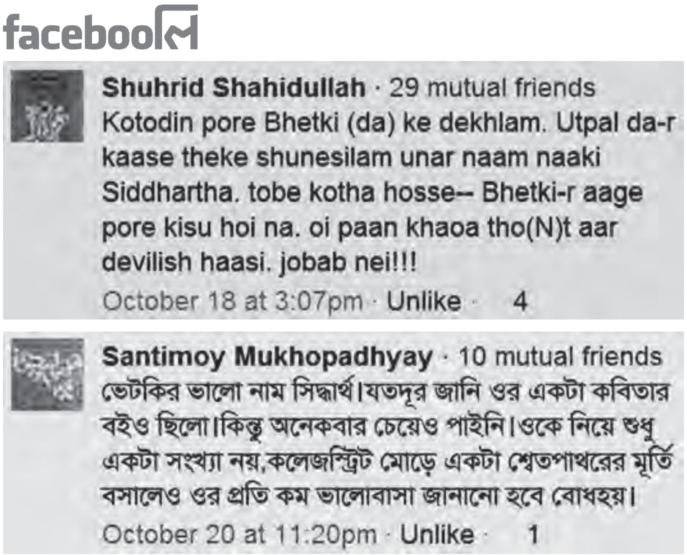
শিল্পের মতোই মানুষের জীবনেও পেসিমিজিম ভালো লাগে না আমার। পাঁচফুট দু-তিন ইঞ্চির চেহারায় চোখে চশমা অদ্ভুত থ্যাবড়া চোখ-মুখ আর ঝুলে-পড়া নিঃসাড় ঠোঁটের কষ নিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ হেসে-ওঠা মানুষটাকে সেদিন আমার ভালো লেগেছিল এক নিরহঙ্কার আশাবাদের জন্যই। শুনেছি, হ্যারিসন রোডের ওইদিকে ওর একটা চশমার দোকান আছে। যেখানে ও বিশেষ বসে-টসে না। যেটুকু থাকা, এবং বেঁচে থাকা, তা এই কলেজস্ট্রিট চত্বর জুড়েই। যে মেয়েটিকে ও ভালোবাসত, তার বাড়িতে গিয়ে একবার জল খাওয়ার পর সে নাকি ওর থ্যাবড়া চোখমুখের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বাড়ির লোককে বলেছিল, এই গ্লাসে যেন আমাকে আর জল খেতে দেওয়া না হয়। এটুকু বলে টেবিলে বসেই তার কী হাসি!

তার সঙ্গে দেখা হওয়া ওই প্রথম। তারপর ছুটকো-ছাটকা কখনো-কখনো দেখা হয়েছিল বোধহয়।

মেডিক্যাল কলেজের পাশেই একটা ওষুধের দোকানের টিনের চালে পাশাপাশি বসে থাকা দুটো কাককে চোখে পড়ল। দূরের জমায়েতটার দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে। তার নীচে চট গায়ে দিয়ে থেবড়ে বসে এক পাগলি নামতা পড়ার কায়দায় দোল খাচ্ছে। ভেটকিকে গতহপ্তায় জানিয়েছিলাম এখানে আসার কথা। ওর মতো মানুষকে দেখে মাঝে-মাঝে বিরক্তি লাগলেও দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। ভেটকি বাঙালি হতে পারলেও, বাঙালি কোনোদিন ভেটকি হতে পারবে না।

ট্রাম-বাস-পাগলি-কাক... পেটে পুরে টিকিয়ে-টিকিয়ে এগিয়ে চলেছে কলকাতা। ভেটকি আসবে, ঠিকই আসবে — এরকম একশহুর আশা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেটকি আসছিল না। তার বদলে কিছু রাগী উচ্চারণ নিয়ে ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল আজকের ছাত্ররা। বিড়ি টানতে-টানতে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। অনেকটা আশাবাদ মানচিত্রের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে কলেজস্ট্রিটের রাস্তায়। ভেটকি কি এই ভিড়টার মধ্যেই মিশে আছে কোথাও? কে জানে!

দুপুরটা বিকেল হয়ে যাচ্ছিল।



খেজুর কাঁটা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাদামি হওয়া ডায়েরি খুঁড়ে তুলে আনলেন দামি চিঠি। চওড়া নোট দিয়ে বোঝালেন ডেটা বেশ স্ট্রং! তবু, সন-তারিখের ধোঁয়াশা কাটাতে ব্যর্থ সময়জ্ঞানে শক্তিহীন শাক্ত **ভাস্কর লেট**।



আড়াই চালে ভেঙে এই লেখা। মুড়ো ও গর্দান মিলিয়ে আমার কথা থাকবে। আমি, মানে, আমি। শ্রীলেখক। যে এখন বিপন্ন ও মৃতপ্রায়। লেখা যেই-না শেষ হবে অমনি ধাঁ করে মরে যাবে।

আর, ধড় ও ল্যাজা মিলিয়ে থাকবেন তাঁরা। দুই বন্ধু।

দুই অতিজীবিত নক্ষত্র।

একজন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবি।

পরেরজন ভেটকি। কবি-সখা। যাঁর প্রতি উৎসর্গিত এই সংখ্যার শব্দবোধ।

আমি, শ্রীলেখক, বর্তমানে এঁদের কথাই লিখি।

শক্তি ও ভেটকি : প্রচুর মিথ ও মিথ্যে যাঁদের শীতের চাদরে জড়িয়ে রেখেছে। কবোষ্ণ বরফ-জলে নাইয়েছে। মেঘ-বর্ষার ছিটে মেরে জ্ঞান ফিরিয়েছে। শরৎ, হেমন্ত, বসন্তেও আর কত কী সব যেন হয়েছিল এক্কা-দোক্কা খেলা।

কিন্তু ওদের মাঝে আমি কী করছি?

আজ্ঞে, লিঙ্কম্যান। জমাট ভোজের শুরুয়াতি শুক্তো।

সক্কলেই কম-বেশি জানেন, অনেকে আবার জানার পরে ইচ্ছে করে ভুলে যান একপেট ফিরতি-জানার খিদে নিয়ে, যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় মাঝে-মাঝেই ভিটেছাড়া হয়ে ডুব দিতেন এখানে-সেখানে। তো একবার, এই স্বভাবত বাউন্ডুলে উধাও হয়েছিলেন চাইবাসায়। এক বিখ্যাত কবি-বন্ধুর আত্মীয়বাড়িতে ঘাপটি মেরে ছিলেন বহু দিন। আর কলকাতায় শক্তি চট্টোর অন্যান্য বন্ধু একদিন হঠাৎ-খবর পেয়ে ভিরমি খেয়েছিলেন — তিনি নাকি

জেলবন্দি! উদ্ধারকার্যে ছুটে যান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

এ-বৃত্তান্ত বহুশ্রুত।

কথিত, চাইবাসা গিয়ে সেবার ফাঁকা রাস্তায় সুনীলরা কণ্ঠ ছেড়ে রবীন্দ্রগীতি গাইছিলেন, তখনই একটা বাড়ির দরজা নাকি দড়াম করে খুলে যায়, বেরিয়ে আসেন একজন রাগি যুবক ও মহাতম্বি করে নাকি বলেন : এখানে আমি ছাড়া আর কে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে রে!

এ-ব্যক্তিই যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু বিশিষ্ট শক্তি-গবেষক সমীর সেনগুপ্ত (তিনিই প্রথম টর্চ হাতে জ্বলন্ত উনুন-কে চেনানোর চেষ্টা করেছিলেন আর এজন্যই তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য) ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এমন একটা বাড়তি তথ্য রেখে গিয়েছেন, যা ক-দিন আগে অবধি আমার জানাই ছিল না।

তা হল : ওইবার চাইবাসায় কার্যত আত্মগোপন করে থাকার সময় প্রথম দু-মাসের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাউকে কোনো সংবাদ না-দিলেও বন্ধু ভেটকিকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

৪ নভেম্বর ১৯৬৪।

এই হচ্ছে তারিখ।

পনেরো দিন পরে, ১৯ নভেম্বর নাকি চিঠিটা হস্তগত হয় ভেটকির। এ-কথা স্বয়ং ভেটকি পানশালায় আড্ডাচ্ছলে বলেছিলেন সমীরবাবুকে।

আর বলেছিলেন, 'এই চিঠি একমাত্র শক্তিই লিখতে পারে, লিখতে পারে একমাত্র ভেটকিকেই।'

কেন?

কৌতূহল প্রকাশ না-করে পারেননি সমীর সেনগুপ্ত।

উত্তর এসেছিল শালগাছের খুঁটি হয়ে। বেত হয়ে। বাতাস কেটে লহমায় সপাৎ, অভিঘাতে নীরেট গদা, অতঃপর ঘিলু ছেতরে যা-তা কাণ্ড!

আরক্ত ও আসক্ত ভেটকি নাকি সেদিনের সন্ধে-রাতে বলেছিলেন : 'অন্য যেসব শালা ওর বন্ধু, তারা কি এ-চিঠির মর্মোদ্ধার করতে পারবে, ছোঃ!!!'

তারপর কিছু বিরতি, নতুন করে পাঁইট খুলে, বলদের বিবর্ধিত ল্যাজ কড়কড়িয়ে মুড়ে দেওয়ার চাষাড়ে ভঙ্গিমায় সেদিনের খালাসিটোলার আড্ডায় ভেটকি নাকি এটাও জানিয়েছিলেন : 'শুনুন বাবু, মাছ জলে থাকলেও জল কখন খায় বলা মুশকিল। আর পেট ভরে জল খেলেও মাছের অসোয়াস্তি হয় না। কিন্তু ডাঙার প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো এ-নিয়ম খাটবে না, কি? শক্তি হচ্ছে জলের বেলেমাছ। নরম, শরম, তিরতির। নাজুক দেখে যেই ধরতে যাবে অমনি পাখনা থেকে সবল ডানা বেরিয়ে আসবে। দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে সে তখন উড়ে যাবে নেপচুনের দিকে। কী বুইলেন? এটা কি বুইলেন, ওর যেসব বন্ধু 'ও আমার কত আপনার রে!' বলে আদিখ্যেতা মারায় তারা সব ক'টা কচ্ছপের ব্যাটা? ওরা ডাঙাতেই ভাল চলতে-ফিরতে পারে না, একবার উপুড় করে দিলে ছটফটিয়ে শেষ, তারা কি না পর্যায়ক্রমে সাঁতার ও আকাশউড়াল দেবে যথাক্রমে ডলফিন ও খেচর সেজে? শালা খোচর! ওই সব ক'টা বন্ধু আসলে শক্তির কাঁধে চেপে গগন-পরিক্রমায় আগ্রহী, বুইলেন, ঈশপের গল্পে ছিল না — সেই যে কচ্ছপ, ঈগলের নখ আঁকড়ে, শূন্যে গিয়েছিল ওপর থেকে জগৎটা কেমন লাগে দেখতে, এ এক্কেবারে সেই স্টোরি। শক্তি অবশ্য অত নির্মম নয়। সে ওই গল্পের ঈগলের মতো কচ্ছপপ্রতিম বন্ধুদের টপ করে ফেলে দেয় না, দেবেও না, কিন্তু জানবেন — আকাশে ওড়ার অনুপম অভিজ্ঞতা একমাত্র আমার সঙ্গেই শেয়ার করে শক্তি, অন্য কারো সঙ্গে নয়, নেভার, তাই তো এই চিঠি — কেবল আমাকেই — ও লিখেছে — বুইলেন বাবু —'

অতঃপর ভেটকির গলা মুদে আসে।

সেটা হতে পারে নেশার অপরিমেয় আহ্লাদে, বা হতে পারে বন্ধুপুলকের ঝিমঝিমায়।

এই বিবৃতিটা সমীর সেনগুপ্ত স্মৃতি থেকে লিখেছেন।

কেটি-তে গিয়ে শুনেছিলেন।

তখন খাতা-পেন ছিল না।

তাপ্পর ভেটকিকে শ্যামবাজারের মোড়ে ট্যাক্সি করে নামান। কেন শ্যামবাজার, কেন তপসিয়া, সুতানুটি বা চালতাবাগান নয়, তা জানা যায় না। কারণ, মদ্যপানের আগে এই শর্তেই নাকি সেদিন রফা হয়েছিল। ভেটকি বলেছিলেন, কেটি থেকে বেরিয়ে তাঁকে শ্যামবাজারে নামাতে হবে। 'যেখানে পাঁচখানা রাস্তা শিং-টুঁসোটুঁসি করে, চেনেন তো!' আর শর্ত ছিল একবারও জিগ্যেস করা চলবে না, 'কেন ওখানে যাচ্ছি, বুইলেন তো!'

সেই মতো কাজ সেরে সমীরবাবু নিজ-বাসায় ফিরে আসেন, যদিও অপাঙ্গে খেয়াল করেছিলেন ভেটকি ট্যাক্সি থেকে নেমেই নেতাজিকে পিঠে নিয়ে ছুটন্ত উদ্যমে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াটির লেজের পানে ধেয়ে যান ও ক-গাছি লোম আছে গোনার চেষ্টা শুরু করেন।

এটুকুই। সমীরবাবুর। চোখ-ক্যামেরা। খচাৎ। ধরে।

কেননা, ফেরার তাড়া ছিল।

অন্তর্গত মদ ততক্ষণে তেজস্ক্রিয় মৌলের মতো লাগাতার বিভাজিত ও বিকিরিত হতে শুরু করেছে। তবু সমীর সেনগুপ্ত স্থির করেন, সেদিনই বাসায় ফিরে শক্তি-সংক্রান্ত যে-যে কথা ভেটকি তাঁকে বলেছেন — সেসব ডায়েরিতে তুলে রাখবেন।

তুলে রাখার এই তারিখটি হল ১১ আগস্ট ১৯৬৫।

সময় : রাত ১টা বেজে ৪২ মিনিট।

একটু আগে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে যেটুকু বলা হয়েছে তা অবিকল সমীর সেনগুপ্তর ডায়েরি থেকে নেওয়া।

একেবারে অন্তিমে তিনি লিখেছিলেন, 'যা হোক ভেটকি আজ কামাল করে দিলো। কিন্তু আরো হিরোসিমা-নাগাসাকি ঘটবে যদি ও ওর আজকের বয়ান মোতাবেক ওকে শক্তির লেখা চিঠিখানা আমাকে পড়তে দ্যায়। আধঘণ্টা মতো সময় পেলেই যথেষ্ট। কপি করে নেবো।'

বিলম্বে হলেও ভেটকি কথা রেখেছিলেন।

কেটি-র সেই সুরাচক্রের পর মাসখানেকের বেশি ওঁর পাত্তা পাওয়া না-গেলেও আচমকা একদিন কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে উদিত হয়ে সমীরবাবুকে পাকড়ান। এবং স্রেফ একটিমাত্র বাক্য বলে একখানি কাগজ পাঞ্জাবির পকেটে ঠেসে দিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যান। সেই একটিমাত্র বাক্য সমীরবাবুকে উদ্দেশ করেই বলা : 'জানতুম, পাবো এখানে...'

কফি হাউস থেকে নির্গত হয়ে সে-রাতে সমীরবাবুরা মদ্যপান করেছিলেন কি না এ ব্যাপারে সংক্ষেপে কিংবা বিশদে কিছুই বলা অসম্ভব, কেননা, কোনো তথ্যসূত্র নেই। সেটা জরুরিও নয় তেমন। আসল যেটা বলার : সমীরবাবু ওই চিঠিখানি ডায়েরিতে কপি করে রেখেছিলেন।

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।

রাত না দিন না দুপুর, সময় বলা নেই।

খতিয়ে দেখলে, ২২ তারিখই ভেটকি ওই চিঠি দিয়েছিলেন কি না তাও স্পষ্ট করে বলা যাবে না। উল্লেখ নেই যে!

সমীর সেনগুপ্ত ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখের পাতায় স্রেফ এটা লিখেছেন যে —

'ভেটকি সেই অমূল্যরতন দিয়েছে আমাকে। কফি হাউসে টলতে টলতে এলো আর এসে শুধু বললো 'জানতুম, পাবো এখানে...'। ভট করে হাতটা সেঁধিয়ে দিল পাঞ্জাবির পকেটে। একটা দোমড়ানো কাগজ। আন্দাজ করেছিলাম চিঠি। কিন্তু খুলে দেখার উপায় নেই। আরো অনেকে রয়েছে তখন। চেপে গেলাম। খানিক বাদে বাথরুমে গিয়ে বের করলাম। যা ভেবেছি। সেই বোমা। তবে 'লিটল বয়' না 'ফ্যাট ম্যান' দেখতে হবে। চিঠিটা সত্যি শক্তিরই লেখা। এ হাতের লেখা আমার বহু দিনের চেনা। আমার লাশও চিনতে পারবে এতই নিবিড়ভাবে চেনা। চিঠির প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য যতিচিহ্ন সমেত হুবহু কপি করে রাখছি।'

এই হচ্ছে সমীর সেনগুপ্তর সংযোজন।

তারপর আছে চিঠিখানি।

'বোধশব্দ'-র এই 'ভেটকি' সংখ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ওই চিঠিটি সমীরবাবুর ডায়েরি থেকে আমি টো-টো তুলে দিলাম। উদ্ধৃতি চিহ্নের পারিখা কেটে।

আপনারাই পড়ে বিচার করুন ইহা নেপোলিয়নের তরোবারি না চেঙ্গিস খাঁ-র ঘোড়া না তেলেনাপোতার মানকচু।

ও, হ্যাঁ। চিঠির সম্বোধন দেখে ঘাবড়াবেন না যেন। এটাই লেখা ছিল। আমি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়েছিলাম বলেই আপনাদের আগাম জানিয়ে দিলাম। নিন, স্টার্ট করুন।

'প্রিয় খেজুর গাছ,

শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করদার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। সেবার বসন্ত। পৌঁছতে-পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দেখলাম, সারা দিন কিঙ্করদা কিছু খাননি। ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিলেন। বললাম, খাবে তো এবার? খ্যাকখ্যাক করে হাসতে লাগলেন। বললেন, কবি এয়েচে গো, কবি এয়েছে। ভোজ লাগাও। শুয়োর পোড়া দিয়ে গনগনে দেশি মাল। কতক্ষণ খেয়েছি, কতটা, কখন শুয়ে পড়েছি, কখন সন্ধে নেমেছে কিচ্ছু খেয়াল নেই। মাঝরাতে প্রবল তেষ্টায় ঘুম-টুম ভেঙে জেগে উঠে জল খুঁজছি, পাচ্ছি না, মশায় কামড়ে রোগা করে দিয়েছে, ঘোর অন্ধকার, ঘরও অন্ধকার, ঠাহর হয় না কোন দিকে মরীচিকা আর কোন দিকে পাথরের তলে ঝর্না ঠোঁট ফোলাচ্ছে, এতই অন্ধকার ছিল সেদিন বুঝলি! হামা দিয়ে খচ্চরের বাচ্চার মতো এদিক-সেদিক ঘুরে দেখলাম একটাই লণ্ঠন জ্বলছে দূর চাতালে। সেখানে কিঙ্করদা ছবি আঁকায় মগ্ন। এত মাথা টলছে, উঠে দাঁড়াতে সাহস হল না। জল খাওয়ার ইচ্ছেটাও দিব্যি অধঃক্ষিপ্ত হল। হামা টানতে টানতে ওই ঘরে ফিরে এসে চোখ বুজলাম।

পরদিনই কিঙ্করদার বিস্তর অনুরোধে কর্ণপাত না করে কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরি, হাওড়া আসি, তারপর আরেকটা ট্রেন ধরে চক্রধরপুর চলে যাই। সঙ্গে বিকাশ ও তপন ছিল। শান্তিনিকেতন থেকে যখন হাওড়া ফিরছিলাম একটা ভিড় গ্যাদগেদে লোকালে চেপে, তখন মাথা চিড়চিড়ানি শুরু হয়। অব্যবহিত পরেই লিখে ফেলি এই কবিতাটা। তোকে কি এটা কভু শুনিয়েছি — দ্যাখ মনে করতে পারিস কি না —

খেজুর গাছের নীচে নামে মেঘ
রোদের সাঁতারে
একে একে
খুঁটিমারি রেঞ্জ
ধুল্যবলুণ্ঠিত বাহু তিনভুবন আলিঙ্গন করে
পিপাসাজড়িত কণ্ঠে গান আসে প্রতিচ্ছবিময়
করুণা নিমগ্ন মুখে
সে-মুখশ্রী দর্পণের মতো
অনবদ্য, বিবর্ণ, নিষ্ঠুর॥

মনে না করতে পারলেও কিছু যায়-আসে না। আগে না পড়লে এখন তো পড়লি। আর এখন পড়লি মানে আগেও বিলক্ষণ পড়েছিস। এই পড়াপড়ির ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। সবই চেতন-অবচেতনের ঢেঁকিখেলা। (বাক্য দু'টা রবীন্দ্রনাথের মতো হল না!)

ভেটকি ভেটকি ভেটকি।

আমি জানি খেজুর গাছ তোর প্রিয়তম উদ্ভিদ। এমন গাছ কি আমারও ভাল না-লেগে পারে যার শৈশব বোঝা যায় শুধু, তারপর কৈশোরের দু-চার আনা। কিন্তু যৌবন বলো, বার্ধক্য বলো কিচ্ছু ধরার উপায়টি নেই। ফল ফললেও নেই, ফল না ধরে আমৃত্যু বাঁজা থাকলেও নেই।

অথচ এই খেজুর গাছের নীচে যখন মেঘ নামে তখনই রোদ্দুর তার সর্বোত্তম সাঁতারটি দিতে শুরু করে, হায় তখন কী তেষ্টায় যে গলা খটখটে হয়ে ওঠে, সে কেবল তুই আর আমিই জানি। এই তেষ্টা বাঁচার জন্য। এই তেষ্টা বাঁচতে বাঁচতে মৃত্যুতে পৌঁছনোর। বড় জংশন থেকে হুহু এক্সপ্রেস ধরলাম আর চট করে একরাতে চলে গেলাম মরণপুরে, তা হওয়ার নয়। আবার হওয়ার নয় বলেই যে হবে না, হওয়ানোর চেষ্টা করব না, তাও কি বলা যায়? তাই তো তেষ্টা পায়। বাঁচার। কেননা তারপরেই আসবে সেই মৃত্যুপালা। অভাবনীয় সুপারহিট। হাততালি। পৌষের রাতে গ্রাম্য বুড়োবুড়িরা পানে জিভ রাঙিয়ে চাদরের মধ্যে কোলের নাতিটাকে জাপ্টে ধরে অপলকে দেখবে সেই মৃত্যুপালার দুই অজেয় নায়ক — তোকে আর আমাকে!

এটা, এই কথাগুলো, একবার তুই-ই আমাকে বলেছিলিস। তোর হয়তো আজ আর তা মনেও নেই। চিঠি পেলে হয়তো পড়বে। বা পড়বে না। কী যায়-আসে! তোকে যেটুকু চিনি, তুই ধরেই নিবি এটা আমার কথা। তুই এটা আমার মুখ থেকেই প্রথম শুনছিস। তারপর তুই ভাববি, আগে শুনলেই-বা কী, পরেই-বা কী। এখন শুনলাম মানে আগেও শুনেছি। আর, আগে শুনলে ফের একবার শুনব না এ কি হতে পারে?

করুণা নিমগ্ন হয়ে আছি রে আমি। কার করুণা জানি না। ছবির মধ্যে প্রতিচ্ছবি হয়ে আছি রে। কার ছবি সে জানি না।

একবার শুধিয়েছিলি : শক্তি আমার আগে তুই বা তোর আগে আমি মরে গেলে কী হবে? এতবার সেদিন শুধিয়েছিলি যে আমি তোকে থাপ্পড় মারতে গেছিলাম। কেননা, প্রশ্নটা আমাকে ভেতরে ভেতরে আধ্ধেক মেরে দিয়েছিল।

সে-রাতে কিঙ্করদাকে লণ্ঠনের তেলতেলে পাণ্ডু আলোয় আঁকতে দেখে মার খাওয়ার যেন ষোলো কলা পূর্ণ হল। তুই বা আমি কেউ একজন আগে মরে গেলেও একটা মুখশ্রী থেকে যাবেই। বিবর্ণ, কিন্তু অনবদ্য, তাই তো সে-মুখশ্রী নিষ্ঠুর!

পরের দিন চলে আসার আগে কিঙ্করদাকে শুধিয়েছিলাম, কিঙ্করদা তুমি কখনো মৃত্যু দেখেছ? আবার সেই ডাকাতে হাসি। বলল, রোজ দেখি। তুই দেখতে চাস? তারপর আমার সম্মতি-অসম্মতির তোয়াক্কা না করেই বলল, কবি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যখন হাঁটতে থাকবি, সেই হাঁটার ফাঁকে যা-যা দেখে তোর মনে হবে — এই হচ্ছে মৃত্যু — আসলে মৃত্যু সেটাই। বিবর্ণ। অনবদ্য। কী নিষ্ঠুর!

শেষ করছি। আর ভাল্লাগছে না কলম পিষতে।

তোর ঐকান্তিক শক্তি'

— আলোচ্য চিঠিটি এখানেই শেষ।

সমীর সেনগুপ্ত পুরো চিঠি কপি করেছিলেন নীল কালিতে। কপি করা কমপ্লিট হলে লাল কালিতে মন্তব্য ছিল দুটো।

এক) রামকিঙ্করদার কাছে কোন বসন্তে গিয়েছিল শক্তি?

দুই) এই বিকাশ ও তপন কে?

শেষের অবশেষ

জামাইষষ্ঠীতে নতুন জামাইকে যখন বাটিতে-ধরে-না মাপের কাতলা মাছের মুড়ো খেতে দেওয়া হয়, দেখবেন, তার সঙ্গে গর্দানের অনেকটা মাস লেপটে থাকে। এ-লেখার শুরুতে বলেছিলাম, আড়াই চালে ভেঙে লেখাটা তৈরি হবে। মুড়ো ও গর্দান মিলিয়ে আমি, শ্রীমান লেখক, জ্বলব ও নিভব। তো, বরাদ্দের সেই 'মুড়ো'-টুকু ভূমিকা-স্বরূপ ভেটকিকে লেখা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটা তুলে দেওয়ার আগে বলা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

এবার, আনুষঙ্গিক 'গর্দান'-টুকু জানানোর পর্ব।

সমীরবাবু সঙ্গোপনে কাজ সাঙ্গ করার পরিকল্পনা করলেও একেবারে নিঃশব্দে 'মিশন অ্যাকমপ্লিসড' করা যায়নি। একদিন কেটি-তেই দিশি খেতে-খেতে ঝাঁপির মুখ নিশ্চয় কিঞ্চিৎ আলগা হয়ে গিয়েছিল আর সেই তালে ফোঁস-ফোঁস করে গসিপের কেউটে ফণা দোলায়, বিষ ঝাড়ে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫। যে তারিখে সমীরবাবু 'কপি' করেছিলেন ভেটকির দেওয়া চিঠিটি বলে ডায়েরিতে পাওয়া যাচ্ছে, এটা তারও মাস তিনেক পরের ঘটনা (২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৫)। সেদিন সমীর সেনগুপ্তর সঙ্গী ছিলেন দুই দিকপাল সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও দীপক মজুমদার।

কথাচ্ছলে সমীর সেনগুপ্ত বন্ধুদের সঙ্গে ভেটকিকে লেখা শক্তির চিঠির বিষয়টি 'শেয়ার' করতে চেয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মনে হয়েছিল চিঠির অন্তর্নিহিত দর্শনবিন্দুটি তো মুগ্ধ হওয়ার মতোই! শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়-কবিতায় যে অনুপম মধ্যবিত্ত মৃত্যুবোধ আপাদমাথা জুড়ে লেপটে থাকে, সেটা যে অকস্মাৎ আকাশ থেকে নামেনি 'অচিহ্নিত উড়ন্ত চাকতি'-র মতো, একটু-একটু করে যে সেটা নির্মাণ পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেন। একজন মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আনমনে হাঁটছে, আর যা-কিছু দেখে তাঁর মনে হচ্ছে এটা মৃত্যুর স্মারক, সেটাই হয়ে যাচ্ছে মূর্তিমান মৃত্যু, ভাবা যায়! বিদেশের ক-জন কবি এমন করে ভাবতে চেয়েছেন, রামকিঙ্কর বেজের মতো বিদেশের ক-জন শিল্পী এমন অভিনব চশমা ধার দিয়েছেন অনুজ কবিবন্ধুকে?

সন্দীপন ও দীপক দু-জনেই সহমত হন। তারপর 'অনন্ত কুয়োর জলে চাঁদ পড়ে আছে' পঙ্‌ক্তিটি নিয়ে বিষম তর্ক জমে। দীপক মজুমদার দাবি করেন ওটাও নাকি মৃত্যুর কবিতা। সন্দীপন বিরোধিতা করে অবদমিত যৌনতা ও একক-মানুষের তাতাপোড়া লিবিডো-র পক্ষে সওয়াল চালান। এরই মধ্যে চারটে পাঁইট শেষ হয়। পাঁচ নম্বর পাঁইট যখন নেওয়া হচ্ছে, সেসময় মঞ্চে আবির্ভূত হন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। ক্রমে তিনিও শক্তির চিঠির কথা জেনে যান, যা লিখিত হয়েছিল ভেটকির উদ্দেশে, এবং এমন চিঠি পাওয়ার যোগ্যতা ভেটকির আছে কি না, সে নিয়ে বাতাসে বড়ো-সড়ো জিজ্ঞাসাচিহ্ন আঁকেন। তখন সন্দীপন ও দীপকের হুঁশ হয়। তাঁরাও বলেন, সত্যি তো ভেটকি কী এমন পেডিগ্রি ধরে?

এরপর কাহিনি যেদিকের বাঁকার সেদিকেই বাঁকে।

নেশার ঘোরে সমীর সেনগুপ্ত এবার সেই কথাগুলোও আড্ডা-আলোচনার মোদো টেবিলে সাজিয়ে দেন যেখানে ভেটকি অকাতরে বন্ধুদের নামে তির্যক রশ্মি নিক্ষেপ করেছিলেন : 'শুনুন বাবু, মাছ জলে থাকলেও জল কখন খায় বলা মুশকিল। আর পেট ভরে জল খেলেও মাছের অসোয়াস্তি হয় না। কিন্তু ডাঙার প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো এ-নিয়ম খাটবে না, কি? শক্তি হচ্ছে জলের বেলেমাছ। নরম, শরম, তিরতির। নাজুক দেখে যেই ধরতে যাবে অমনি পাখনা থেকে সবল ডানা বেরিয়ে আসবে। দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে সে তখন উড়ে যাবে নেপচুনের দিকে। কী বুইলেন? এটা কি বুইলেন, ওর যেসব বন্ধু 'ও আমার কত আপনার রে!' বলে আদিখ্যেতা মারায় তারা সব ক'টা কচ্ছপের ব্যাটা? ওরা ডাঙাতেই ভাল চলতে-ফিরতে পারে না, একবার উপুড় করে দিলে ছটফটিয়ে শেষ, তারা কি না পর্যায়ক্রমে সাঁতার ও আকাশউড়াল দেবে যথাক্রমে ডলফিন ও খেচর সেজে? শালা খোচর!'

শুনে দীপক-সন্দীপন ও শরৎবাবুদের রক্তে কে যেন চুন গুলে দেয়। বগবগ করে ফুটতে-ফুটতে তাঁরা সমবেতভাবে হানা দিতে থাকেন সেসব আস্তানায় যেখানে গেলে ভেটকিকে পাওয়া যাবে। ওঁদের অভিপ্রায় ছিল অতীব স্পষ্ট : বেয়াক্কেলে ভেটকিকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করা। সমীর সেনগুপ্ত চেষ্টা করেছিলেন ওঁদের সে-রাতে রুখতে, কিন্তু পারেননি। উলটে তাঁকেও এমত অভিযোগ শুনতে হয় যে, এরকম বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক কথাবার্তা শুনে কেন তিনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি, আর কেনই-বা এত দেরি করে জানালেন, এটা আরও পূর্বেই সকলের গোচরে আনা উচিত ছিল।

একাকী, পরিত্যক্ত, নেশাভারগ্রস্ত সমীর সেনগুপ্তর অতএব একাই ঘরের পথে রওনা হন।

এবং সে-রাতে ডায়েরিতে লেখেন —

'এই করেছো ভালো...'

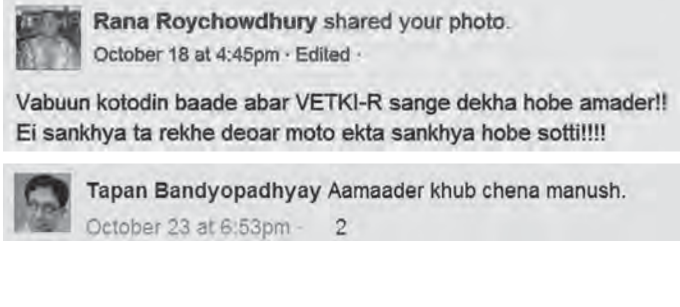
বোঝাই যাচ্ছে, এটা রবি ঠাকুরের লেখা গানের অংশ। বিশেষত্ব যেটা, কেবল এই তিনটে শব্দই পাতা জুড়ে লেখা হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্নভাবে। নাগাড়ে। নীল কালিতে।

স্রেফ এই তিনটে শব্দ : 'এই করেছো ভালো...'

সমীর সেনগুপ্তর ডায়েরি তন্নতন্ন করে খুঁজেও এ তথ্য পাওয়া যায়নি যে, সে-রাতে সন্দীপন-দীপক-শরৎ-রা সত্যিই ভেটকিকে খুঁজে পেয়েছিলেন কি না, পেলেও একত্রবদ্ধ হয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে মেরেছিলেন কি না? নাকি মারদাঙ্গা করা, হুজ্জুত বাঁধানো সবই ধাপ্পাবাজি? ওঁরা তিনজন হয়তো ভেটকির সঙ্গে মিলে কোথাও বসে গিয়েছিলেন বোতল খুলে, আর সকলেরই জিভে অনিবার্য অজগরের মতো জড়িয়ে যাচ্ছিলেন খোদ শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এভাবে —

খেজুর গাছের নীচে নামে মেঘ
রোদের সাঁতারে
একে একে
খুঁটিমারি রেঞ্জ
ধুল্যবলুণ্ঠিত বাহু তিনভুবন আলিঙ্গন করে
পিপাসাজড়িত কণ্ঠে গান আসে প্রতিচ্ছবিময়
করুণা নিমগ্ন মুখে
সে-মুখশ্রী দর্পণের মতো
অনবদ্য, বিবর্ণ, নিষ্ঠুর॥

— ভা. লে.



দুঃস্বপ্নের ব্যাকরণ আর এক না-মাছ মানুষের কাহিনি

উমবের্তো একো

কে জানত, এ পোড়া শহরে এসেছিলেন একো! লিখেছিলেন জার্নাল! তারই কঠিন দু-পাতা পাতি অনুবাদ করে বাংলা বাঁচালেন **অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়**। অননুদিত রইল সঙ্গের Eco-ফ্রেন্ডলি ছবিটি।



এই শহরে আমার বাস মাত্র কয়েক সপ্তাহের। তবু যেহেতু এটা একপ্রকার অজ্ঞাতবাস, সেহেতু এই সামান্য দিন ক-টিকে দীর্ঘায়িত করেই ভাবি। আমাকে এই শহরে আসার আগে বলা হয়েছিল, একমাত্র কিংবদন্তি ছাড়া এই শহর সবকিছুকেই প্রশ্রয় দেয়। আর প্রশ্রয়বিহীন কিংবদন্তিরা শহরের রাস্তায় মাথা উঁচু করে হাঁটে। অথচ অন্য শহরে এমনটা হয় না। এই শহরে আসার পর থেকেই কিংবদন্তির পর কিংবদন্তির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এই কিংবদন্তিরা স্বঘোষিত, স্ব-নির্মিত এবং স্ব-লালিত। সময়ের সূত্রপাত যেন এদের হাতেই, সময়ের শেষকেও এরাই জানে। এই কথাটা বলেছিল যে তরুণ কবিটি, সে এই কিংবদন্তির কথা জানে, এর সীমা আর সীমা পার করে থমকে-থাকা অন্ধকার খাদটাকেও সে চেনে। একদিন সে আমাকে সেই খাদের ধার পর্যন্ত নিয়ে যাবে, কথা দিয়েছে।

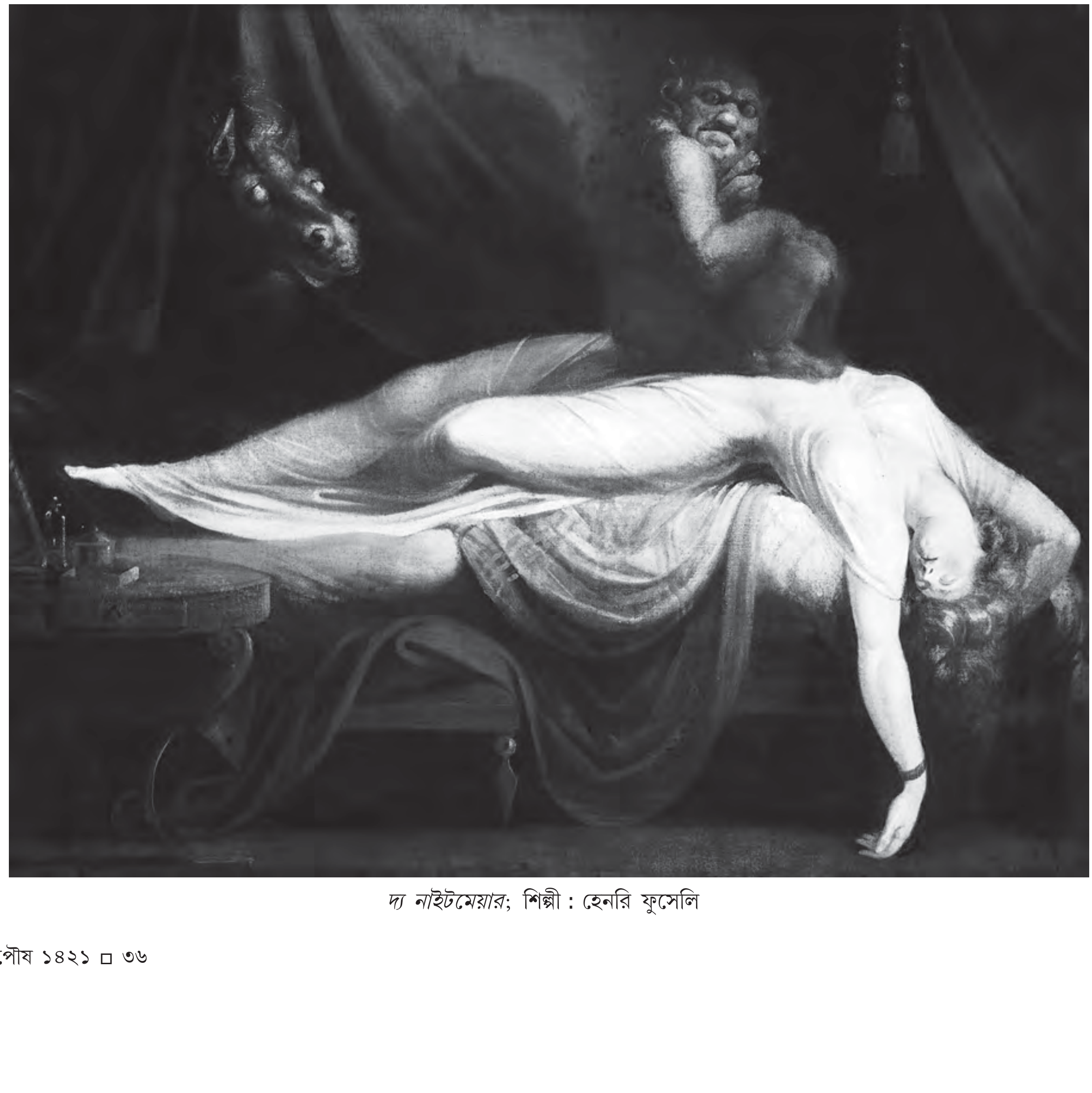
আপাতত সে আমাকে নিয়ে এসেছে এক কফিখানায়। প্রাচ্যের যে প্রকার কফিখানার কথা আপনারা পড়েছেন নিশাপুরের কাব্যে, যাকে আগামীতে লিখবেন তুরস্কের কোনো লেখক, এ-কফিখানা মোটেও সেরকম নয়। এর মধ্যে যে আলো আর অন্ধকারকে পাওয়া যায়, তার অনেকটাই এ-শহরের উপনিবেশগন্ধের সঙ্গে পৃক্ত। প্রথমে ঢুকেই মনে হয়েছিল এটা একটা লাইব্রেরি। এরকম চেয়ার আর টেবিল আমি দেখেছি মেল্ক-এর হারানো গ্রন্থাগারে। মেল্ক শুধু নয়, এমনটা দেখেছিলেন বোর্হেসও। সেটা মনে রেখেই এই ছড়ানো চেয়ার, তাতে আসীন

পড়ুয়ারা, ম্লান হলুদ বাল্‌ব-এর আলো — সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল এই কফিখানা আসলে পাঠ করতে চাইছে কোনো একটা দুর্বোধ্য গ্রন্থ, যার অবয়ব এখনও স্পষ্ট নয়। অবয়বহীন সেই বইটির কথা ভাবতে-ভাবতেই আমি তাকে দেখি। তার আকৃতি দেখলে মনে হতে পারে সে উঠে এসেছে মধ্যযুগের কোনো পুথির পাতা থেকে, যে পুথি মানুষকে অভিশাপের ভয় দেখায়। উইলিয়াম ব্লেকের আঁকা দান্তের কাব্যের চিত্রণকেও মনে পড়তে পারে তাকে দেখে। সে যেন এক বামন-দানব। ইনফারনো-র কোনো জটিল অন্তরালে পাহারা দিচ্ছে চরম গোপন কিছু। বিস্ফারিত চোখ, ছাগলদাড়ি, গ্রিজ পিছলে পড়া মাথা, ফুলে ওঠা পেট — সব মিলিয়ে সে এ-পৃথিবীর কেউ নয়। ঠিক বললাম না হয়তো। সে এই পৃথিবীরই কেউ, কেবল তার জগৎটাকে আমরা এখনও চিনে উঠতে পারিনি।

এইসব আবোল-তাবোল ভাবনার মাঝখানেই সে এসে পড়ে আমাদের টেবিলের কাছে। আমার সঙ্গী তরুণ কবিটির কানে-কানে কিছু বলে। কানে-কানে বলা যদিও, তবু তা 'ফিসফিস' নয়। ও কী বলল, তা জানতে ইচ্ছে হয় আমার। বলা শেষ করেই ও অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল। আমি ওর এই চলে যাওয়াটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তরুণ কবি প্রশ্ন করল — কী দেখছেন? ও তো ভেটকি! 'ভেটকি', যা কার্যত একরকমের মাছ, তার সঙ্গে ওর অনুষঙ্গ কীভাবে খাপ খায়, ভাবছি। কবিকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কী বলল, সেই বিষয়ে। কবি উত্তর দিল — কিছু না। তার মানে, এই 'ভেটকি' নামের লোকটি কথা বলে ঠিকই, কিন্তু সেই কথাগুলো 'কথা' নয়? ওর ভাষার সিনট্যাক্স চলিত সিনট্যাক্সের সঙ্গে আদৌ সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ব্যাকরণের মাইল-মাইল বাইরে ওর আনাগোনা। ভাষাকাঠামোর বাইরে যাওয়ার জন্য যে সাধনা লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে করে আসছেন ভারতীয় আধ্যাত্মের পথিকরা, ভেটকি কি তার জন্মসূত্রেই সেটা ভোগ করছে? প্রশ্ন জমা হতে থাকে।

কফিখানার বায়ুমণ্ডলে এতটাই ধোঁয়া আর টুকরো বাক্যের ওড়াউড়ি যে, সেই জায়গাটাকে আর কফিখানা বলে মনে হয় না। 'ভেটকি' নামটাকে অনুসরণ করতে-করতে টের পাই, এটা যেন একটা বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম। স্থবির মাছের দল এখানে ছোটো-ছোটো নুড়ির উপরে বসে রয়েছে। জ্ঞানী মাছ, অজ্ঞানী মাছ, স্থানু মাছ, অন্তরাত্মায় অস্থির মাছ — সবকিছুকে কাটিয়ে যাচ্ছে 'ভেটকি' নামের এক মাছ, যার সন্তরণ স্বচ্ছন্দ, বাঙ্ময়। 'বাঙ্ময়' বললাম বটে, কিন্তু সে কি বাক? সিনট্যাক্সের বাইরে থেকে-যাওয়া ভাষাকে কি 'বাক' বলা চলে? কফিখানায় উড়তে থাকা সেয়ানা আর ধান্দাময় বাক্যের টুকরোগুলোকে অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে ভাসতে থাকা অর্ধভুক্ত মাছের খাবার বলে মনে হল হঠাৎ। এর মধ্যে বিভিন্ন টেবিলে ভেটকির উচ্চারণ করে আসা কথা অথবা না-কথাগুলো যেন বাতাস-ভরা বুদবুদ। কিন্তু সেই বাতাসের চরিত্র আমাদের সঠিক জানা নেই।

আমার মেল্ক-এর মনাস্টারির সালভাতোরকে মনে পড়ল। সেই সালভাতোর, যে একই সঙ্গে মানুষের জানা সব ক-টা ভাষায় তার বাক্য-গঠন করত, অর্থাৎ সে কিছুই বলত না। ভেটকিও কি সেই প্রজাতির? তরুণ কবি জানল, এক কিংবদন্তি কবির নর্ম সহচর হিসেবে ভেটকি নিজের দাবি রাখে। আবার কিংবদন্তি! এ-শহরে কিংবদন্তির অভাব নেই কোনো। কিন্তু এটা ভাবার, যে কবি ভাষাগত কিংবদন্তিকে লালন করে চলেছেন (অন্তত‌পক্ষে আমার তরুণ কবিবন্ধুটির তা-ই মত), তিনি কেন এবং কোন উল্লাসে এই 'ভাষা-বহির্ভূত' সহচরটিকে প্রশ্রয় দেবেন? তাহলে



দ্য নাইটমেয়ার; শিল্পী : হেনরি ফুসেলি

সেই শব্দ ও ভাষার 'প্রভু' হিসেবে স্বঘোষিত ব্যক্তিটির কোনো ত্রাণের প্রয়োজন রয়েছে? ক্রমে-ক্রমে তরুণ কবি জানায়, 'ভেটকি' নামে পরিচিত ব্যক্তিটি শুধুমাত্র সেই বিশেষ কবি নন, 'কবিতা' নামের দুর্বোধ্যতম কাজটির সঙ্গে জড়িত অনেকেরই অনুষঙ্গ হয়ে বিরাজ করে। এটাও ভাবার। ভেটকি কি কবিতাপ্রয়াসী? উত্তরে তরুণ কবি জানায়, কলকাতার কবিতাজগতের নিজস্ব মিথোগ্রাফ অনুযায়ী, ভেটকি নাকি কবতে রচনাও করেছে। এবং সেইসব কবিতা আদৌ ওর মৌখিক ভাষার মতো নয়। সেগুলো খুবই স্বাভাবিক লেখালিখি। এমনকী, বেশ সাধারণ মানেরও। এখানে খটকা আরও বেশি করে লাগে। যে ব্যক্তি ভাষা-শাসনের বাইরে চলে যায় মৌখিকভাবে, সে লিখনের ক্ষেত্রে কী করে এমনটা করে বসে? ভেটকি কি সেই বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকটার উপরে আস্থা রেখেই এমন কাজ করে — শতং বদ, মা লিখ। তাই ভেটকি কিছুতেই সালভাতোর নয়। সে সালভাতোরের চাইতেও গোলমেলে একটা বস্তু।



'মেয়ার'

কয়েকদিন পরে আবার ওই কফিখানায় যাই, এই ক-দিনে মনপ্রাণ জুড়ে বিরাজ করেছে 'ভেটকি' নামক ব্যক্তিটির কথা। রাতে হোটেলে ফিরে ওর কথা ভাবতে-ভাবতে মনে হল, ও যে এই মরপৃথিবীর কেউ নয়, সেটা মনে হয়েছিল একটা কারণেই। সুইস চিত্রকর হেনরি ফুসেলি (১৭৪১-১৮২৫)-র আঁকা *দ্য নাইটমেয়ার* ছবিটি বার-বার মনে পড়ছিল, যেখানে এক ঘুমন্ত স্খলিতবসনার বুকের উপরে বসে আছে এক 'মেয়ার', যার অবয়বের সঙ্গে ভেটকির অসামান্য সাদৃশ্য। মেয়ার এমন এক জীব, যা মানুষকে দুঃস্বপ্ন দেখায়। নিঃস্বার্থভাবে দুঃস্বপ্ন দেখায়। তার অবয়ব এবং ভাষা (মৌখিক এবং অবশ্যই আচরণগত) তাড়া করে মারে জাগ্রত অবস্থাতেও। তাহলে কি ধরে নেব যে ভেটকি এমনই একটা সত্তা, যার অবয়ব, ভাষা আর তাকে অতিক্রম করা যাওয়া বাকি সবকিছু এই শহরের কবিদের যাবতীয় দুঃস্বপ্নের উৎস?

এদিন কফিখানায় তেমন ভিড় নেই। ছোটো-ছোটো নুড়িপাথরকে ঘিরে হালকা মাছের দল ইতি-উতি জটলা করছে। বাতাসে ধোঁয়ার পরিমাণও কম। এমন সময়ে দু-একটা বুদ্‌বুদ ভেসে এল বলে মনে হল। সেইসব বুদ্‌বুদে দারুণ কোহলগন্ধ। বুদ্‌বুদের পিছন-পিছন সে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হতেই পারে সে সেই রহস্যময় মাছ, যার জন্ম এক কোহলসমুদ্রের গভীরে এবং এই কোহলসমুদ্র থেকে সে সাঁতারে চলে আসে কোনো মিঠে-নোনা খাঁড়ির হালকা জলে। তার এই সফর ক্ষণিকের। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে যাবে তার ডেরায়। কিন্তু, যতক্ষণ সে থাকবে, সেই সামান্য সময়টুকু তার আবাস থেকে বয়ে আনা গন্ধ দিয়ে সে বলে যাবে — ওহে, কফির সময় অতীত এখন। চলো-চলো, খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো। অনেক-অনেক দূরে কোহলসমুদ্র অপেক্ষা করে আছে তোমাদের জন্য। তার ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে টেবিল খালি হতে শুরু করল কি? একজন দু-জন করে মাছেরা ঝরে যেতে লাগল কি তাদের নুড়িপাথরের অবলম্বন থেকে? কোথায় যায় এরা? দুঃস্বপ্নের কোনো দেশে? তরুণ কবি আমাকে জানিয়েছে, এই ভিড়টা সরে যায় কোনো পানশালায়। কফির চাইতে গাঢ় কোনো নেশায় আচ্ছন্ন থাকে যে জগৎ, সেখানে দুঃস্বপ্নের রঙ কেমন — ভাবতে ইচ্ছে করে।

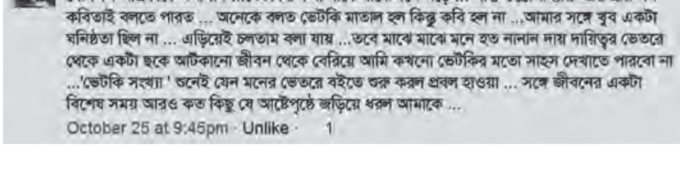
এমন সময়ে সেই 'মেয়ার', ব্লেকের আঁকা দান্তে-চিত্রণের বামন-দানব, এই শহরের যাবতীয় দুঃস্বপ্নের অধিকর্তা, কবি এবং ভাষা-বিপর্যয়কারী এই না-মাছ লোকটিকে এক মিছিলের সামনে দেখতে পাই। সে মিছিল যেন স্যামন মাছের। 'ভেটকি' নামের এক দুর্বোধ্য মাছ যেন অগণিত স্যামনকে নিয়ে চলেছে মিষ্টি জলের এক জলাশয় থেকে অধিকতর নোনা অধিকতর গহীন এক তরঙ্গের দিকে। মিঠে জলে পড়ে রয়েছে স্যামনদের ডিম, যাদের 'কবিতা' বলে ডাকে এই শহরের দুঃস্বপ্নগ্রস্তরা, 'ভেটকি' নামের সেই মাছ তাদের নিয়ে চলেছে ভাষাকাঠামোর থেকে দূরে। যেকোনো কাঠামো থেকেই দূরে। রচিত হচ্ছে এমন সব যাত্রারেখা, যাকে আর যাই হোক, 'কবিতা' বলে ডাকা যাবে না কিছুতেই। আমিও কি এদের সঙ্গ ধরলাম?

তাহলে, এরপর মুছে আসবে সমস্ত স্মৃতি। এরপরে মুছে যাবে পিছুটান আর পিতৃদুঃখ। নুড়িপাথরের আদরে বেড়ে-ওঠা সংসার ছাড়িয়ে কোহলসমুদ্রের গভীরে ডুবে থাকা অজানা পাহাড় আর খাদের মধ্যে দেখা যাবে এদের। এদের সঙ্গে আমিও কি থাকব? আমার সময় কমে আসছে এই শহরে। আমি আমার যেটুকু সত্তাকে রেখে যাব এখানে, সেটা সেই ডুবোপাহাড়ের চুড়োয় একটা লাইব্রেরিকে খুঁজবে। সেই গ্রন্থাগার, যার প্রতিটা বই-এর মলাট বন্ধ করলেই শুরু হয় পাঠ। সেই লাইব্রেরি, যার জানালা দিয়ে উঁকি মারলেই চোখে পড়ে অতলান্ত খাদ। জলে ডুবে থাকা সেই খাদের কিনার মাছেদের ডাকে। ফ্যাদম-ফ্যাদম জলের নীচে ফুসফুস বিদীর্ণ করার জন্য ডাকে। আর সেইসব মরা মাছের দঙ্গলে টহল দেয় এক বামন-দানব, এক নির্দয় 'মেয়ার'। সে অতিজীবিত। সে রপ্ত করে ফেলেছে দুঃস্বপ্নের ব্যাকরণ।

অনুবাদকের নোট

ইতালীয় দার্শনিক ভাষাতাত্ত্বিক প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক উমবের্তো একো নাকি এই শহরে ছিলেন কিছুদিন। কবে, কত সালে, তা বলা যাবে না। একটি জার্নাল, যা সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই সাল-তারিখহীন, তিনি রেখে যান আমার জিম্মায়। তাতে ভেটকি-বিষয়ক এই এন্ট্রিটি ছিল। এটি সে-লেখারই অপটু ভাষান্তরণ।

facebook


Kalyan Gangopadhyay · 226 mutual friends

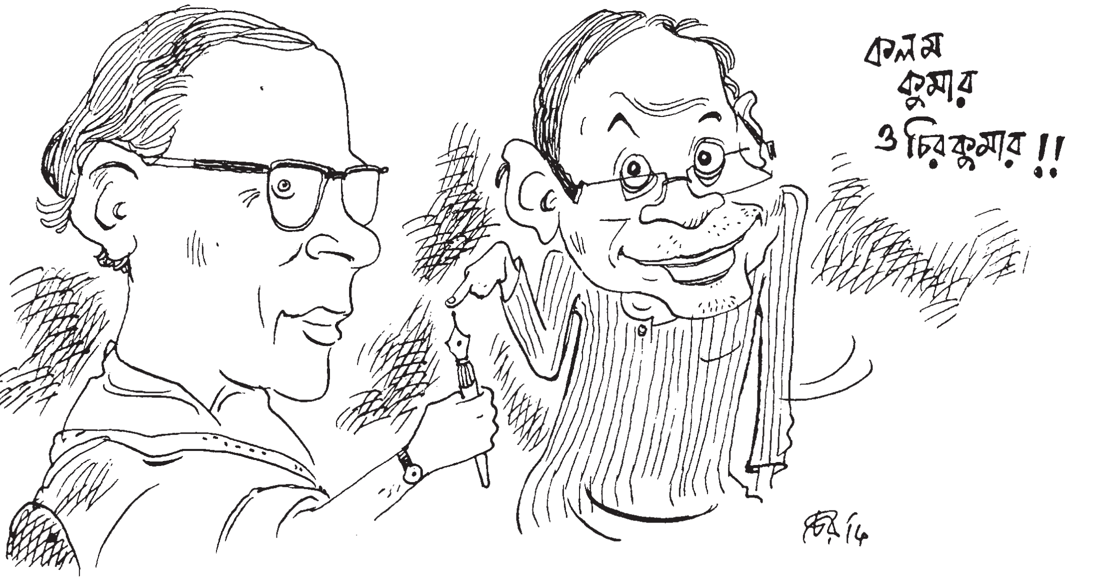
বোধশব্দ পত্রিকাকে ধন্যবাদ ...ভেটকির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে ... শক্তি চট্টোপাধ্যায় -এর প্রায় সব কবিতাই বলতে পারত ... অনেকে বলত ভেটকি মাতাল হল কিন্তু কবি হল না ...আমার সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না ... এড়িয়েই চলতাম বলা যায় ...তবে মাঝে মাঝে মনে হত নানান দায় দায়িত্বর ভেতরে থেকে একটা ছকে আটকানো জীবন থেকে বেরিয়ে আমি কখনো ভেটকির মতো সাহস দেখাতে পারবো না ...'ভেটকি সংখ্যা' শুনেই যেন মনের ভেতরে বইতে শুরু করল প্রবল হাওয়া ... সঙ্গে জীবনের একটা বিশেষ সময় আরও কত কিছু যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল আমাকে ...

October 25 at 9:45pm · Unlike · 1

ভুজুং কৃত্বা হুজুং পিবেৎ অথবা যা কিছু গাল সখেদে পারিবার যোগ্য

কমলকুমার মজুমদার

রেজলিউশন নয়; সিনট্যাক্সেরই ট্যাক্সেশন নিতে পারল না স্ক্যানার, জেরক্স, মায় আদিম সাইক্লোস্টাইলও। মূল পাণ্ডুলিপি থেকেই বকমলে কপি করে দিলেন অনন্যোপায় **পল্লব চক্রবর্তী**।



চন্দ্রলগ্ন শাখা প্রশাখা একটিমাত্র তো নয়... ইহাটিরে অপর বা অপরাপর কী বলিব! ইত্যাকার মেদুর সুষুম্না! বহুগর্বী বইপাড়ার অন্ধকিত জড়ায়ুজাত অবিমিশ্র ইদ্ যিনি পেশাদুষ্ট, কালকর্ষক, প্রগল্‌ভ, প্রবল চিত্তাকর্ষক, মদির। ভো ভেটকে, ভো ভেটকি... ইনিও পুস্তকপ্রাণ, কব্‌তেপ্রাণ, আলোকচোনা না হউন, অবশ্যই রশ্মিচোনাপ্রবণ এক অনতিপ্রামাণ্য নথি এবং সর্বোপরি এবং সম্ভবত যে কারণে এক ধীস্নাত ব্যক্তি সুনীলসাগরে শক্তিপ্রমাণে ইহ ভেটকিটি ছাড়িবার তাল করিয়াছেন তাহা এই যে তিনিও আমারই ন্যায় প্রয়াত ও প্রশস্ত এক বর্তমান; ফলত পত্রিকাগামী। যুক্তিরও বিশেষ অবহেলা নাই। সুনীলে সাগরে শক্তি প্রয়োগে যদ্যপি কমল ফোটানো সম্ভবে তবে ইত্যাকার দুরূহ গজাল কেন না ফুটিবে? সন্তর্পণ ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কতা, কালান্তক ফুসফুস ও মেটের ছবি সমেত সম্পাদক যে ছাপাইবেনেই এমত আশান্তেও আমি দুঃ দিব না এইমাত্র কথা দিতে পারি। মহাপ্রাণেরা কত কীই যে বর্ণময়, অর্থময় করিয়াছেন, করিতেছেন, বলিতেছেন; বলিয়াছেন যে... গুরু মৃত হয়েন, গুরুত্ব থাকিয়া যান, গুরুত্বাধ্যায়ী থাকিয়া যান, পচিয়া হাজিয়া গিয়াও, উঁহু, গন্ধ নাই, পুরীষ নাই প্রমাণেচ্ছু উকারত্যাগকরত গরুত্বধারী হয়েন। গরুর পাল আমোদে হাটেবাটে হাসাহাসি করেন। জননেচ্ছাপ্রবল এই ধরাত্রাসে, এতময় এই পত্রিকাখানাগুলির একটিতেও ডবগা মাগিটির ন্যায় আপনাকে আবিষ্কার করিতেছি যেন এক নিস্পেষিত দন্ত্য-ন্যঃ। জিহ্বারও যে লাজ আছে, জন্ম আছে এবং তাহা খসানোও সম্ভব ইহা জানিয়াও তাহার ঔরস খোঁজে বঙ্গজ যেন আহাম্মক যে ব্রতী হইবেন! ফলত পিঠ কাটিলাম। অগত্যা পিঠ পুড়িবে না। ইহাদৃশ উপাদেয় আরাম... অন্যতর শ্যামলসন্ধানী ইনিও যে বুদ্ধই, সিদ্ধার্থই এবং বংশগতিকে দাসত্বস্খালনপ্রয়াসী অতএব প্রতিস্পর্ধী... ইহার তূর্যাড়ম্বরিত ভূয়সী সোপাননিনাদ প্রেক্ষিতে... সহমরণেচ্ছা জরজর গোলকদ্বয়, অক্ষিগোলকদ্বয়; সুস্খলিত চরণাচার প্রেক্ষিতে বহুকাঙ্ক্ষিক, অনুপেক্ষিত বরং অপেক্ষিত। এও, বিন্যাস যে শ্রেণী তাহাবগত এবং শ্রেণীর শ্রোণীবিহারী এক মানবাশ্রয়ী আত্মা; ধনধান্যপুস্পভরা ভোগস্বপ্নবিভোর উন্মার্গবিলাসী-দিগন্তকামী-উড্ডীন বলাকা-মধ্যে একমাত্র ধনেশ অতএব স্নেহার্দ্র, পিচ্ছিল। তুমি এবং আমি কি একই একলব্য!... আত্মতোষণ নাম্নী অধুনা শঙ্কিলাবর্তে পমেটমটি আর নাই রাখিলাম। বরং আইস ভেটকি, দুইজনে পাঠককে জনগণ সাব্যস্ত করিয়া উহাদিগের চিত্ততোষণার্থ প্রমত্ত হই হে। ইহারদিগেরে বরং বড় আস্কারাপ্রবণ মাতোয়ারাগন্ধী ইল্লি! আমিও লিখিতাম, তুমিও লিখিতে, যেদিন সুনীল জলধি হইতে জাগিল শক্ত... ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যেন... নিজেকে বড় দূর মনে হয়... মনে হয় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যা তাহা এক বাক্যস্ফুটনাঙ্ক। আমাদিগ দুই-ই জলজ... বঙ্গসন্তান... খ-বাচক মালবাহী... টোলাবর্তীজীব... যদিচ আমার ফণা আছে তোমার ঝুমঝুমি নাই... অবশ্যই মণিমুকুতাও পাথরই, যেন বর্ণ আছে বা নাই এবং আকাঙ্ক্ষাই সত্য এবং আকাঙ্ক্ষিত বর্ণটিই সত্য, অর্থ, পরমার্থ। ত্যাগী, বঙ্গভাগী, সঙ্গভাক, অকলনক, গভারপ্রয়াসী, গুহ্য হে ভেটকি আইস, আমি তোমারে বন্দনা করি, অর্চনা করি, হে জ্ঞাত পুরন্দর, হে আদর্শ পৌণ্ড্র। আপনি সেই বৃহৎতর বটবৃক্ষ যাহা বড় চায়, বড় শখ এমন যেন পারাপারের নৌকা বাঁধা কটি ঘিরি, ঘিরি কত অতুল ছন্দে সেই নাচিছেন নটবর, গিরিধারী, মদনমোহন। হৃদ্‌পত্রে হৃদ্‌পত্রে আপনি নিশ্চয়জ্ঞানে যে ক-টি আখর টানিয়াছেন তাহারদিগের প্রতিটিই অদ্যপি চক্রবৃদ্ধিহারে সুতা কাটিতেছেন। জীবননাট্যমঞ্চে আপনি স্বয়ং নাট্যকার, স্বয়ং সূত্রধর, স্বয়ং নাট্যচার্য এমনকী স্থানাভাবে স্বয়ং নাট্যমঞ্চ। এতাদৃশ গরিমালিপ্ত খলিফাচিত্ত পয়গম্বর হে চিরপ্রণম্য ভেটকি, এক্ষণে যখনই পলায়নের উপায়রহিত অবলোকনরত উদ্দীপনব্যাকুল, আপনার চিত্তপটে আমি ও আপনি একাকার হইলাম। যদিচ সংসারযাপন দায় তথা দ্বারা জায়াগৃহিণী পরিবৃত সংকটমার্কা শৃঙ্খল ধারণ ও মোচন সুখ বিবর্জিত আপনি এবং আপনার লীলাধারটি কিঞ্চিৎ খর্বকায়, তথাপি আপনি আমি জ্ঞাত এবং সর্বজ্ঞাত এই যে জগৎ সারাৎসারে আমাদিগ সুনীল শক্তি মার্কা হজমিবটিকা বই অন্য কী! য়ুরোপীয় তত্ত্বসারাৎসার যা কিছু, প্রাচ্য দেশীয় তত্ত্বসারাৎসার যা কিছু আমি জ্ঞাত তাহামাত্রেই দশমীর মহাগঙ্গায় ফেলিয়া আসি এবং কেটি গমন করি — ফেপরাচুস্তামায় সংসর্গগামী, অবারিত দ্বারাদিপ্রসূন এই আমিত্ব, ইত্যাকার বিদ্যাধর সংকুল পরগনায় কতিপয় বিদ্যাসুন্দর পুচ্ছ সংগ্রহে ব্রতী ব্রতচারী ও

চারিণীগণকৃত লোলনৃত্য বরং দর্শাই। কালেজে কালিমালিপ্ত জনপদব্রজে আমাদিগ খ-এ খলিফালিপ্ত মতামত জহরাই। ইহার দিগ কী বুঝিবেন বা বুঝিবেন এবং বুঝিবেন বরং বুঝিবেন কিন্তু বুঝিবেন তাহাই যে জল্পনা তাহে কিঞ্চিৎ ঘৃত, লবণ, শর্করা, মশলা দিইয়া দিই। আমাদিগ যে চরিতাবৃত, যে সামন্ততান্ত্রিক দর্পণ তাহাতে পদতল পদপিষ্ট, হাঁটু বপুপিষ্ট, স্কন্ধ মগজপিষ্ট ইত্যাকার স্বতঃসিদ্ধ, সাধারণ এবং স্বাভাবিক দৃশ্যাবলিই পরিজ্ঞাত হয় যেহেতু খাদ্যাখাদ্য হজম এবং হাজাম সংক্রান্ত বিষয় সকলই লোকান্তরিত অতএব গুহ্য। ইহ সংসার যে বৃহতাবৃহৎঅতিবৃহৎবৃহদাপন্ন যন্ত্রসার তাহাতে আমাদিগ জাতিসূত্রে জ্ঞাতিসূত্রে ভৃত্য-ভর্তিকাপিটিক দন্তক্যালক্যাল; দিবারাত্র দশ ঘটিকায় চ্যাল খাইয়া ব্যাল কীর্তনিয়া ক্যাম্মারাইয়া থাকি বা না থাকি প্রধানমন্ত্রী সকল প্রধানমন্ত্র দেন, সিঙ্গুরে পোখরানে বুদ্ধ স্ফুটিত হয়েন, চন্দ্রযান মঙ্গলযাত্রা করেন। সকলি শুভমস্তু তথা দৃঢ়াতিদৃঢ় শুভমাস্তুল ন্যায় আমাদিগের সভ্যতাযাত্রাপালা অব্যাহত রাখেন... মধ্যরাত্রে ক্যা বিড়ি ফুঁকে ইত্যাকার পাটনাজনোচিত 'রা' আমাদিগ কাড়ি না। অতএব ভেটকি আইস, প্রসন্নব্যাদান করো, জলাপূর্ণ বাংলা গলাধঃকরণ করি।

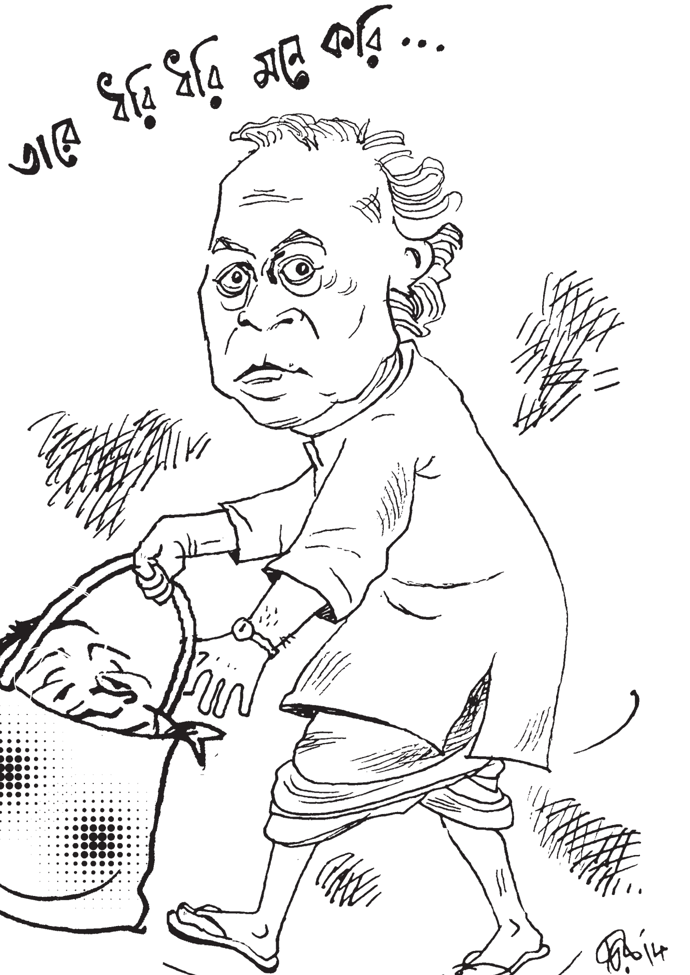
পুরোধাগাবী হে সহৃদয় দাস, ভক্তিপুরবাসী তুমি বিপুলসামান্য ছিটের বেড়াটি, সামান্য চন্দনের ছিট্‌কার, কিঞ্চিৎ ধুনার জল, গুগ্‌গুলের ধুঁয়া, গাঁদাপুষ্পের তিনটি চারটি মাত্র বীজদল স্বীয় কক্ষপুটে, বক্ষপুটে, পার্শ্বপুটে, ঝুলিকায় বহন করিয়া এই সুবিপুল কলিকাতা অরণ্যে কালিজস্ট্রিটের অজস্র গুহাকন্দর পার হইয়া কোন এক টালাসিখোলা নাম্নী নির্ঝরিণীর শীতল স্রোতে স্নাত হইয়া কোকোবনে পঞ্চমুণ্ডির আসন আলোকিত করিয়া বসিতে — অহো, আহা, পরিত্যক্ত স্পুটনিক হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া, কতদিবস আমি পুনশ্চ নিদ্রামসি গমন করিয়াছি। এক্ষণে যদ্যপি আমাদিগের জপমাল্যটি বাংলা মধ্যে গাবিত এবং পুনঃগাবিত হইতেছে, আইস দুইজনে মহাকাশ হইতে ঢিল, পাটকেল, নাটবল্টু, হেলমুট, অক্সিজেন সিলিংডার প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে ছুড়িয়া ছুড়িয়া প্রচণ্ড কালীতামাসা তথা দীপাবলির উদ্রেক করি ইহ বিপুল ডবগা মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে —

জয় জয় দেবী চরাচরসারে
কুচযুগ শোভিত মুকুতাহারে॥

গভীর জলের ভেটকি

শিবরাম চক্রবর্তী

অলি নয়, গলি নয়। টাইম-স্পেস গুলিয়ে কোন এক pun-শালা থেকে এসে-মেসে লেখাটি পেলেন রাত দেড়টার টলমল **দীপাংশু আচার্য**!



ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। এমনকী প্রবাদপ্রতিম লেখকদেরও ঘোল খাইয়ে ছাড়ে এই আপাত ছাপোষা প্রবচন। আজীবন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির পরেও স্বর্গে গিয়ে অকর্মার ঢেঁকি হয়ে বসে থাকার জো নেই। কেজো তাকে হতেই হবে, মরণের পরপারেও। যদিও বা ইহলোকের সঙ্গে বেড়ে যায় ব্যবধান, তবু ধান ভানার নিরন্তর বাজারি দায়দায়িত্ব জারি থাকে চিরটাকাল।

যেকটা দিন মর্ত্যে ছিলাম, বলা ভালো, যেকটা দিন নর্থে ছিলাম, নিছক চুটকি-লিখিয়ে আর ফরমায়েসি সাহিত্যিক হিসেবেই নামডাক ছিল বেশি (ডাকনাম, সে তো কবেই হারিয়েছি বাড়ি থেকে পালিয়ে)। কিন্তু মরে ভূত হওয়ার পর, সাহিত্যচর্চা তো দূরস্থান — নিজের নামটুকু পর্যন্ত মুখে আনার সাহস পাই না বিশেষ। ভূতের মুখে শিবরামনাম তেমন জুতসই নয় কিনা! যাকগে যাক। ছিলাম দিব্যি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, ঈশ্বর আর ভালোবাসার খুব কাছাকাছি। আচমকা সেদিন কথা নেই বাত্তা নেই এক বে-আক্কেলে ছোকরার ফোন।

কী যেন এক ছোটো পত্রিকার সম্পাদক সে। গালভরা নাম ম্যাগাজিনের, 'বোধশব্দ'। আমার শব্দবোধের কারণেই হয়তো বা তার এই ফরমায়েসি ফোন। আমায় একপিস গদ্য লিখতে হবে তাদের আগামী সংখ্যায়। আমার শঙ্কার কথা ভেবেই সে আগাম পেড়ে বসল তার সংখ্যা-তত্ত্ব। অর্থাৎ আনতাবড়ি গদ্যের ফ্রিস্টাইল তুবড়ি নয়, অ্যাক্কেরে বিষয়ভিত্তিক ফিচার। বৈষয়িক আমি কোনোকালেই নয়, এমনকী ফিচারবুদ্ধিও তথৈবচ। তাও কোনজন্মে টেঁসে-যাওয়া ছুটকো রম্যলেখকের কাছে তার এই উটকো আবদার। সাবজেক্ট : ভেটকি। লিখলে ভেট কী পাব, যদিও তার কোনো উচ্চবাচ্য নেই! এই মাৎস্যন্যায় ছোকরার ধর্মে সইবে না ঠিকই — কিন্তু কেন জানি না, তার এই বিটকেল বায়না আমি ফেলতে পারলুম না (অবশ্য একে বিটকেল না বলে অফবিটও বলা যায়)।

সমস্ত নান্দনিক প্রথা আর নিয়মের ফিউডাল বালাই টপকে ম্যাজিক রিয়েল মগডালে চেপে বসেছিল ষাটের দশকের বাংলা কবি ও কবিতারা। কাব্যচর্চা ও চর্যার এক অনাবিল বালাই ষাট! প্রতিষ্ঠানকে লাই বা ব্যাকরণকে তোল্লাই দেওয়ার কোনো চেষ্টাই ছিল না সেইসব আভাঁগার্দদের চরিত্রে। ছিল দিনবদলের দামাল চেষ্টাচরিত্র। একাধারে বোহেমিয়ান ও আবহমান। এহেন ষাটের দশক পুরোপুরি ভাটের দশক না হলেও, আজকাল বেশ বুঝতে পারি, এর তিনভাগ ছিল মিথ আর একভাগ মিথ্যে... স্বর্ণযুগের সেই সমস্ত বর্ণময় হুজুগ ঘেঁটি ধরে ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভাষা আর যাপনের মোড়। প্রাতিষ্ঠানিক বৈধব্যের ঘাড়ে এক ফাজিল কামড় যেন-বা! মৃত্যুচেতনা ছিল, নেশা ছিল — কিন্তু তাও স্বীয় দশককে শোকসভা হয়ে উঠতে দেয়নি এরা। ভরপুর ছিল হ্যানার্কি ত্যানার্কি আর অ্যানার্কি। মিথে আর মাতলামোয় উপচে উঠেছিল সময়ের মনোময় টাইমকল। কবিতার সেই কল-সেন্টারে, বাংলাভাষার সেই নবকল্লোলে সুনীল-শক্তি-উৎপলের মতো রাঘব-বোয়ালদের ভূমিকা যেমন ছিল, ঠিক তেমনই সাপোর্টিং রোল সামলেছেন অগুনতি সরল নেপথ্যনায়ক। এই লিস্টের টপে যিনি, তার নাম শুনলেই হাজারো রং-বেরং-এর ঘটনা ঝরে পড়ে টপাটপ। মার্জিনে বসে থাকা আমাদের নিঃসঙ্গ ভার্জিন হিরো, গভীর জলের ভেটকি...

স্বচক্ষে প্রথমবার ভেটকিকে দেখি কফি হাউসে। ঠিক ভেটকি নয়, সেই প্রথম দেখা আমার কাছে যেন এক ভেলকি দর্শন। তার কাণ্ড দেখে আমার প্রকাণ্ড বর্ণচেতনায় 'ট' আর 'ল' গুলিয়ে একশা হয়েছিল বিলকুল। ট-ল-ম-ল পায়ে সেদিন সবাইকে চমকে দিয়েই হাউসের টেবিলে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভেটকি, আর মদে-মাখা আমুদে কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল — 'বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো, ভূতের মতো দেখায়'! হ্যাঁ, সেদিন তো ভূতই দেখেছিলাম আমি। মাতাল বিরহে সশরীরে দাঁড়িয়ে ওঠা বেঁটে-খাটো দলছুট এক অশরীরী। বলাই বাহুল্য, অ-ভূতপূর্ব সেই অভিজ্ঞতা!

আমার নেশা বলতে চিরকাল মিস্টিরিয়াস সব মিষ্টান্ন আর স্বরচিত রাবড়িচূর্ণ। তাই আমি যখন যেতুম আহিড়িটোলা, ভেটকি ছুটত খালাসিটোলা। বাংলা বলতে ভাষা আর দেশই বুঝতাম বরাবর। কিন্তু ভেটকির বাংলা শুধু ভাষাতেই আটকে থাকেনি। তুখোড় এক তরলের সোমসাগরে ভাসা আর ভেসে চলাই ছিল বাংলাখোর ভেটকির নাছোড়বান্দা রুটিন। এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও নানা আড্ডায়, এখানে-ওখানে, চায়ের দোকানে আমার PUN-আসক্তি আর ভেটকির পানাসক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল অজান্তেই। একদিন এক আসরে আমার অনর্গল শব্দবাজিতে বাজিমাত হয়ে ভেটকি বলে উঠেছিল, 'শিব্রামদা আজগে তো আপনি PUN-এর PICK-এ!'

শুধু পান করা নয়, পান খাওয়াতেও ভেটকির জুড়ি মেলা ভার। বেশিরভাগ সময়েই তাকে খোশমেজাজে জাবর কাটতে দেখা যেত। সিগারেট-খেকো মেয়েদের ভালোবেসে শক্তির কবিতার বই উপহার দিত সে। আর সেইসব বই-এর উৎসর্গপত্রে লেগে থাকত চিবোনো পানের লাল-লাল ছিটে। কেউ-কেউ মুগ্ধ হত প্যারালাল প্রেমের অন্যমনস্ক আভায়, আবার কেউ ভাবত লোকটার মাথায় নির্ঘাৎ ছিট!

প্রেসিডেন্সির মেয়েদের ভারী ভালোবাসত ভেটকি। আর প্রেসিডেন্সির মেয়েরা ভালোবাসত কুকুর। এইখানেই যত বিপদ। পদে-পদে হেনস্থা হওয়ার নিদারুণ আতঙ্ক। কুকুরদের তো প্রচণ্ড ভয় পেত ভেটকি। এদিকে প্রেসির ছাত্রীদের মধ্যে সারমেয়দের ব্যাপক পসার সারাক্ষণ তটস্থ রাখত তাকে। রীতিমতো সাবধানে, প্রেসিবহুল কুকুরদের নজর এড়িয়ে ডগমগ মেয়েদের কাছে ঘেঁষত সে।

উত্তর কলকাতার অত্যন্ত বনেদি বাড়ির ছেলে হয়েও, কেন বাড়াবাড়িরকমের বিশৃঙ্খল জীবন বেছে নিয়েছিল, তার উত্তর কারো কাছে না থাকলেও, ভেটকির কাছে ছিল নিশ্চয়ই। কিংবা হয়তো কোনো প্রশ্ন-উত্তরেরই ধার ধারত না এই ধারালো মানুষটা। হয়তো স্রেফ 'ধুত্তোর' বলে, নিয়ম-কানুনের তামাম মামদোবাজিকে বুড়োআঙুল দেখিয়ে ফুটিয়ে গিয়েছিল একের পর এক কালারফুল...

অনেকেরই ধারণা, শুধুমাত্র সুনীল-শক্তি ও অন্যান্য কিংবদন্তি লেখকদের আশেপাশে ঘুরপাক খেয়ে আর মাতলামোয় সঙ্গ দিয়েই ইতিহাসে বেমালুম জায়গা করে নিয়েছে ভেটকি — কেবল জিনিয়াস শিল্পীদের মিথোজীবী হয়েই তার এই মিথ হয়ে ওঠা। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন না, লেখালিখিতে প্রসিদ্ধ না হলেও, সিদ্ধহস্ত ছিল ভেটকি। তাই শুধু চাটুজ্জেদের শকতি নয়, ভেটকিদের ভকতিকেও স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। গুরুদের সৃষ্টিকে প্রচার করতে এতই ব্যস্ত থাকত সে, নিজেকে গুরুত্ব দেওয়ার সময়টুকুই মেলেনি। কার মুখে যেন শুনেছি, *দেশ* পত্রিকায় নাকি ভেটকির দুটো কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল সেইসময়। প্রতিষ্ঠান বিরোধী হলেও, সেদিক থেকে ভেটকিকে দেশ-দ্রোহী বলা চলে না।

অথচ বাংলা কবিতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা এই মানুষটা যেদিন বিদায় জানাল সব্বাইকে, কী দায়সারা সেই ফেয়ারওয়েল। বাড়ির লোক ছাড়া কারো নাকি টিকি মেলেনি শুনশান শ্মশানচত্বরে। মরণকালে ভক্তের ভিড় উপচে-দেওয়া রেকর্ড-ভাঙা দুঁদে হিরো তো সে ছিল না; ভেটকি ছিল সেই হিরোসিমা যে নির্দ্বিধায় প্রথা ও ক্ষমতার সমস্ত সীমা টপকে গিয়েছিল খুদে-খুদে পায়ে। আজীবন তার যাপনের প্রতি সে ছিল সৎ আর মরিয়া। তাকে প্রমাণ করতে হয়নি, সে মরে নাই!


facebook

সাম্যব্রত জোয়ারদার সেই সব দিন রাত্রি।
October 20 at 1:40pm · Unlike · 5

Sabyasachi Sarkar amader university jibon .. coffee house er jiboner pranpurush
October 19 at 4:48pm · Unlike 1

Arjundeb Sensarma shared your photo.
October 24 at 4:09pm

Presidency college ke kendro Kore,je bidyabangso akdin samagro puurbobiswake alokito korechhilo,tar kono torchbearer ke chihnito kaura jay na.kintu sei bidyaayoton je uttol,abotaul bondhur biswe thokor thokor khete khete gachhe,sei jeebone brohmocharjo nei,kintu akta boiragyo achhe.ei boiragyer bibek amar jana onyo kono shikkhasatro arjan korte pare ni bolei amar dharona.tar karan mota kathay bolle,onyo sabai kaaryo,presidency college karan.karaner atmolop ei karjyor udvas.vetki sei atmolop er oikantik metaphor.sei aksomoyer presidency college,athocho se amader keu na.
Show Attachment

ভ্যাটকানোসুলভ মুখব্যাদান

অচ্যুত মণ্ডল

‘অচ্যুতদা-অচ্যুতদা’ চিৎকারে কলেজপাড়া টু উত্তরপাড়া মাত! কোটেশন ও ধুলো ঝেড়ে শুধু রি-রাইট করে দিতেই তলায় চিড় ধরালেন **ঋত্বিক মল্লিক**।



মাছের অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যদি শুধু শব্দটা ভাবি, অবশ্য শুধু ভাবলে হবে না, যদি উচ্চারণ করি, তাহলে ‘ভেটকি’ শব্দের মধ্যে যে ভ্যাটকানোসুলভ মুখব্যাদানও লুকিয়ে আছে, তা-ও এক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। শব্দের এই ব্যুৎপত্তি নির্ণয় নিশ্চয়ই কোনো সুনীতি-সুকুমারমতি অ্যাকাডেমিশিয়ানের কাজ নয়। কারণ ভেটকির চেহারা আর মুখের গড়নে তার বিরোধিতা আছে, এমনকী ঘোলাটে একটা চশমা থাকলেও। চশমার কথায় না-হয় পরে আসা যাবে, কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রসিদ্ধ অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানে এসে যে কয়েকজনকে গাত্রবর্ণে পোশাকে চলনে তৃতীয়বিশ্বের মানুষ বলে মনে হয়েছিল, ভেটকি নিঃসন্দেহে তেমনই। ফলে ভেটকি সে-প্রতিষ্ঠানের উঠোনে যতই ঘুরে বেড়াক না কেন বা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও যে সারস্বত আয়োজন, সেখানে যতই থাকুক না কেন, সবসময়ই সে বিভ্রান্ত, বিষাদগ্রস্ত এবং কোণঠাসা। ওই প্রতিষ্ঠানের হাতে-গোনা তৃতীয়বিশ্বের মানুষরাই তার বন্ধু, তাদের কাছেই ছিল তার যাবতীয় (কৃত্তি)বাসি গল্প।

কিছু পত্র-পত্রিকায় সিদ্ধার্থ দাসের কবিতা একসময় পর্যন্ত দেখা যেত। আজ হয়তো বেশিটাই হারিয়ে গেছে। শোনা যায়, সত্তর দশকের শেষে কিংবা আশির দশকের গোড়ায় ভেটকির একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। আমি সেই বই দেখিনি, এমনকী আমার সময়ের কেউ তা দেখেছিল বলেও শুনিনি। যদি সেরকম কোনো বই না-ও থাকে, তাহলেও ভেটকি কবি। যদি থাকেও, তাহলেও সে-বই দিয়ে ভেটকিকে মাপা যাবে না। অবশ্য মানুষকে মাপার এক নিজস্ব ধরন ছিল ভেটকির। এরকম একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপারকে ভেটকি কংক্রিটাইজ করত তারল্যের মাত্রা দিয়ে! যে যত পেগ (বা গ্লাস, বা ভাঁড়) মদ খায়, সে তত মহান মানুষ, এমনকী সে তত বড়ো কবিও। এহেন কাব্যতত্ত্বের নিরিখে যাঁরা বড়ো কবি, তাঁদের কয়েকটি কবিতা তাকে বলতে শোনা যেত। অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার ছাপানো রূপের সঙ্গে তার বলার কিছুটা ফারাক থাকত। কারণ কবিতাটি তৈরি হওয়ার মুহূর্তে কবি তাকে এরকমই শুনিয়েছিলেন। সুতরাং একমাত্র পবিত্র তা-ই, যা শ্রুতি। উপহার দেওয়া বই-এ দু-চারটে শব্দ ছাড়া ভেটকিকে কখনো লিখতে দেখিনি, হাতের লেখাও তাই চেনা হয়নি। শ্রুতির সমস্যা হল যে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পালটে যায়, কিন্তু ভেটকির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সম্পাদনা চোখে পড়েনি। একটা বিশেষ সময়কে সে নিজের মধ্যে থামিয়ে রেখেছিল, যখন সে কবিতা লিখত, যখন সে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দিত। তারপর সে বোধহয় ঢুকে পড়ে আরেকটা সময়ের মধ্যে, তখন এই কবিতা আর গল্পগুলো ছাড়া সে চুপ করে থাকত, চুপ করে মদ খেত। এই চুপ থাকাটা আমাদের সময়ে একেবারেই স্মার্টনেসের পর্যায়ে পড়ত না। অ্যাকাডেমিক এপিডেমিক আর সরব কবিত্বের পাশে তার এই নীরব উপস্থিতি অনেক সময়ে আমার বন্ধুদের কাছে, এমনকী কখনো আমার কাছেও ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

একে অপরকে অপমান করার যে নিরন্তর চেষ্টা ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্যে, অপমানের প্রত্যাঘাতের যে প্রস্তুতিটাও তৈরি হত ভিতরে-ভিতরে, ভেটকির বেলায় এই বিষয়টাই ছিল একমুখী। শুধু অপমান আর অবজ্ঞাই সে পেয়েছিল, ফিরত দেওয়ার অভ্যেস তার ছিল না। ঠোঁটের ফাঁক থেকে নেমে আসা রুধিরবর্ণ নরপিশাচ-মুখে তখনও থাকত একটি ম্রিয়মাণ হাসি।

তেমন শীত পড়েনি তখন কলকাতায়, তবু এক ধূসর কোট পরে খালাসিটোলার হলুদ বালবের আলোয় ভিজে ঠোঁট নাক আর মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে থাকাটা সহ্য হচ্ছিল না একবার। বললাম, তুমি নিজেকে পালটাতে পারো না? সবাই কেমন এক জীবনকে জীর্ণ পোশাকের মতো ছেড়ে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তুমি পারো না ওরকম হতে? আসলে ভেটকির একরকম থেকে

যাওয়াটা মাঝে-মাঝে বরদাস্ত হত না। সবাই তো কেমন বেখাপ্পা হয়ে যাচ্ছে, অথচ তুমি কেন থেকে যাবে ভঙ্গুরমতো সব সভ্য মানুষের মাঝে! কেন তোমাকে দেখেই নিতান্ত অপরিচিতরাও চিনে নেবে 'ভেটকি' বলেই, এত অমোঘ আত্মপরিচয়ের চিহ্ন কীভাবে বহন কর! জড়ানো উচ্চারণে নীরেন চক্রবর্তীর কবিতার লাইনকে এলোমেলো করে বলেছিল — কাল থেকে ঠিক পালটে যাব।

পালটে তো যাচ্ছিলই। প্রেসিডেন্সিতে সে ক্রমেই হয়ে পড়ছিল 'বহিরাগত'। অবজ্ঞা আর অপমানে মাঝে-মাঝে চেপে ধরত হাত-দুটো, কলেজস্ট্রিটে দেখা হলেই। সেই কবিতা আর গল্পগুলোও বোধহয় সে আর বলছিল না, বলার লোক পাচ্ছিল না। ভেটকির প্রিয় কবির পঙ্‌ক্তি 'তখনই তো ধ্বংসের সময় / তখনই তো নির্মাণের জয়' জীবনে বহুবার বললেও, ভেটকির জীবনের চালটা ছিল এর বিপরীত। ভাঙা এবং আরও ভাঙার মধ্যে দিয়েই তার চলা, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নামকরণের মতো — 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা'। সুতরাং এই বিশেষ দর্শনে আস্থা রাখা ভেটকির যে একটা চশমার দোকান থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। সেই দর্শনায়িত ছোট্ট খুপরিতে আমরা মদ্যপানের জন্য যে কয়েকবার হানা দিয়েছি, তার মধ্যে একদিন এক খরিদ্দার এলেন। তাঁর চশমার একটি ডাঁটি খুলে গেছে। ভেটকি বেশ কিছুক্ষণ পরে খরিদ্দারকে যখন চশমাটা ফেরত দিল, তখন দেখা গেল ডাঁটিটি লাগানোর বদলে অন্যটাও সে খুলে দিয়েছে। এই বিনির্মাণপর্ব শেষ হলে হতবাক মানুষটিকে ভেটকি বলে দিল নির্মাণের সম্ভাব্য ঠিকানা। এই ঠিকানা, এমনকী পথনির্দেশও জানত ভেটকি, কিন্তু সেদিকে সে হাঁটেনি; বরং সারাজীবন অনুশীলন করেছে চশমার একটা ডাঁটি ভেঙে গেলে কীভাবে খুলে ফেলতে হয় আরেকটাকেও।

বাস্তবে যারা নির্দিষ্ট ঠিকানায় মানুষকে নিয়ে যায়, ভেটকি শুধু তাদেরকেই গালাগাল দিত; ভেটকির বেঁচে থাকার এক বড়ো কারণ কলকাতার ড্রাইভারদের অসাধারণ দক্ষতা। কলকাতার রাস্তাকে নদী মনে করেই ছিল তার সহজ চলাচল। তাই মাঝে-মাঝে সুতানুটি গ্রামে সেই বার্তা রটে যেত যে ভেটকি নদী ছেড়ে সাগরসঙ্গমে পাড়ি দিয়েছে। কয়েক দিনের জন্য ভেটকি একেবারে নেই হয়ে যেত কলেজস্ট্রিটে।

স্বাভাবিকভাবে ঠিকানা-লেখা গাড়িতেই ভেটকির মৃত্যু হল। ফলত ভেটকির মৃত্যুর পর 'ভাষ্যকার নাকি সংবাদ পাঠের সময় / কোনরকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে না', এটাই স্বাভাবিক ছিল। খর্বকায় এক মাছ কলেজস্ট্রিট নামের এক নদীতে কিছুকাল বেঁচে ছিল, সাঁতার কেটেছিল, তারপর একদিন সেখানেই ডুবে গেল, নিঃশব্দে...

চন্নামেত্ত, ছোঁচানোর জল

পুরন্দর ভাট

খচে ছিলেন। কুরিয়র না, মেল না। সম্পাদকের বাড়ি বয়ে এসে নিজেই লেখা দিয়ে গেলেন। প্রপার টাইমে। প্রপার বানানে। খিস্তি-ফিস্তি মারলেন। সঙ্গে তুইতোকারি। উড়িয়ে দিলেন। উড়ে ফিরলেন।



মাগনায় কী খিল্লি রে বাপ! গদ্য-ফদ্য ছেঁড়া এত ইজি নাকি! আমি শালা কবি, দুনিয়ার শেষ কবি। আমাকে দিয়েও হারামিগুলো গদ্য চুষে নিল। পেদো এডিটরটা মার্চ-এপ্রিলে নবারুণকেও চিঠি মেরেছিল। ডিটিডিসি। ফোনও মেরেছে। তারপর তো ও মরে গেল। বাঙালি শ্রদ্ধা পেলে কোট-আনকোট 'চলে গেল' বলে। 'মরে গেল' বলার ধক নেই। আমাদের আপনা রিলেশন ছিল। ডিএস-এরও ছিল। মদনের তো ছিলই। তবে আমি ওই মৃত্যু উপত্যকা না কী যেন, ওটা দেড় পাতা পড়েছিলুম বলে, তলে-তলে সবচেয়ে বেশি ছিল শালা আমারই। যাকগে, সেসব কথা লিখব না। হজম হবে না তোদের ব্যাটাচ্ছেলেদের। ওকে তোরা ছুঁতে যাসনি, মুতে ফেলবি।

তোদের তো চাই ভেটকি। ভেটকি নিয়েও আমি কপচালে তোরা রেললাইনে বসে হাগবি। ছোঁচানোর জল পাবি না। লেটারপ্রেসের সময় থেকে ওই মালকে দেখছি। বিষ মাল! ফ্যাতাড়ু হয়েও মনুর পয়দা করা ওই একপিসকে দেখে মাইরি ঝাঁট জ্বলে গেছে। ঠিক ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স গ্রো করেছে বলব না। কিন্তু, হালকার ওপর লাইট করে চাপ খেয়েছি বিলক্ষণ! কথায়-কথায় চ্যালেঞ্জ ফিল করেছি। মানে, একটা ক্লাস ডিফারেন্স না-হোক, কাস্ট ডিফারেন্স তো ফ্যাতাড়ুদের সঙ্গে থাকবে না কি! আবার এটাও স্বীকার না-করলে পাবলিক কলরব করবে — ও-ও কিন্তু কক্ষণও চায়নি তোদের মতো পকেটে খিস্তির মেকি লাইসেন্স নিয়ে ফ্যাতাড়ুর তকমা লাগানো জালি সোয়েটার পরে ঘুরতে। ও যা করেছে, ওর মতো করে। ফুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে! তাতেই ও আমাদের কাছাকাছি অ্যাচিভ করতে পেরেছে। দাঁড়া, দু-লাইন লিখেছি ওকে নিয়ে, পড়াই —

> ভজা আর গজা দু-ভাই,
> যাচ্ছে না কেউ দুবাই।
> থার্ড ইয়ারে ফেল মেরেছে,
> ভেটকি পড়ছে রুবাই!

এটা ঠিক, রুবাই-টা কান্তিচন্দ্র না নরেন দেব, কে যেন অনুবাদ-ফনুবাদ মেরেছে। ও মাল বাংলায় পড়ছিল ফর সিওর। আমি হলে বাল পড়তাম! অনুবাদ মানেই তো শালা ভেতো মাল। হয় জল মারা, নয় ট্যাবলেটে মেশানো। মাননীয় বন্ধুগণ, বন্ধুবরেষু, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই, এইখানেই ফ্যাতাড়ু আর ক্যালকেশিয়ানরা টোটাল আলাদা। পিওর না-হলে আমাদের দাঁড়ায় না, ভাই! তবে, তোরা আর এখন অনুবাদেও এসব রুবাই-টুবাই পড়িস না। লি ম্যা-এ চোখ বোলাস, স্রেফ নিজের লেখাটা খুঁজতে। ঠিকঠাক ছেপেছে কিনা দেখিস। তাও তো বানান ভুল ধরতে পারিস না! তোদের গায়ে থুতু দিতেও শালা লাং-এ চাপ লাগে।

তো, তোরা কী করবি, না, ওর নামে বিশেষ সংখ্যা! কত ফর্মা? ধ্যুর! বেসিক্যালি, কলেজ স্কোয়ারের ভেতরেই বিদ্যেসাগরকে হঠিয়ে ভেটকির মূর্তি



বসাতে চাইছিস তো! হবে না। পারবি না। কর্পোরেশনের হারামখোরগুলো দেবে না। কইমাছের মতো মুণ্ডটা আরেকবার গুঁড়িয়ে, তাতে ভেটকির মুড়ো লাগিয়ে গণেশ পুজো করাও তোদের কুলোবে না। দশটা-পাঁচটার চাকরি করে আর লিটল ম্যাগাজিনের শৌখিনতা মাড়িয়ে ওসব খচড়ামির দম তোদের নেই। বইমেলার মাঠে চু কিত কিত খেলা এত সোজা নয়, বাবু-উ-উ-উ! মাথায় যখন কাকে হেগে দেবে না, ডাবল-ডিমাই ম্যাপলিথো পাবি না, বউ-এর ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে হবে।

মহাকাশ হতে গু-খেগো শকুন হাগিতেছে তব গায়,
বাঙালি শুধুই খচ্চর নয়, তদুপরি অসহায়।

হেব্বি অসহায় লাগে। আসলে ইদানীং মালটাও ঠিক টসটসে হচ্ছে না। বাংলার বোতলটা, মানে, বট্‌লটা আর্জেন্টিনার জার্সির মতো করে না-দিলেই নয়! নীল-সাদা ডোরা-ডোরা, মারব চাবুক, চড়ব ঘোড়া... নাঃ, আবার কবিতা এসে যাচ্ছে। তার চেয়ে চিংড়ির চাটটাই আজ ভালো ছিল... লঙ্কা-ফঙ্কা মেরে, টো-টা-ল! তবে ও ব্যাটা চিংড়ির চাট লাইক করত না। ঢ্যামনা! হবে না কেন, নামে ভেটকি, চিংড়ির প্রতি ওর একটা ক্লাস অ্যাগনি তো থাকবেই! সত্যি, আজ ওর কথা বড়ো মনে হচ্ছিল। আহা, কী মিষ্টি ছেলে! বড়ো ভালো মন ছিল! পকেটে বিটনুন নিয়ে ঘুরত। তবে এটা ঠিক, ও শালা আমার লেখাকে নম্বরই দিত না। আউটকাস্ট করে দিয়েছিল। স্রেফ শক্তি, সুনীল, অমিতাভ কি ভাস্কর নিয়েই কাটিয়ে দিল। আউট হয়েই একবার তো লিখে ফেলেছিলুম। শেষমেষ, ক্যাওস-ট্যাওস হবে ভেবে, ডিএস বারণ করল, তাই ছাপিনি। আজ পড়ুন, পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত কবিতা —

পড়েছ শক্তি,
গিলেছ সুনীল,
ভুলেছ পুরন্দর!
ভেটকির কথা
বাণী ধরিয়াছ,
হবেই ভগন্দর।

নাঃ, আজ আর মুখ-খিস্তি নয়। তোরা তো সবাই বিশেষ সংখ্যা-টংখ্যায় কাউকে ক্রিটিসাইজ করতে চাস না। ভয় পাস নাকি কে জানে! পুজো-টুজো করিস। সেটা আমি পারব না বাঁড়া। এমনিই গদ্য লেখার হ্যাবিট নেই, তার উপর বানিয়ে লেখা তো পোষাবেই না। আরে বলছি তো, ভেটকি কোনো মহাপুরুষ ছিল না। আমি বলছি, শুনে নে। সঙ্গে এটাও শুনে রাখ, ও তোদের সব্বার থেকে সাড়ে চোদ্দো গুণ এগিয়ে ছিল। অ্যাটলিস্ট, হারামি-আঁতেল ছিল না। ধান্দাবাজ ছিল না। হাউস টু আকাদেমি ছক করে বেড়ায়নি। আর হ্যাঁ, আমার না-হোক, অন্যদের... কবিতাগুলো কিন্তু ভেতর থেকেই গড়গড় বলতে পারত... তোদের মতো চোতা মাড়াতে হত না!

অতএব, সময় দিচ্ছি, আরও চার-ছ-লাইন পড়... তারপর পাতি ফুটে যা...

স্মৃতিধর তুমি, বীরপুঙ্গব,
খেয়েছ খালাসিটোলায়।
কবিতার ক্লাস নিজে চালিয়েছ,
নুন রাখিয়াছ ঝোলায়।

বারান্দা থেকে ছন্দের সিঁড়ি
উঠে গ্যাছ পায়-পায়।
ক্লাস ফুরায়েছে হিন্দু কালেজে,
মুতিতেছ অসহায়!

অ্যালবার্ট হল অ্যাল হয়ে আজ
টেবিল ভরেছে ওঁচায়,
কবি ও কবিতা প্যান্টে হেগেছে,
মিনারেল জলে ছোঁচায়।

বেয়াকুব ট্রামলাইনের ধারে
দুই দেহ প'ড়ে ঠায়...
সিদ্ধার্থ ও জীবনানন্দ
দেখছে না কেউ, হায়!



'বোধশব্দ'-র এই অংশটি নিছক মজা ভাবতে পারেন, সিরিয়াস একটা অ্যাপ্রোচও ধরতে পারেন। তবে, যাই ভাবুন না কেন, কপিরাইটের কেস দেবেন না, প্লিজ। কান মুলে স্বীকার করছি, গোটাটাই ভাঁওতা! না... গোটাটাই কি? দুনিয়ায় হয়তো অলরেডি এসব হয়ে গিয়েছে — তবু, পরিভাষায় যারে কয় 'সিউডোগ্রাফিয়া', এ ততটা চালিয়াতি নয়। জালিয়াতিও নয়। আর, কে না জানে, অরিজিনাল তো দূরস্থান, তার কাছাকাছি কিছুও 'তৈরি করা' কখনো সম্ভব নয়। তবে কিনা এখানে, এই টেক্সটগুলির ভেতরেও কি যথেষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়ে গেল না? আপনারা, মানে, পাঠকই সে সিদ্ধান্ত নিন।

আর জানাই, এ-অংশের কার্টুনগুলি এঁকেছেন চিরঞ্জিৎ সামন্ত।

— সম্পাদক

facebook

Surojit Sen · 26 mutual friends
ওর চশমার দোকানে আমি, সোমক দাস আর ভেটকি বেশ কয়েকটি সন্ধ্যা কাটিয়েছি ......
October 20 at 12:53pm · Unlike · 1

ভেটকি কে?



বেমানান স্বাভাবিকতার ভূতুড়ে প্রত্যাদেশ

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

কবিতায় আঁসটে এবং পাকাপাকিভাবে এঁটো হয়ে থাকা ভেটকি নাকি নিজেও কবিতা লিখেছে, সেসবের কিছু স্যাম্পেল হয়তো খুঁজেও পাওয়া যাবে। হয়তো জরুরিও খুঁজে পাওয়া — কিন্তু সেসব খুঁজে পেলে এই লেখায় কোনো কাজে লাগত না। কারণ ভেটকি 'কী' ছিল অথবা 'কে' ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি সে 'কীভাবে' ছিল এবং 'কতটা' ছিল, সেটা বোঝার চেষ্টা করা। যে অভিজ্ঞতা এই লেখার পুঁজি সেসব শুধু গত শতকের নয়, গত সহস্রাব্দের ব্যাপার। গোটা পৃথিবী কী সাজগোজ করে কোন দুয়ারে কী বিভঙ্গে মিলেনিয়ামের মুখ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা খুব-একটা স্পষ্ট ছিল না। নিউজ বলতে সরকারি দূরদর্শন আর রাত বাড়লে সরকারি স্লটের ভাড়াটে হয়ে প্রণয় রায়ের এনডিটিভি। সূর্যগ্রহণ, ইন্দিরা-রাজীব লেভেলের অন্ত্যেষ্টি, ইস্ট-মোহন লেভেলের খেলার লাইভ টেলিকাস্ট শুরু হলেও, দৈনন্দিনের খবর লাইভ হয়ে ওঠেনি। ইন্টারনেট, ইমেল, মোবাইল নেই। অথচ সোভিয়েত ডুবুডুবু, পূর্ব ইউরোপ পেয়েছে খবর, পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু। এদিকে বাজপেয়ী-বসু, মণ্ডল-মন্দির-রামরথ-ডাংকেল-বানতলা। ডিরোজিও-রামগোপাল ঘোষ-মাইকেল থেকে সুভাষ হয়ে অসীমকাকা-সুকান্তভাইপো পর্যন্ত গড়িয়ে প্রায় থেমে আসা প্রেসিডেন্সির মুক্তির মন্দির সোপানতলে তখন শখের বিপ্লব আর বিপ্লবের শখের মহাউত্তেজনা। সমাজতন্ত্রের শবসাধনায় বিশ্বে বঙ্গভূমি অদ্বিতীয়, সেই পুণ্যভূমে অন্তত নয়ের দশক পর্যন্ত, এই প্রেসিডেন্সি ছিল অন্যতম সেরা পীঠ। পীঠে শক্তিদেবী কখনো একা থাকেন না। সঙ্গে একটি করে ভৈরব না থাকলে চলে না, সাম্য থাকে না। এখানে বিপ্লব যদি পরমারাধ্য শক্তি হয়, তাহলে কবিতা সেই শক্তির ভৈরব। মেইনস্ট্রিমের রাজনীতির রাজ্য সচরাচর গদ্যময়, কিন্তু ছাঁকা-ছাঁকা ছেলে-মেয়েরা যতদিন বিকল্প বাম রাজনীতিতে থাকে তাদের মধ্যে কবিতার সংক্রমণ প্রায়শই ঘটে যায়। রাজনীতি আর কবিতার মাখামাখি ঘটলে তার মধ্যে উপসর্গের মতো নেশা একটা উপাদান হয়ে ওঠে। এ-সবই ওই সমাজতান্ত্রিক গ্রামপতনের শব্দসঙ্কুল দিনগুলিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল। প্রেসিডেন্সি ঠিক অবিচল মরুভূমি ঘিরে বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ ছিল না, অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিয়ে ফেলার প্ররোচনা দেওয়ায় দক্ষ দেবদূতেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন অলিন্দে ও উদ্যানে। বেশ বোঝা যেত ফ্যান্সিবিপ্লব আসলে বাবুকালচার এবং ভদ্রলোকপন্থার বাইপ্রোডাক্ট। ফুয়েরবাখ আর ফুকো সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান, অন্তত জ্ঞানের সুদক্ষ প্রতারণা না থাকলে ওই আবর্তে পাত্তা পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। নক্ষত্রের দোষে ও গুণে সোভিয়েতপতন আর রামমন্দির যত কাছাকাছি আসছিল, বিপ্লবের জলসাঘরে ততই বাড়ছিল বুলবুলির লড়াই-এর মৌতাত। স্কটিশের ছাত্রপরিষদ থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এসএফআই, হেদো থেকে কলুটোলা — এই দু-প্রান্তের মধ্যবর্তী ছাত্রজনপদ তখন সেই মৌতাতে মাত।

সুমন চট্টোপাধ্যায় আর নবারুণ ভট্টাচার্যের জঠর-গোকুলে তখন বাড়ছে *তোমাকে চাই* আর *হারবার্ট*।

এমন একজন ছিল যে একাই একপাতার একটা গোটা (এবং সে শুদ্ধসত্ত্ব বসু নয়) ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করত বেশ নিয়মনিষ্ঠভাবে। কোনো বেরসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বিস্ময়চুলকানিতে বিহ্বল হয়ে সেটির বেধ নিয়ে প্রশ্ন করলেই সম্পাদক-প্রকাশক জবাব দিত — হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব্লেডের মতো, সরু কিন্তু ওরকমই ধারালো। আমাকে কৃপাপরবশ সে একদিন তার এই নন্দনস্ট্র্যাটেজির সিক্রেট বলেছিল। কবিতার বই ফর্মা অবধি গড়ালে নাকি খুব মুশকিল। এই অঞ্চলে যেসব প্রেস চলছে, তাদের আখাম্বা সিলিং ফ্যানের টাল-খাওয়া ব্লেড এমন এদিক-ওদিক বেসামাল হাওয়া মারে যে সংখ্যালঘু পেপারওয়েটসকল অপর্যাপ্ত

হয়ে পড়ে। কবিতার পাতা উড়ে গিয়ে সেঁটে যায় বিপ্লবের খোকাইস্তাহারের কৃশ ফর্মায়। এঁড়ে লোকেরা গোছালে কবিতার পাতা আর বিপ্লবের চটির পাতা মিলেমিশে যায়। বাঙালির বিপ্লব আর বাংলা কবিতার ভোক্যাবুলারিতে তুমুল মিতালি — এ দু-এর এমন তুমুল জিনোটিপিক্যাল যোগ যে একবার ধড়েমুড়োসন্ধি হলে আলাদা করা মুশকিল! এই জন্যেই নাকি সে একপাতার বেশি এগোয় না। পিডিএসএফ-আরোয়াইল-স্কলারগেঁজেল-গেঁজেলস্কলার-হাফক্রিমিনাল-পাক্কামাগিবাজ-স্বপাকলালিতশুদ্ধাচারী-কুমারীমা-কানীনপুত্র এইসব মিলিয়ে যে কার্নিভাল চলছিল, সেটার ধাত না বুঝলে ভেটকিকে বোঝা বেশ কঠিন। বোঝা অসম্ভব তাকে নিয়ে একটা গোটা সংখ্যা ফাঁদার বৈধতা। দ্বিচারিতা এবং সততার তখন কী ঘোর ওভারল্যাপিং, তা বোঝা যায় যথার্থশারীরকারণে অকালপ্রয়াত জয়দেব বসুর কবিতার নমুনায়। সরকারি জয়দেব তখন লিখছেন, 'গঞ্জের নাম শ্রেণীসংগ্রাম, মেয়েটির নাম কু'। সিপিএম দলকে গোটা বই উৎসর্গ করে পার্টির উপমান হিসাবে 'ঈশ্বর' শব্দের শরণাপন্ন হচ্ছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সরকারি পার্টি আর ঈশ্বরের পরমতা মিলে যাওয়া এই গণ্ডযোগে কেউই আর অপাঙ্‌ক্তেয় থাকে না। বিকল্প বিপ্লব তখন নাশকতার কবিতা আর গৃহীসন্ন্যাসীর মতো প্রসন্ন অরাজনৈতিক বেলাইনগামীকে ভেদজ্ঞান ভুলে আত্মস্থ করে। এই পার্মিসিভ প্রাঙ্গণেই ভেটকি ক্রমে দৃশ্যমান হতে-হতে অনিবার্য হয়ে উঠছিল।



লেখকের আঁকা

এখানে একটা ব্যক্তিগত নোট দেওয়া দরকার। এ-লেখায় এইসব পড়ে যদি ভেটকিকে প্রেসিডেন্সিসর্বস্ব বলে মনে হয়, সেটা লেখকের স্বনির্বাচিত সীমানা (সীমাবদ্ধতা)-র ফল। ভেটকি প্রেসিডেন্সিচর, তবে সে-দেওয়ালের বাইরে যে তার বিলাসবিভূতি যথেষ্ট, হয়তো তিরানব্বই শতাংশ ভেটকিই প্রেসিডেন্সি বহির্ভূত এক বাস্তবতা — সে বিষয়ে মদীয় সচেতনতা পর্যাপ্ত। কবিতা, শখের বিপ্লব আর মদ — এই তিনমুণ্ডি আসনেই ভেটকির অধিষ্ঠান। প্রেসিডেন্সিতে তার যেটুকু লীলাবিলাস, মোটের উপর সেটুকুই এই লেখার বিষয়।

যেকোনো কবিতাপাঠে ভেটকির হাজির থাকাটা প্রায় অলঙ্ঘ্য নিয়তিবিশেষ। সে কখনো কবিতা পড়ার জন্য ডাক পেত বলে শুনিনি। বরং কবিতাঘনত্বের সঙ্গে তার সমানুপাতিক ছটফটানি সামলানোর জন্য আলাদা লোক লাগাতে হত। কবিতাপাঠের আসরের পোড়-খাওয়া লোকেরা জানতেন, কোন কবি উঠলে ভেটকি কী ফুকরে উঠবে। মৃদুল দাশগুপ্ত উঠে 'জলপাইকাঠ' আর *বিবাহপ্রস্তাব* শেষ করতে না করতে ভেটকি হয়তো বলে উঠল — রান্নাঘর, রান্নাঘর। তারাপদ রায় যতক্ষণ না *দারিদ্র্যরেখা* পড়বেন, ভেটকির মুখ দুশ্চিন্তায় থমথমে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় উঠলে তো আর রক্ষে নেই। প্রতি পাঁচটা আসরের একটায় শক্তি ওঠার পর, ভেটকির বিতাড়িত হওয়াই ছিল দস্তুর। কবিয়ালদের প্যালা দেওয়া যেত, কবিদের দেওয়ার রেওয়াজ নেই। থাকলে ভেটকি অন্তত দিত। মৃদুলের *রান্নাঘর*, তারাপদর *দারিদ্র্যরেখা* বা শক্তির *আনন্দ ভৈরবী* জাতীয় কবিতা নিয়ে যে চান্স পেলেই বাণী দেয়, তাকে কবিতার হুজুগে পাবলিক ছাড়া কিছু মনে হয় না। কিন্তু ভেটকিকে কোনো আদিখ্যেতাতেই আলাদা করে হুজুগে বলা সম্ভব ছিল না। কবিতাহুজুগ তার ডিফল্ট মোড। কবিতা বিশেষ পড়িনি বলে ভেটকির বুকনি আমি মন দিয়ে ফলো করতাম। তাকে মনে হত কবিতার পেজমার্ক; নতুন কোনো কবিকে সে তাঁর কোন-কোন কবিতা শুনে পিঠ চাপড়াচ্ছে, সেটা নোট করে নিলে, তার শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন করা সহজ হয়ে যেতে পারত। ঝেড়ে না কাশলেও আমার মতো অনেকেই ছিল, যাদের কাছে '*রান্নাঘর* মৃদুলের', এটাও একটা জরুরি ইনফরমেশন।

এই অবধি শুনে মনে হতে পারে যে, 'ভেটকি আসলে স্বরূপত কবিতার একটি জ্যান্ত কষ্টিপাথর, কিন্তু আ-হা-হা-হা ওকে কেউ চিনল না'-র দিকে চলে যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয় — সমঝদার, জহুরি আর জাতখ্যাপার মধ্যে অনেক তফাত। মোটের উপর ভেটকি ছিল শেষেরটাই — জাতখ্যাপা। কালচারাল ডোমেইনে এ-জাতীয় খ্যাপাগোত্রের বর্ণময় চরিত্রদের আগে সবচেয়ে বেশি দেখা যেত যাত্রাপালার ভিড়ে। ফুলশয্যায় বউকে ফেলে যাত্রা শুনতে চলে যাওয়াটা আদৌ কোনো কষ্টকল্পনা নয়। *কোমল গান্ধার*-এ বিজন ভট্টাচার্যের গগনকে মনে করলেই ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। দেশে যাত্রার মোশন মাস্টার, উদ্বাস্তু হওয়ার পরেও পালাগান শুনলেই লড়াই-এর মেড়ার মতো চনমনিয়ে ওঠা। এই ধাতটাই ছিল কলেজস্ট্রিটের ভেটকির মধ্যে। তবে গগনের সঙ্গে ভেটকির একটা তফাত আছে এবং সেই তফাতটা বুঝলে ভেটকিগোত্রের আসলিয়ত হয়তো অনেকটা বোঝা যাবে। নিজের নেশার বিষয় যাত্রার সঙ্গে গগনের কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ আছে, গগন তার নেশার বিষয় যাত্রা বা নাটকের পার্টিসিপেন্ট, অভিনয় করে, নাটক লেখে। ভেটকি কিন্তু কবিতা লেখে বলে ভেটকি নয়। কবিতালিখনকলায় কোনো পার্টিসিপেশন ছাড়াই সে কবিতার সঙ্গে লেগে থাকে। ভেটকিও ঠিক নেশা-করা লোক নয়, সে নেশা-লাগা লোক। নেশাটা কীসের? কবিতার? কবিসঙ্গের? কবিতা ও কবিসঙ্গে মদের? নাকি এসবেই লীন হয়ে থাকা কোনো দুর্বোধ্য জাড্যই নেশাগ্রস্ত করে রাখত ভেটকিকে?

মমার্ত। শব্দটাকে বইমেলার মাঠে নামানোর দুর্বুদ্ধি কার মাথায় প্রথম এসেছিল কে জানে! প্রতিভাবান ও প্রমত্তবর্গের ধারাবাহিক অবদান তিলে-তিলে গড়ে তুলেছে প্যারিসের উত্তরে এই শহরতলি। উনিশ শতক থেকেই বঙ্কিমকে বাঙালির স্কট, রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির শেলি ইত্যাদি-ইত্যাদি করার চল। কলকাতার লন্ডনায়নের এই দাস্যভাবের ধারাতেই মমার্তকে বইমেলায় বেড়ার মধ্যে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে সচরাচর কিছু স্বভাবচাকর কবি-শিল্পী ছাড়া কেউ প্রতিভার পেখম মেলতে যায়নি। স্থানমাহাত্ম্য সার আর কার্বাইডে পাকানো যায় না। ফরাসি দ্রোহকালের শতবর্ষের বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রথম কমিউন আবার উন্মত্ত করে তুলল প্যারিসকে। উত্তর শহরতলির টাঁড়জমির মফস্বল মমার্ত

তখনও তুলনায় ঈষৎ নিস্তরঙ্গ। কিছু খেয়ালি চন্দ্রাহত কবি-শিল্পী, ভবঘুরে, নেশাখোর নির্বিঘ্নে ছোঁক-ছোঁক করার পর নিরাপদ বুঝে প্যারিস কমিউনের আগে থেকেই এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল। এই গোত্রের বেগনাবর্গের প্রতি বিপ্লবী মাত্রেরই বাড়তি নেকনজর থাকে। ১৮৭১ সালে বিদ্রোহীরা প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এই মমার্তেই। ন্যাশনাল গার্ডের বন্দুকবাজরা বিদ্রোহীদের দিকে বন্দুক তোলার হুকুম না মেনে বন্দুক ঘুরিয়ে দিল নিজেদের কম্যান্ডারের দিকে। অগ্নিকন্যা লুই মিচেল শেষ-দেখার লড়াই চালিয়েছিল এই মমার্তে দাঁড়িয়েই। এই মমার্ত কেন্দ্র করে যে ঐতিহাসিক আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফল প্যারিস কমিউন; ওই আন্দোলনপ্রসূত ক্ষণস্থায়ী সরকারের মধ্যেই মার্কসসাহেব তাঁর তত্ত্বছায়ার প্রথম কায়া দেখতে পেয়েছিলেন। ফরাসি জাতিসত্তার যা ধরন, তাতে এত বড়ো একটা কাণ্ড কবিতা এবং ছবি বাদ দিয়ে হতে পারে না, হয়ওনি। এই নারী পুরুষের চেয়ে মহত্তর — দ্রোহমিছিলের পুরোভাগে লুই মিচেলকে দেখে মনে হয়েছিল ভিক্তর উগোর। 'লোহিতকুমারী' নামেও পরিচিত ছিলেন এই অগ্নিকন্যা, অনেকটা জয় গোস্বামীয় অর্থে —

> সিদ্ধি, জবাকুসুম সংকাশ
> মাথার পিছনে ফেটে পড়ে

মিচেল নিজে কিন্তু কোনো বিদ্রোহীর বন্দনীয় রূপ দেখেননি। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নীচমহলের হতভাগাদের — বেশ্যা, ভবঘুরে, নেশাতুর, ভাঁড় — অগ্নিগর্ভ প্যারিস কমিউনে অর্থবহ হয়ে ওঠা এতাবৎ অপাঙ্‌ক্তেয় নতুন 'হিরো'-রা ভিড় করছিল লুই মিচেলের কবিতায় —

> খানাকি এবং দাগিরা আদতে জাত-শয়তান লোক,
> রক্তে এবং পাঁকেই ওদের যাবজ্জীবন হোক —
> বাবুদের দাবি। আমি তো এসেছি জানপহেচান সেরে
> এবার শুধোই মরণদশার আসল কারণ কে রে?

এই ক্ষণদ্রোহকালের পরের সুজলসুফল সময়কে ইতিহাস 'বেল এপোক', অর্থাৎ সুসময় বলে সাব্যস্ত করেছে। 'বেস্ট অব দ্য টাইম' এবং 'ওয়র্স্ট অব দ্য টাইম', বিষণ্ণ শীত আর সাধ-জাগানো বসন্ত তখন মমার্তে মুখোমুখি, এই দ্রোহকালের পর শুধু প্যারিসে নয়, ইউরোপের অনেকখানি জুড়ে আসতে চলেছে বেল এপোক, সমৃদ্ধিপর্ব। অপবর্গের অভিশপ্ত বিদঘুটেরা এই বিদ্রোহের গানে তুমুল বেসুরে গলা মিলিয়েছিল। আর এই বেসুরেই পাকাপাকিভাবে সুর বাঁধা হয়ে গেল মমার্তে আসন্ন নন্দনপর্বের। অগুস্ত রেঁনোয়া ইত্যাদির সাধনায় ইম্প্রেশনিস্ট ক্যানভাসে স্বর্গীয় আলো জ্বলল বটে, কিন্তু তাতে বিভাসিত হতে থাকল নরকের কীটেরা। মমার্তের কেলোবিল্লি (Le Chat Noir) শুঁড়িখানায় জমিয়ে বসল শিল্প-সাহিত্যের আসর। প্রতিদিন স্পর্ধিত প্রতিভাবান কুলমার্তগুরা নবিসুলভ প্রত্যয়ে আস্তিন থেকে ছুড়ে দিতে থাকলেন নতুন-নতুন ম্যানিফেস্টোর প্রত্যাদেশ। ক্যানভাসের ঐতিহ্যবিলাশ থেকে সরে এসে তুলুজ লোত্রেক ক্যাওরামিঠাসা এমন পোস্টার নামালেন যে নন্দনদুনিয়ার বাপজ্যাঠাদের পিলে চমকে গেল! মুলা রুজ-এ অধিষ্ঠিত লোত্রেক পোস্টারের নাড়ির ধাত বুঝে বর্ণময় বেগানাদের ফ্রেমবন্দি করতে শুরু করলেন। এই বেগানাবর্গের মধ্যে সস্তা কাফেনাচুনি এবং ভাঁড় — এই দুই শ্রেণির প্রাধান্য ধীরে-ধীরে নিরঙ্কুশ হয়ে উঠল। তুমুল জনপ্রিয়তা পেল মমার্তের ভাঁড়, এই চরিত্র বা 'টাইপ'-টি অচিরেই পৌঁছে গেল শিল্পীদের কামনার মোক্ষধামে। বোদলেয়ার পেঁকো ফুল ফোটানোর জমি তৈরি করেই রেখেছিলেন, শুরু হল অকৃপণ বীজবর্ষণ। কলকাতা বইমেলার মমার্তে যদি একঘণ্টার জন্য মমার্ত-কল্পবৃন্দাবনের প্রেতচ্ছায়াও নামিয়ে আনা হয়, তাহলে প্রকৃত সারসেরা ইতর মানুষদের হঠিয়ে ফ্যাতাড়ুদের চ্যালেঞ্জ-ছোড়া সমাবেশ ঘটিয়ে ফেলবে।

নবারুণের কল্পনাজঠরে ফ্যাতাড়ু-চোক্তারদের মাইটোসিস-মিয়োসিস কবেথেকেকীভাবেকেন চলেছিল, তা হয়তো ভাষার বাঁধনের সঙ্গে প্রাণবাঁধা লোকেরাই বলতে পারবেন। কিন্তু আজ উত্তর থেকে পূর্বগামী গণিতসন্ধিৎসায় আমরা অনেকেই বুঝতে পারি, ভেটকির সঙ্গে ওই ফ্যাতাড়ুপ্রজন্মের একটা কুলুজির সংযোগ আছেই। সত্তরপরবর্তী হত ও ঘাতক প্রীতিনিষ্ণাত সংস্কৃতিথানগুলির মধ্যে কলেজস্ট্রিট অবশ্যই অন্যতম। মৃত্যুউপত্যকার নাগরিকত্ব নিয়ে উদ্বেল হৃতডিফেন্স নবারুণকে সম্ভবত এইখানেই ফ্যাতাড়ুরা প্রথম টার্গেট করেছিল। এই কলেজস্ট্রিট একেবারে ঘোর আক্ষরিকভাবেই ভেটকির বাপের সম্পত্তি, শৈশবের মাতৃক্রোড়, যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী। ব্যাধিজনিত বিকারে তার মুখেশরীরে যে আদল এসেছিল, তা আদতে এক ঈশ্বরিক আন্ডারলাইন এবং ঈশ্বরের অনুদানসমূহ বিজ্ঞপ্তি ছাড়া অগোচরেই এসে থাকে। সিদ্ধার্থকে কোনো নির্বিকার বুদ্ধত্বের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি, তার উপর ভেটকি হওয়ার নিদান আরোপ হয়েছিল কোনো অনুমোদন ছাড়াই। বিধাতা অতঃপর তাঁর অভিশাপ ও আশীর্বাদের জাবদাখাতায় ভেটকির অ্যাকাউন্ট তামাদি করে দিয়েছিলেন — ভেটকি চিরতরে ভেটকি হল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সে একজন চিরস্থায়ী বহিরাগত। সূর্যাস্ত আইনের মতো অমোঘ গতায়াতে রোলকলোত্তর নিয়মমানা হাজিরা ছিল তার। বিদগ্ধজনস্থানমধ্যবর্তী ওই শিরোমণি প্রতিষ্ঠান তখন বা তখনও সত্যিই এক

প্রস্রবণগিরি — এখানে এলেম মাপা হত মার্কশিটের বাইরের অষ্টসিদ্ধি দিয়ে। সেই অষ্টসিদ্ধির অন্যতম তখন লিটল ম্যাগাজিন এবং সত্তর দশকের শববিলাশের খোয়ারি তখন পঞ্চমুণ্ডির অন্যতম। লিটল ম্যাগাজিন বহ্নিপীড়িত পক্ষী ও পতঙ্গদের মধ্যে সুচারুসুলিখিততে সন্তুষ্ট কিছু মার্জিননিরাপত্তামধ্যবর্তী সম্পাদক তদ্দিনে অবতীর্ণ হয়েছেন বটে, তবে নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় উপেক্ষায় তাঁরা সংখ্যালঘুত্বের তফসিল মেনে চলেন এবং কিছু খুচরো সুবিধে পান। অনিয়ন্ত্রিত ফ্র্যাক্ট্যাল সাধকেরা তখন দাপাদাপি করছেন সগৌরবে। কিছু বাঘ কাগজের হলেও বন্যসুন্দর মাংসাশীরাও অপর্যাপ্ত নন। এককেটি সংখ্যার এককেটি সূচিপত্রকেই এককেটি ম্যানিফেস্টো করে তোলার অভিপ্রায় তখন আদৌ অতিরঞ্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়। ললাটে অনেকেই যুগান্তরের চাবিকাঠি লটকে ছাপার মাঠে নেমেছেন। প্রবীর-বিপ্লবকে *বোধশব্দ*-পাঠকবর্গ জানেন। তেমন আস্ত সংখ্যার প্রত্যক্ষতায় না জানলেও অচ্যুত-ব্রাত্য-তন্ময়দের নিজ-নিজ সাধ্যমোতাবেক শতাংশে জানেন। সেইসব নেকড়েরা তখন সোনার হরিণকে যে যার মতো তাক করছেন, মারীচ-সীতা-রাবণ মায় জটায়ু... সব ভূমিকাতেই তারা স্বচ্ছন্দ, কারণ সব ভূমিকাই বদলায়।

অচ্যুত তখন দু-হাতে দু-টি অথেন্টিক মহাকাব্য লিখছেন — *চারু মজুমদারের চশমা* ও *অবরুদ্ধ অভিমন্যু* — এবং খাতায় নম্বরও কম পাচ্ছেন না। মহাকাব্যের দুরূহ সাধনা এবং নম্বরের সহজ সমীকরণ — তখন অচ্যুতের যুক্তিমতে কোয়ান্টাম সত্য। স্ববিরোধী, কিন্তু যুগপৎ সঠিক। তখনও কলকাতায় পাতালের টিকিট চালু হয়নি। আর পাতালই বা কতটুকু, বেলগাছিয়া থেকে দমদম, আবার এসপ্ল্যানেড থেকে ময়দান — এই দু-ফালি মাত্র। কল্পনার মিথ্যাচারেও তখন ভাবা কঠিন যে কাউকে মহাত্মা গান্ধি রোডে পুঁতলে সে সূর্য সেন-এ বেরোবে। তখন পাতালে যত না পথ, পথে আন্ডারগ্রাউন্ড অনেক বেশি। অনেকখানি আন্ডারগ্রাউন্ড জমে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন্দ্র করে টানা দু-মাইল ব্যাসের বৃত্তক্ষেত্রে। সেটা আবার বেয়াড়ারকমের নিরাপদ, কারণ তখন আন্ডারগ্রাউন্ড একেবারেই 'বনে নয় মনে মোর'-গোছের ভার্চুয়ালতায়। বাস্তবে থাকাটা তাত্ত্বিকভাবেই কঠিন। পশ্চিমবঙ্গে তখন চৌতিরিশ বছরের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে এক যুগ, অর্থাৎ বছর বারো মাত্র কেটেছে। রাষ্ট্র নিজেই রাষ্ট্রবিরোধিতার সমর্থক, আবার বামোত্তর বাম হলে সেটাও রাষ্ট্রবিরোধিতা। ভয়ঙ্কর কোয়ান্টিটেটিভ ব্যাপার! 'চারটি নদীর গল্প শোনো' বলে একটা গান গাওয়া হত প্রেসিডেন্সির পোর্টিকোয়, নদী চারটে হল চিনের ইয়াংসি, ভারতের গঙ্গা, মিসিসিপি, ভিয়েতনামের মেকং। এই গান গাইলে বাম বিধি আর কতটুকুই বা বাম হতে পারে! প্রায় কোনো চান্স নেই রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে ওঠার! ডি এল রায়ের নন্দলাল ছাড়া সেই আন্ডারগ্রাউন্ডবিলাসবিবর্ত বুঝিয়ে বলা কঠিন —

> নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ —
> স্বদেশের তরে, যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
> সকলে বলিল, 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল?'
> নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
> আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
> তখন সকলে বলিল — 'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!'

কল্পনার হিস্টিরিয়া। এই বাকতাল্লার জগৎ ছাড়া ভেটকি পানিবিহনে মীনের মতোই হত।

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা — / এমন কেন সত্যি হয় না, আহা। মমার্তে দ্রোহকালের পর বেল এপোক-এর প্রশান্তি এসেছিল, কিন্তু সে প্রশান্তিও ছিল জন্মজঠরের চরিত্র অনুযায়ী ঈষৎ বিকৃত, ওই আঁরি দ্য তুলুজ লোত্রেকের মতোই। তখন আর লুই মিচেলের বেয়নেট দরকার ছিল না, ইতালি ও ফরাসি নাগরলোককথার পিয়েরো আর হার্লেকুইন — এই দুই নারকীয় সুন্দর ভাঁড় — এই দুই ক্লাউনকে দরকার হল কার্নিভাল সাজানোর জন্য। ওই সুসময়ে, বেল এপোক-এ, সাদা এবং কালো জোকার পরস্পরের চেয়ার কেড়ে নিয়ে পরস্পরকে পর্যায়ক্রমে ভূপতিত করছে। চ্যাপলিনের ট্র্যাম্প মহাআগমনের জন্য তখনও আরও কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হবে। ক্লাউন যে বিমূর্ত উপনিবেশ তৈরি করতে পারে, তার অঙ্কুর ওই মমার্তে গজিয়ে গিয়েছিল। সেটা কিন্তু ইতালিতে আর দু-শতক আগে কমেডিয়া দে লা আর্ত-এর মুখোশনাট্যে হয়নি। ক্লাউনের সঙ্গে তখন লুই মিচেল বা তুলুজ লোত্রেকেরা ছিল না। ওই সমাবেশ দরকার ছিল ভাঁড়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রবল স্বাস্থ্যবান পিকাসো আর বিকলাঙ্গ লোত্রেক — দু-জনেই পরমজ্ঞানীকে খুঁজে পেতে চাইছেন বেগানা বিদূষকের মধ্যে। পিয়েরো আর হার্লেকুইন তখন সাম্রাজ্য বিস্তার করছে নন্দনপুরোহিতবর্গের ক্যানভাসজমিনে। পয়েন্টালিজমের জনক সিউরাট এক অ্যাক্রোব্যাট-জোকারকে চাপিয়ে দিচ্ছেন ধাবমান ঘোড়ার পিঠে, তার জঙ্গমতা আর কোনো গতিসূত্রেরই গাণিতিক-নিয়তি মানছে না। উত্তরনকশালহাংরিকালের কবিতাকলেজস্ট্রিটে এই অদ্ভুতরসটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ভেটকি ছিল সেই বিসদৃশ মান্যবর, অনেকটা বেমানান স্বাভাবিকতার ভুতুড়ে প্রত্যাদেশের মতো। তাকে ভীষণ দরকার ছিল, তাকে বাদ দেওয়া যেত না।

সব মানুষের সঙ্গেই একটা চালচিত্র থাকে — কেউ সেটা পিঠে নিয়ে, কেউ ঘাড়ে করে, কেউ আবার আস্তিনে বা বুকপকেটে বা আঁচলখুঁটে লুকিয়ে রেখে লোকসমাজে নামে। সামাজিক মাত্রেরই আত্মপরিচয়ের সংকট থাকে কিছু না কিছু মাত্রায়। কিন্তু ভেটকির ক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ের সংকট আছে, অন্তত মনে হত, ওই চালচিত্রটার। চালচিত্রটাকে ভেটকির সঙ্গে তাল রেখে তার পিছনে-পিছনে দৌড়োতে হত। আমি বহুবার দেখেছি ভেটকির চালচিত্র আর ছায়া ভিড়ে আটকে গেছে, ভেটকি লাপরোয়া এগিয়ে চলেছে। চালচিত্র ও ছায়াবিহীন ভেটকি খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর সিগনাল-খোলা হিক্কায় হড়কানো গাড়ির মতো আবার চালচিত্র ও ছায়া ভেটকিকে ধরে ফেলেছে এবং ভেটকিত্বে যথাযথভাবে লটকেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ওই আবেষ্টনের মধ্যে যেখানে বিপ্লব বা কবিতা নিয়ে দুই-এর অধিক মানুষ কথা কইত, ভেটকিছায়া এবং ভেটকিচালচিত্র আর ভেটকি — এই তিনের মধ্যে কেউ না কেউ, সেখানে উপস্থিত হয়ে যেত অনির্বচনীয় ১৪৪ ধারার মতো। মামলা অপরাধী বাদী-বিবাদী বিচারক নেই, কিন্তু সাক্ষী আছে। সাক্ষ্যদান নেই, শুধু প্রমাণিত হয় সে স্বয়ং আছে বেশ প্রবলভাবেই। ভেটকি না থাকলে কবিতার বা বিপ্লবের বা প্রেসিডেন্সি কলেজের কিচ্ছু এসে-যেত কিনা, সেটা স্মৃতি এবং এই *বোধশব্দ* জুড়ে অধিকারীরা খুঁজবে, কিন্তু ওগুলো না থাকলে ভেটকি থাকত না। ভেটকি না থাকলে আদৌ কিছু এসে-যেত কিনা সেটা এতকাল প্রশ্ন ছিল বটে, কিন্তু বোধহয় *বোধশব্দ* প্রশ্নটাকে পাকাপাকিভাবে অ্যানাইহিলেট করে দিল। যদি আর সব মোটিভ বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মানতে সকলেই বাধ্য হবে, সে অন্তত নিজের থাকাটা প্রমাণ করে দিয়েছে মূলত কবিতাকে কাজে লাগিয়ে। কবিতাকে এত ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে খুব কম লোক, মনীষী বা চালিয়াত বা চালিয়াত মনীষী — সে যা-ই হোক। বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর মমার্তে ক্লাউনপুঙ্গব পিয়েরো এভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। সে কোনো কাজে লাগেনি। কাজে না-লাগা মানে, তার ইউটিলিটি ছিল না। ওইটাই ছিল কোয়ালিফিকেশন। বিন্দুমাত্র ইউটিলিটি থাকলেই সে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেত, আর না-হলে কৃতী হয়ে যেত। এই মূল্যবান অকিঞ্চিৎকরতার এমন প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল যে, কোনো কবিতাডিক্টেটর, যথা অচ্যুত মণ্ডল পর্যন্ত, ভেটকিকে কখনো বলতে চায়নি — বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা। মলয় রায়চৌধুরীর একটা আওয়াজে ভেটকি দর্শনের একটা লেন্স পাওয়া যেতে পারে —

> আমি তো দিব্বি আছি। ওনারা অভিকর্ষহীন
> বকলসে বাঁধা নানা রঙে সস্তা গুজবে ঠাসা দামি মণীষিরা
> এঁটুলি-পেশায় উন্নীত। আমি তো দুমুখো পথ
> কলেজ স্ট্রিট নামে লোকে চেনে। জানেনেই
> কণ্ঠস্বর দিয়ে চিন্তা করি।

কেবল ওই কণ্ঠস্বর দিয়ে চিন্তার ক্রিয়াটা পালটে একটা নতুন আক্ষরিকতা বের করে আনলে ভেটকিকে একঝলক পাওয়া যেতে পারে। সে নিজেই চিন্তার বিষয় করে তুলেছিল নিজের আত্মা, সর্বাঙ্গ, আচরণ ইত্যাদি অস্তিত্বের বিভূতি ব্যবহার করে। ঘটনাচক্রে সে যদি কলেজস্ট্রিটে না জন্মিয়ে হাঁটা-পথের দূরত্বে অন্তত যেকোনো অভিমুখে জন্মাত, তাহলে সে হেঁটে প্রেসিডেন্সি-কফি হাউসের কলকাতায় এসে জুটত বলেই আমার ধারণা। তার বেশি দূরত্বে হলে নয়, জুতোর ফিতে বাঁধার পর সে বাসে উঠে কোথাও আসত বলে মনে হয় না। মেট্রোরেলেও চড়ত না। মেট্রোরেলে ভেটকি — উননব্বই থেকে বিরানব্বই সালে এ-বাস্তবতা জাদুতেও সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে সে অন্য কোথাও ঠেক খুঁজে নিত। তাহলে সে ভেটকি হত কিনা, সেটা অবশ্য অনিশ্চিত।

একটা কবিতা বার-বার ঘাই মারছে। গোটাটাই থাক।

নাম তার জানি নাকো;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক,
— যুগে-যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

সব জনতার মাঝে বুঝি মিশে থাকে,
ছিলো চিরকাল;
তবু তারে কারো মনে নাই।
অমরত্ব-লোভী কোনো ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ
সেও বয়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গিজে না মেদুমে;
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

শ্রাবস্তীর জেতবনে
সুগতের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোনোদিন দূর হতে করেছে প্রণাম,
হয়েছে সিঞ্চিত
প্রসন্ন সে-নয়নের করুণা-কিরণে।

গ্যালিলির হ্রদের কিনারে
শুনেছ সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল;
তারপর সেও বুঝি মানব-পুত্রেরে
বিকায়ে দিয়েছে শুধু এক মুষ্টি স্বর্ণ-বিনিময়ে
আঁধারের পূজারীর কাছে।

বাস্তিলের চূর্ণ ভিত্তিমূলে
তারও বুঝি আছে পদাঘাত,
তারও ক্ষমাহীন ঘৃণা
গিলোটিন করেছে শাণিত,
তারপর সীমাহীন স্টেপির তুষারে
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সূর্যাস্ত-সংকেত
এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয়-শোণিতে।

ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।

হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের।
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের
দিগ্বিদিক ঢেকে-দেওয়া শকুন-ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হয়ে;
ক্ষীণ তার পদশব্দ
জীবনের সমস্ত কল্লোলে
তবু মিশে থাকে।

তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হয়ে গেল যেন পথের কিনারে।
নগর উৎসবে মত্ত;
কল্লোলিত জনতার স্রোত
পথ দিয়ে বহে দুরন্ত উল্লাসে;
নিশান উড়িয়ে ঊর্ধ্বে
শঙ্কাহীন স্বপনের মতো।
এরই মাঝে জানি না কখন
দাঁড়ায়েছে এসে পাশে।
ম্লান কণ্ঠে শুধায়েছে
ঠিকানা কোন সে বুঝি অখ্যাত গলির;
— সেথায় সে যেতে চায়, জানে নাকো পথ।
হেলাভরে দিইনি উত্তর
কিছুক্ষণ পরে দেখি সে গিয়েছে মিশে জনতায়।
ফিরেছি উৎসব হতে উদ্দীপ্ত হৃদয়ে
তবু যেন থেকে থেকে কী এক বিষাদ
ছুঁয়ে যায় মন;
ভোলা যেন যায় নাকো নাম এক অচেনা গলির
আজো যার পাইনি ঠিকানা।

অনেক কবিসমাবেশেই ভেটকির স্থিতি ছিল। লয়ের পরেও সে কিন্তু এই সমাবেশ ঘটিয়ে ফেলল। ওস্তাদের মার। রাত কত হল? উত্তর?

facebooক

Sudip Manna shared your photo
October 21 at 1:35am ·

আমার ব্লগ seriouslyjokesapart.com এ সিদ্ধার্থদাকে নিয়ে লিখেছি, "কলেজ স্ট্রিটে বাংলা কবিতার এক ফেরিওয়ালা"। বন্ধুরা যদি পড়েন...

Arnab Bhattacharya · Friends with সাম্যব্রত জোয়ারদার
Vetki ekjon Mahapurush. 3546 bochor agey jonmechilen. Ekhon abar tar punorjonmo hobe. Believe me please.
October 19 at 3:24pm · Unlike · 2

Priyadarsee Chakraborty 'ভেটকি'...নামটা যেন আমাদের ছাত্রযৌবনের ভেসে ওঠা সময়ের বুদবুদ। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটের ধুলোর অণু-পরমাণুতে মিশে, কফি হাউসের রাত্রিদিনের অনাবশ্যক ব্যস্ততায়, বিখ্যাত কবির গ্রন্থপ্রকাশে বা অনামীর স্মরণসভায়, কলেজস্ট্রিট সংলগ্ন স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে টিফিন প্যাকেট হাতে—সব মিলিয়ে আমাদের সময় রোমন্থনের কান্ডারি...
ধন্যবাদ আপনাদের। খুব ভালো উদ্যোগ।
October 19 at 5:09pm · Unlike · 2

অন্যরকম ভুজুং

বোধিসত্ত্ব কর

ঠিক সেইরকম একটা সময়ে ভেটকির সঙ্গে আমাদের ভাব হল যখনও 'প্রেসিডেন্সী কলেজ'-এর চারপাশে দ্বীপান্তরের গরাদ বসে যায়নি। হ্যাঁ, লোকে দীর্ঘ-ঈ দিয়ে 'প্রেসিডেন্সী' লিখছে তখনও। মেন বিল্ডিং-এর সিঁড়ির আর্চগুলো, একতলার বেসিনগুলো তখনও অক্ষত। লিফট বসেনি। অগোছালো কোয়াড্রাঙ্গলে সৌন্দর্যায়নের মতো বেখাপ্পা শব্দও ভেবে উঠতে পারেনি কেউ। গ্রিল ও রেলিং-শিল্পের স্বর্ণযুগ আসতে দেরি আছে। বোকা মার্বেলে কলেজ মুড়ে দেওয়ার সাহস ও অবসর কর্তৃপক্ষের তখনও ছিল না। হেয়ার স্কুলের সঙ্গে আড়াআড়ির দেয়াল বসেনি। এদিকের গেট, ওদিকের গেট, সেদিকের গেট, সবগুলোই সর্বসময় খোলা। শহরের এপাশ-ওপাশ থেকে আরবিট লোকজন নিয়তই আসছে-যাচ্ছে। কেউ লেখা শোনাতে, কেউ কুকুর খাওয়াতে, কেউ হিসু করতে, কেউ নেশা করতে, কেউ রাজনীতি। প্রেমিক, চানাচুরওলা, ট্রটস্কিপন্থী, গেঁজেল, কবি, তাসুড়ে, গিটারিস্ট... সকলেরই নিজ-নিজ পঞ্চায়েত আছে। কেউ রোজ আসে। কেউ শুধু ছুটির দিন। কেউ ন-মাসে ছ-মাসে। কারো পয়সা ফুরিয়ে গেলে। কারো পয়সা বেশি হলে। মোবাইল নেই। স্বর্গ নেই। এমনকী, স্যারিডনও নেই।

উন্নয়নের আগের পশ্চিমবঙ্গ তো, তাই নেই-এর মাত্রাটা কিছু বেশি। যাদের বুকনি বিনে চালচুলো নেই, উদ্যম নেই, কাজকম্মো কিচ্ছু নেই, শহরের ঠিক একেবারে মধ্যিখানে তাদের জন্য পা-ছড়িয়ে বসে রাত্রিদিন কলেজটা হ্যা-হ্যা করছে। তা, নেই-নেই করেও এই আশ্চর্য অপচয়ের বাজারে আমরা যারা লেখাপড়ার নাম করে এলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর তিন-তিনটে বচ্ছর স্রেফ গেঁজিয়ে পার করে দিলাম, আমাদের কিছু লোকশিক্ষে হল। নানান কিসিমের লোক, তাদের আজব সব জীবন, হরেকধরনের কিসসা, আর একে-অন্যকে-টেক্কা-দেওয়া হাজার ইডিওসিনক্রেসি। প্রেসিডেন্সির এই বিচিত্র জনজীবনের হদিশ তার কোনো সরকারি ইতিহাসে মেলা দুষ্কর। আজকালকার ভাষায় এরা সব লট-কে-লট বহিরাগত, নয়ের দশকের মাঝামাঝিও কলেজস্ট্রিটে যে-শব্দের কল্পনা ছিল না। ভেতর-বাইরের হিসেব তখনও স্পষ্ট হয়নি বলেই বোধহয় ইডিওসিনক্রেসি নিয়ে অত আহা-বাহাও ছিল না, বা কে কোথাকার লাট, সেই নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীসুলভ কৌতূহল। এতে সুবিধে হয়েছিল এই যে ভেটকিকে আলাদা করে 'আমি তোমাদেরই লোক' বলে পরীক্ষা দিতে হয়নি। খাতায় নাম লেখানো আছে বলে এই কলেজে আমাদের বেশি অধিকার, আর ভেটকির কম — ঈশ্বরের অপার করুণাবশত এরকম সরল ভেদবুদ্ধির থেকে আরেকটু আগ্রহজনক ও পাপী ছিল তখন পৃথিবীটা। অনেক খ্যাপা আসে, ও-ও আরেক খ্যাপা। এসব খ্যাপা-খেপি, সেফটিপিন, ইলিশের আঁশ, পারিজাতকানন, মাছি ও প্রবীর দাশগুপ্ত নিয়েই মিলেমিশে থাকতে হবে বাপু, দাদা-দিদিরা শিখিয়েছিলেন, একটু জায়গা করে নাও। পুরোনো বাংলায়, অর্থাৎ ভাষার উপর নবারুণদা দাঁত বসানোর আগে, এইসব খ্যাপাদের বলা হত 'ক্যারেক্টার'। আজকাল অবশ্য সল্টলেকেও শুনি 'ফ্যাতাড়ু'।

'ক্যারেক্টার' কথাটার মধ্যে একটা গল্পের আশা ও আভাস উঁকিঝুঁকি দেয়। সেরকম গল্প ভেটকিকে নিয়ে তো অঢেল। কিছু প্রত্যক্ষ। কিছু পরম্পরাশ্রুত। এদিকে সম্পাদকমশাই আবার চেতাবনি দিয়েছেন সেইসব গল্পের স্রোতে যেন ভেসে না যাই। ভেটকির জীবনচরিতের সূত্রে বরং হালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসটা একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার, ইতিহাস পড়িয়ে খাই বলেই হয়তো আমার উপর তাঁর এই দাবি। দাবি অত্যন্ত সংগত, কিন্তু মুশকিল হল



১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ — *সিটি অব জয়*-এর প্রতিবাদে অনেকের সঙ্গে ভেটকি (*দ্য স্টেটসম্যান*-এ প্রকাশিত)



সিটি অব জয়-এর প্রতিবাদে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে ভেটকি (*আনন্দবাজার পত্রিকা*-এ প্রকাশিত)

ক্যারেক্টারদের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন, ভাশুর-ভাদ্রবউ-এর। স্মৃতির ভিতরে যতই দামাল হোক, ইতিহাসের কাছে কিন্তু ক্যারেক্টাররা ভারী নাজুক, মহাফেজখানার ছায়াও মাড়ায় না। ক্যারেক্টার তো আর 'টাইপ' নয়। তারা না কোনো ভাবের প্রতিমূর্তি, না কোনো বিশেষ ধারার ধারক-বাহক। ওদের উৎপত্তি ও বিকাশ, কারণ ও ফলাফল, অনুষঙ্গ ও পাটিগণিত, কিছুই ভালো বোঝা যায় না। যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে ওদের ভারী বয়েই গেছে। ওরা হচ্ছে ইতিহাসের খোঁচ। ইতিহাসের ভিতর চলছে, ফিরছে, বাঁচছে, নাচছে, কিন্তু সন-তারিখের ব্যাখ্যা-ওয়ালা শিলমোহর বসাতে যাও, অমনি ফক্কা। থাকে শুধু অ্যানেকডোট। টুকরো গল্প।

তো, বুড়োদার দোকানে চা টপকাতে-টপকাতে অ্যানেকডোটালই প্রকৃত পলিটিক্যাল কি না, এবম্বিধ রাজা-উজির মেরে আমরা যখন কাল ট্রামলাইন থেকে আরও সরু অন্ধকারের দিকে হাপিস হওয়ার মতলব কষব, তখনই একসঙ্গে ক্ষয়াটে চটি আর ক্ষয়াটে দাঁত ঘষটাতে-ঘষটাতে আকস্মিক হাজির তো হবেই ভেটকি। এখন, আবার বছর কুড়ি পরে, একদিন ওর ঘাড়ে কলাবাগানে আমাদের বিফ-বিরিয়ানি, আরেকদিন আমাদের ঘাড়ে ওর নিমবাড়ি অভিযান তো চলছে, চলবেই। এসব সময়ের হদিশ কি ইতিহাস পায় না কি? আরে, কলেজস্ট্রিট মার্কেট ভেঙে আখাম্বা 'বর্ণপরিচয়' তুললেই কি আর ভূত তাড়ানো যায় রে! তোদের সযত্নসাধিত ক্লকটাওয়ারের উপর ভেটকির নোংরা হলুদ রুমাল আজও বিবর্ণ লালপতাকা। সুতরাং, ওসব আহা-কী-হারাইলাম বলে দুঃখু করার কিছু নেই, নিজেকে বোঝাই। 'ইটস অল স্পিরিট, ওয়ান ওয়ে অর অ্যানাদার'।

হিন্দু স্কুলের বখা ছেলে বলে আমার অবশ্য ভেটকির সঙ্গে আলাপ কলেজে ঢোকার কয়েক বছর আগেই হয়েছিল, কফি হাউসের একতলায়, স্বপনদার সিগারেটের দোকানে। 'মদ খাস?', প্রথম আলাপে সেটাই জিজ্ঞাস্য ছিল ভেটকির। 'না' বলায় বলেছিল, 'ঠিক আছে, একদিন খালাসিটোলা নিয়ে যাব'। মজা লেগেছিল, 'হ্যাঁ, খাই' বললে কী বলত তাহলে, এই ভেবে। তার পরও পথচলতি দেখা-সাক্ষাৎ, টুকরো-টাকরা কথাবার্তা হয়েছে, সিগারেট দেওয়া-নেওয়া, শক্তি বড়ো না জয় বড়ো, এমন উত্তম-সৌমিত্র-গোছের কথোপকথনও হয়েছে দু-একবার স্কুলজীবনে, মনে পড়ে। যেটা মনে পড়ে না, খুব একটা এক্সোটিক বলে কখনো ভেবেছি ভেটকিকে। মধ্য ও উত্তর কলকাতার শরিকি-চৌবাচ্চা-শাসিত পাড়ায় এমন ক্যারেক্টারের সম্ভাবনা তখনও পুরোপুরি ধাঁ হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, নিশ্চয় তারা সকলেই *নিম অন্নপূর্ণা* বিষয়ে দু-চার কথার অধিকার দাবি করত না, কিন্তু দৈনন্দিনের গলি-গলতা থেকে টুকটাক ড্রিবল করে প্রায়শই তারা রাজপথে কিছুক্ষণ চু-কিতকিত। আজ ভেটকি বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংখ্যা বার করতে হচ্ছে, এটাই চিন্তার। ক্যারেক্টার কি কম পড়িতেছে?

আটষট্টি থেকে হাতছিপ্পু করে কলেজের দেয়ালে খুব ঘটা করে লেখা হয়েছিল, 'In a society that has abolished every kind of adventure, the only adventure that remains is to abolish the society'। ওটা কথার কথা, সবাই জানত। তখনও ওয়াইএমসিএ ক্যান্টিনে পর্দাকেবিন, তখনও গরমের ছুটিতে বন্ধুদের ভাবছলোছলো হাতে-লেখা চিঠি, নরম ডায়েরি খুলে কড়া লেখা প্রকাশ্যে পড়ে শোনানোর রেওয়াজ আছে তখনও, রেডিওর রেফারেন্স তখনও ধরতে পারে পঁয়ষট্টি শতাংশ ছাত্র, রোমাঞ্চের বেলা যায়নি। রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু এথনোগ্রাফি নেই, এখন ভেবে দেখলে সুখ পাই। আর পরমুহূর্তে সেই সুখ বুঝি মিছে নস্ট্যালজিয়া হল ভেবে অহৈতুকী অপরাধবোধে ভুগি। কী যেন ছিল উৎপলবাবুর কবিতাটা? 'খৃশচানীকে ভালোবেসে অত্যধিক হয়েছি খৃশচান... / হিব্রু পাঠমালা বলে : পান করো দুধটুকু, দুধের সন্তান'...

ফলে সিঁড়ি প্রায় নেই, এরকম ক্যান্টিনের ছাদে দুধের বাছাদের নিয়ে লগবগ করতে-করতে বারবেলায় উঠে পড়ত ভেটকি। সরলা এরেন্দিরারাও জানত ওটা বাংলার ক্লাস, এই যেমন টাল্লি জিনিসটা ঠিক কী, কান্নিক মারা কাকে বলে, গাঁজন ও গাজনের ধ্বনিসাদৃশ্য আপতিক না ঐতিহাসিক, এমত নব্য-অস্ট্রিক শব্দবিচারের। ভাষা যে তরল, এ বিষয়ে ভেটকির একটা স্বাভাবিক, প্রায় শারীরিক, বোধ ছিল। ছাদ থেকে নেমে এলে কবিতার চিৎকৃত ভাঙা কলি ছিটকে-ছিটকে আসত ওর পদবিক্ষেপে, জল যেমন, দুধ যেমন, মদ যেমন উথলে ওঠে অশান্ত পাত্রে। অনেকেরই মনে থাকবে যে নীরেন চক্কোত্তির একটা কবিতা প্রায়ই বলত ভেটকি, 'কাল থেকে ঠিক পালটে যাব / দেখে রাখিস তোরা'। পরের লাইনটা — 'বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল অশ্বমেধের ঘোড়া / পথের মধ্যিখানে' — আর মুখে বলত না, করে দেখাত। 'পারফরমেন্স, পুরোটা পারফরমেন্স' বলে খিস্তি করত আমাদের সিনিয়র সৌম্যদা, আর খিস্তি করতে-করতেই কঠিন সস্নেহ হাতে তখনও-মার্বেল-হয়নি-মেঝের থেকে নড়া ধরে তুলে দাঁড় করাত ভেটকিকে। এই দৃশ্য থেকে ওই কবিতাটা আমার পক্ষে বার করে আনা কঠিন, ওই যে —

ভেবেছিলুম, যেদিকে যাই, জ্বালতে-জ্বালতে যাব
শহর-গঞ্জ কারখানা-কল, কিন্তু এখন প্রাণে
অন্যরকম ভুজুং দিচ্ছে অন্যরকম হাওয়া।...

অন্যরকম ভুজুং-ও তো শুরু হয়ে গেছে ততদিনে। ধারে খেতে লোকের মানে লাগছে। ইন্টারনেট পা রাখেনি, কিন্তু তার উরুসম্ভূত উত্তেজনা উঁকি দিচ্ছে বাতাসে। কফি হাউসই শুনছি শ্যাবি। ইসমাইলের দোকানে ভাতের তো প্রশ্নই ওঠে না। রাত আড়াইটেয় তখনও মেডিক্যালের সামনে শালপাতায় ডিম-পাঁউরুটি খাচ্ছি যদিও, তার মধ্যেই বিক্ষুব্ধ বালকদের জবাব দিতে হচ্ছে, আমরা কলেজ ফেস্টিভালে ফ্যাশন শো করি না কেন। বাংলামাধ্যম ক্যান্টিনে ধীরে-ধীরে অপসৃয়মান। সিগারেটের থেকে নাকি স্বাস্থ্যের মজা বেশি, এমন হেরেসি-ও শুনছি। রাজনীতি শাড়ির আঁচল, খসে না যায়, এই ভয়ে সদাত্রস্ত নবাগতা দক্ষিণী উত্তরের কলেজে জলের-মধ্যে-মাছের-মতন ভেটকিকে দেখে অপার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'এই ডিক্লাসড মানুষটি কে?' অর্থাৎ, নব্যলিবারাল আধুনিকতা এল। *ভূতুমভগবান* না-পড়ে থাকলে আর লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। *ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?* তো জানি।

অতএব ভরকেন্দ্র পালটাবেই। হয় কাউন্টার-কালচারের আতুপুতু, নয় মূলস্রোতের ভ্রূকুঞ্চন : ক্যারেক্টারদেরও সীমান্ত জানা দরকার হয়ে পড়ল। ভেটকিকে বোধহয় তত মিস করি না, লিখতে-লিখতে সন্দেহ হচ্ছে, যত মিস করি আমাদের সেদ্ধচাল জীবনে তার একদা সহজ যাতায়াত। আমাদের কলেজের এক প্রাক্তনী বিধানসভা নির্বাচনে ঝোঁকের মাথায় কোন একটা ছোটো পার্টির প্রার্থী। সবাই আওয়াজ দিচ্ছে, কিন্তু ভেটকির অদম্য উৎসাহ। সাত-সকালে হাজির হয়েছে কাজে লাগতে। প্রার্থীর রাশভারী বাবা, গোটা ব্যাপারটাতেই যিনি অতীব বিরক্ত, ভেটকিকে এক ঝলক দেখে ফোনে বলছেন, 'আর বলবেন না, ছেলে তো ভোটে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এদিকে বাড়িতে সকাল-বিকেল সমাজবিরোধী'। এই সকাল-বিকেল সমাজ আর সমাজবিরোধীর দেয়া-নেয়া ব্যাপারটা মিস করি। প্রগতি-প্রতিক্রিয়ায় জীবন বেঁটে দিতে হয়নি যখনও, যখনও রাজনীতি করলে মূল্যবোধের মুচলেকা দিতে হত না। আমাদের বন্ধু প্রজিৎ বেধড়ক মার খেল গুন্ডাদের হাতে, আমরা যথারীতি ক্লাসঘর থেকে বেঞ্চি-টেঞ্চি তুলে সারাদিন কলেজস্ট্রিট মোড় অবরোধ, অফিসফেরতা ঘেমো মুখগুলো দেখে ঋতদীপ স্লোগানও পালটাল 'ছাত্র-কর্মচারী-পথচারী ঐক্য জিন্দাবাদ' বলে। তার মধ্যেই খবর পেয়ে খালাসিটোলা থেকে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির ভুরভুরে ভেটকি। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসির সঙ্গে তখন উত্তেজিত বাগ্বিনিময় হচ্ছে, আমাদের দাবি — কেন কে জানে — পুলিশ কমিশনারকে আসতে হবে। ওসি বলছেন, ওঁরা মেরে-কেটে জয়েন্ট কমিশনার অবধি উঠতে পারেন। মিনিট-দুয়েক এই বিরস বচসা শুনে পাশ থেকে ভেটকির দাপুটে উত্তর, 'ওসব জয়েন্ট-ফয়েন্ট চলবে না। জয়েন্ট তো আমাদের সাথেই আছে। লালবাজার থেকে জয়েন্ট আনতে যাব কোন দুঃখে।' চারপাশে হাসির হররার মধ্যে সেই অফিসারের বিধ্বস্ত মুখখানা আমার এখনও মনে পড়ে।

কলেজে একটা বড়ো রাজনৈতিক গণ্ডগোল হয়েছে, আর ভেটকি নেই, এমন মনে করতে পারছি না। সিরিয়াস রাজনীতিতে ভেটকি কেন, এ প্রশ্ন প্রেসিডেন্সিতে বাঁ তরফে শুনেছি অনেক। ডান-তরফের যেমন প্রশ্ন ছিল, এই কলেজেই বা আদৌ কেন আসে ও। কিন্তু কার্নিভাল ছাড়া আবার ছাত্র-রাজনীতি কীসের? আর কার্নিভাল মানেই তো 'ফিস্ট অব ফুলস'। ভেটকির বাখতিন পড়ার দরকার হয়নি। বাওয়াল হলেই হল। আমরা কলেজ ছাড়ার অনেক পরে আবার একবার বছর-নির্বিশেষে অনেকে মিলে জড়ো হয়েছি প্রেসিডেন্সিতে, আগের দিন যাদবপুরে ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে একটা দঙ্গল নিয়ে যাওয়া হবে সহমর্মিতার মিছিলে, এরকম পরিকল্পনা। পোস্টার লেখা হচ্ছে, স্লোগান বাঁধা হচ্ছে, ভাড়া করা হয়েছে টেম্পো। উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত ভেটকিও উঠেছে সেই টেম্পোতে। সকলের সঙ্গে স্লোগান দিচ্ছে গলা ফাটিয়ে। কিন্তু পা সোজা থাকছে না। টেম্পোর দুলুনিতে মাঝে-মাঝেই কুমড়ো-গড়াগড়ি। শেষে বিপদ বোধ করে খানিক জোর করেই ওকে নামিয়ে দেওয়া হল শিয়ালদা ফ্লাইওভারের টঙে। এখনও মনে পড়ে, ধাবমান টেম্পোর থেকে দেখছি, একা অভিমন্যুর মতো ভেটকির চতুর্দিকে বিরক্ত-হর্নওলা বাস আর গাড়ি খিঁচিয়ে আসছে হা-রে-রে-রে করে, আর তখনও টলমলে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ও বলছে, 'গড়ে তোলো ব্যারিকেড'। কমিক ছাড়া পলিটিক্যাল তো আমলার।

ভেটকির সঙ্গে শেষ দেখা তারও বছর দুয়েক পরে, আরেক মিছিলে। নন্দীগ্রামের পর চোদ্দই নভেম্বর দু-হাজার সাতের সেই লাখো লোকের ধিক্কার-মিছিল, যেখানে কারুর কাউকে খুঁজে পাওয়ার কথা না, সেখানেই মিছিল শুরুর আগে কলেজস্ট্রিটে কী করে যেন দেখা হয়ে গেল আমাদের। একটা সিগারেট খাওয়াল ভেটকি। সরকারের বাপান্ত করল। আমার আরও একটু হ্যাজাবার ইচ্ছে ছিল, কতদিন দেখা হয় না, ও-ই 'যা, যা, এখন তোর অনেক কাজ, মিছিলের পর' বলে ঠেলে দিল জনস্রোতের মধ্যে, আর আমিও 'তাহলে ধর্মতলায় দেখা হচ্ছে' বলে ফেটে গেলাম। সে-দেখা বকেয়া আজ সাত বছর, কিন্তু হয়ে যাবে নিশ্চয়, আচমকা, কোনো একদিন, আরেক সরকারবিরোধী মিছিলে, ভরসা রাখি।

তবে প্রেসিডেন্সিতে বোধহয় আর নয়। দু-হাজারের গোড়ার বছরগুলো থেকেই নাকি ভেটকি আর কলেজে বিশেষ আসত-টাসত না। কলেজস্ট্রিট আর প্রেসিডেন্সির মধ্যে ফাটলের চেহারাটা আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে তখন। 'মধ্যমেধা' হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের নতুন প্রিয় গালাগালি। ক-বছর আগেও যাকে বলা হত শ্রেণিনির্লজ্জতা, তার নতুন বিগ্রহ হয়েছে এক্সেলেন্স। ছাত্রছাত্রীরাও কত চটপটে আর কী কেজো। প্রেসিডেন্সির বিশুদ্ধ দ্বীপের চারপাশে সরকার আর বড়ো মিডিয়ার ঘন প্রহরা। এসব ইতিহাসের সময়, ক্যারেক্টারদের নয়। ছিয়াশি বাই এক-এ তাই ভেটকি হয়তো সার-জল পাচ্ছিল না আর। নব্যলিবারাল তো আকাশ থেকে পড়ে না, মাটি থেকেই গজায়। কবিতা, বাংলা মদ, নাল-ঝোল, উপকথা, নোংরা জামা, অকারণ হাসি, সমস্ত অবান্তরই ছেঁটে ফেলতে হবে, এই তার অহর্নিশ ভুজুং। কাজের ইতিহাসে ঢুকতে-বেরোতে কাগজপত্র লাগে।

পাসপোর্ট ছিল কি ভেটকির? মনে তো হয় না। ও একবার মানিব্যাগ বের করাতেই যা হইচই পড়ে গিয়েছিল।

ভেটকি নয়, খোকন

পিনাকপাণি ঘোষ



ভেটকির মা

‘আমার মেজোছেলের নাম খোকন, কেউ ভেটকি বললে আমার রাগ হত।’ অনেকদিনের পুষে রাখা সেই রাগ বেরিয়ে এল ছিয়াশি বছরের মায়ের মুখ থেকে। না, রাগত স্বরে নয়। সেই স্বর নেই। অথবা, কোনোদিনই ছিল না। সহজ, সরল, শান্ত মা রেগে না-হলেও, কেটে-কেটে বলেছিলেন কথাগুলো।

কলেজস্ট্রিটে ভেটকির বাড়ি। সেই ঠিকানাটুকু সম্বল করে ফুটপাথের এক বইবিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করতেই মিলে গেল খোঁজ। দেখিয়ে দিলেন বাড়িটা। কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচুকে পিছনে ফেলে দিলখুসা কেবিনকে ডান হাতে রেখে একটু এগোতেই ৮২/১ মহাত্মা গান্ধি রোড। সারি-সারি দোকানের মাঝে অন্ধকার একটা গলি-মতো। ঢুকেই ডান হাতে দরজা। ডান পাশে ইংরেজি হরফে লেখা ‘সুধা-মতি’। ওনার্স, এস দাস, কে এস দাস। ‘এস দাস’ কি তবে ভেটকি ওরফে সিদ্ধার্থ দাস? প্রশ্ন মনে নিয়ে দরজা টপকাতেই ডান দিকের দেওয়ালে বেশ কয়েকটি লেটার বক্স। কিন্তু ভেটকির নাম-গন্ধ নেই। সিদ্ধার্থরও নয়।

ছোট্ট প্যাসেজটাতেই বাঁ-দিকে ফের ছোট্ট একটি টার্ন। তারপরই সিঁড়ি। নীচ থেকেই দেখা যাচ্ছে আধ-খোলা হলুদ দরজায় নীল-সাদায় ইংরেজিতে লেখা ‘দাস’। পাশেই কলিং বেলের সুইচ। — ‘কাকে চাই?’ ভিতর থেকে মধ্যবয়স্ক পুরুষগলা। — ‘এটা কি ভেটকি, মানে সিদ্ধার্থ দাসের বাড়ি?’ — ‘হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।’ — ‘জানি। আসলে ওঁর সম্পর্কে একটু খোঁজ নেওয়ার জন্য এসেছিলাম...’ — ‘কী জানতে চান মেজদার সম্পর্কে? ভিতরে আসুন।’

পারিবারিক ভেটকির খোঁজ-খবর শুরু হল পুরোনো কলকাতার এক তিনতলা বাড়ির দোতলার বারান্দায়। আর শুরুতেই ধাক্কা। যাঁকে ঘিরে এই ‘ভেটকি সংখ্যা’, তাঁর মায়ের কাছে একেবারেই অপছন্দের ‘ভেটকি’ ডাক। ‘বাড়িতে আমরা সবাই ওকে ‘খোকন’ ডাকতাম। আমার বড়োমেয়ে ডাকত ‘মুনি’। কিন্তু কারা যে ওর ভেটকি নাম দিল!’ মা কি আর জানেন, তাঁর অপছন্দের ওই ‘ভেটকি’ নামে এখনও তাঁর মেজোছেলে কত জনপ্রিয়! মা মানবেন কিনা জানি না, কিন্তু অন্যরকম ‘ভেটকি’ নামটাই হয়তো তাঁর আদরের খোকনকে আলাদা করে রেখেছে। মিশে যেতে দেয়নি সিদ্ধার্থদের ভিড়ে।

‘না-না, সিদ্ধার্থও ওর আসল নাম নয়। ওঁর বাবা সব ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর।’ প্রায় এক এক্সক্লুসিভ ব্রেকিং নিউজ! ভেটকির স্কুলের (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল) সার্টিফিকেটও বলছে, ‘Siddhartha Shankar Das son of Late Motilal Das’।

একটানা বেশি কথা বলতে পারেন না। কোনো কথা মনেও রাখতে পারেন না বেশিক্ষণ। কথাবার্তার সময় ঘুরে-ফিরেই এক প্রশ্ন, ‘এত কিছু জেনে তোমরা কী করবে বাবা?’ সবটা শুনে ঘাড় নেড়েও কিছুক্ষণ পর ফের একই প্রশ্ন। তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না, তাঁর রুগ্ন ছেলেটাকে নিয়ে আবার বিশেষ সংখ্যা! পুত্রহারা মায়ের কাছে এমন করেই সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। ওলোট-পালোট হয়ে যায় শোনা উত্তর। চার বছর আগেই চিরতরে চলে গিয়েছে মেজোখোকা। কিন্তু সদ্যশোকের অশ্রু বারবার টলটল করে ছিয়াশি বছরের চোখ দুটোয়।

সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে শোনালেন পরিবারের অতীত, বর্তমান। শোনালেন ভেটকির কথা। ‘বড্ড মাছ খেতে ভালোবাসত। একবেলাও মাছ ছাড়া চলত না। মাছভাজা হলেই চলবে। হলুদ দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে নেবে!’





৮২/১ এম জি রোড

ভেটকি, মানে সিদ্ধার্থশঙ্কর দাসের বাবা মোতিলাল পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেন পেশার টানে। আয়কর পরামর্শদাতার কাজের সুবিধে বরিশালের তুলনায় কলকাতায় বেশি। সেই জন্যই ব্রিটিশ কলকাতায় চলে আসা। কলেজস্ট্রিটের এই বাড়িটা ভাড়া নেন। পরে অবশ্য বাড়িটা কিনে নেওয়া হয়। স্ত্রী 'সুধা' আর মতিলালের 'মতি' মিলে বাড়ির নাম — 'সুধা-মতি'। তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড়োছেলে কুমারশঙ্কর ছিলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। কয়েক বছর আগে ক্যান্সারে ভুগে মারা যান। তাঁর স্ত্রী কলকাতারই একটি কলেজের অধ্যাপিকা। বড়োছেলের পর দুই মেয়ে পাঞ্চালি ও শকুন্তলা। এরপর আরও দুই ছেলে সিদ্ধার্থশঙ্কর ও দুর্গাশঙ্কর। দুই মেয়েই স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। মা সুধা দাসও হাওড়ার ফণীন্দ্রনাথ কিন্ডারগার্টেন হোম স্কুলে চাকরি করেছেন। সেই সঙ্গে ছিল পারিবারিক একটি চশমার দোকান। যা মূলত দেখত সিদ্ধার্থই। আর ছোটোভাই দুর্গাশঙ্করের বই-এর দোকান কলেজস্ট্রিট চত্বরেই।

মোটামুটি এই হল ভেটকির পারিবারিক পরিচয়। বেশ বড়ো পরিবারে এবং শিক্ষার পরিবেশেই বড়ো হওয়া। মা বললেন, 'ছোটো থেকেই খোকনের আবৃত্তির শখ। কত কবিতা যে জানত! দিনরাত সেসব মুখস্থ বলে চলেছে। ওর বাবার সঙ্গে অনেক অনুষ্ঠানে যেত কবিতা বলতে। বাড়িতে যখন কবিতা বলত, মনে হত যেন রেডিও বাজছে। রেডিও। পাশের ঘর থেকে শুনতাম — অবনী, বাড়ি আছো?... মনে হত, ঠিক যেন রেডিও-এ কবিতাপাঠ হচ্ছে। এখনও যেন শুনতে পাই। জন্মদিনে কবিতার বই চাইত...'



সিঁড়ির মুখে চিঠির ঘর

কবে ওঁর জন্ম? — এ-প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এক মস্ত ধোঁয়াশা। মা বরাবর জন্মদিন পালন করে আসছেন ৮ই বৈশাখ। মৃত্যুর বছর পর্যন্ত ঘটা করে না-হলেও, বাড়িতে পায়েসটুকু হয়েছে। আর অবশ্যই হয়েছে ভেটকির প্রিয় রুই মাছ। বাংলা জন্মতারিখটা মনে থাকলেও, বৃদ্ধা মা কিংবা বাড়ির কারোরই ঠিক কোন বছরে খোকনের জন্ম, মনে নেই। আবার স্কুলের নথিতে যে তারিখ দেওয়া আছে, তার সঙ্গে পরিবারের কথার একেবারেই মিল নেই। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের নথি বলছে, 'His date of birth is 08.07.1958 as per admission register'।

তাহলে জন্ম জুলাই মাসে? কিন্তু মায়ের হিসেব মতো তো সেটা হওয়ার কথা ২১ বা ২২ এপ্রিল। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রে যে হিসেব, তাতে ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারি বয়স ছিল ৩২ বছর। সেই হিসেবে জন্ম ১৯৬৩ সালে। সেটাও যে একেবারেই ঠিক নয়, তা মানছেন বাড়ির সকলেই। তাঁদের বক্তব্য, ছোটোভাই দুর্গাশঙ্করের থেকে তিন বছরের বড়ো ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর। আর সেই হিসেবে জন্মসাল দাঁড়াচ্ছে ১৯৫৭। আবার বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত, শনিবারে জন্মেছিলেন সিংহ রাশির জাতক ভেটকি। কিন্তু পুরোনো ক্যালেন্ডার বলছে, ১৯৫৭, মানে, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ শনিবার ছিল না। বরং তার আগের বছর, অর্থাৎ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ ছিল শনিবার। ২১ এপ্রিল, ১৯৫৬। তবে জন্মতারিখ নিয়ে ধোঁয়াশায় কীই বা আসে-যায়! মৃত্যুর পরের দিনও সমান তরুণ থেকে যাওয়া ভেটকির ঠিকঠাক বয়স জেনে লাভটাই বা কী!

মাত্র তিন বছর বয়সেই মারাত্মক এক অসুখ হয়। সম্ভবত, ব্রেইন ম্যানেনজাইটিস। সেই সময়ের হিসেবে রীতিমতো কঠিন এবং দুরারোগ্য। একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে যায় শিশু সিদ্ধার্থ। অনেক ডাক্তার-বদ্যি করেও কোনো ফল না মেলায় বাড়ির লোকেরা একসময় আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওইটুকু শিশু কিছুই খেতে পারে না। কাউকে চিনতেও পারে না। একসময় দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। ভেটকির ছেলেবেলার গল্প শোনালেন ওর বড়দি। তিনি আগে থাকতেন নিউ আলিপুরে। এখন স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মায়াপুরে। কলকাতায় এসেছিলেন ভাইফোঁটায়। বড়দা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। মেজোভাই পথদুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন বছর চারেক হল। ছোটো দুর্গাকে ফোঁটা দিতেই আসা। আর সেই অবসরে এমনভাবে প্রিয় ভাই মুনিকে নিয়ে কথা বলতে হবে, ভাবেননি। বাড়ির নাম 'খোকন' হলেও, বড়দি পাঞ্চালি চট্টোপাধ্যায় ডাকতেন 'মুনি' বলে। কেন এমন নাম দিয়েছিলেন, স্পষ্ট করে মনে নেই আর আজ। ভাইফোঁটার পরদিন হারানো ভাই মুনির কথা বলতে গিয়ে বারবার থমকালেন, চোখের জল মুছলেন, চুপ করে বসে রইলেন শেষবার ফোঁটায় দেওয়া পাঞ্জাবিটা হাতে নিয়ে। না, পরা হয়নি ওই পাঞ্জাবি। আসলে জন্মদিন হোক বা ভাইফোঁটা, পুজো হোক বা নববর্ষ, ভেটকির কাছে নতুন পোশাকের কদর ছিল কিছুক্ষণের। দিনের বেলাটুকু। সন্ধে হলেই তো তাঁর অন্য জগৎ। সেই জগতে কফি হাউস ছিল, কবিতা ছিল। আর ছিল মদ। মাত্রাছাড়া

নেশা নিয়ে কিছুটা অভিমানের সুরেই যেন কথাগুলো বললেন ভেটকির দিদি। বললেন, 'কাদের সঙ্গে মিশে যে অমন নেশায় ধরল, কে জানে! চুয়াত্তর সালে বাবা মারা যাওয়ার পরই নেশাটা ধরল। পান তো খেতই। সেই সঙ্গে মদ। নিজেই জানত, রাতে মদ খেয়ে কোথায় না কোথায় পড়ে থাকবে, তাই সন্ধের পর নতুন জামাকাপড় পরতই না।'


ELECTION COMMISSION OF INDIA
ভারতের নির্বাচন কমিশন
WB / 22 / 157 / 300002
IDENTITY CARD
পরিচয় পত্র
Elector's Name — Das Siddhartha
Father/Mother/Husband's Name — Motilal
Sex — M
Age as on 1.1.1995 — 32

Address
82/1 ,Mahatma Gandhi Road,Jorasanko, Calcutta.
Facsimile Signature
Electoral Registration Officer
For 157-VIDYASAGAR
Assembly Constituency
Place — CALCUTTA
Date — 01.06.95

ভোটার কার্ড

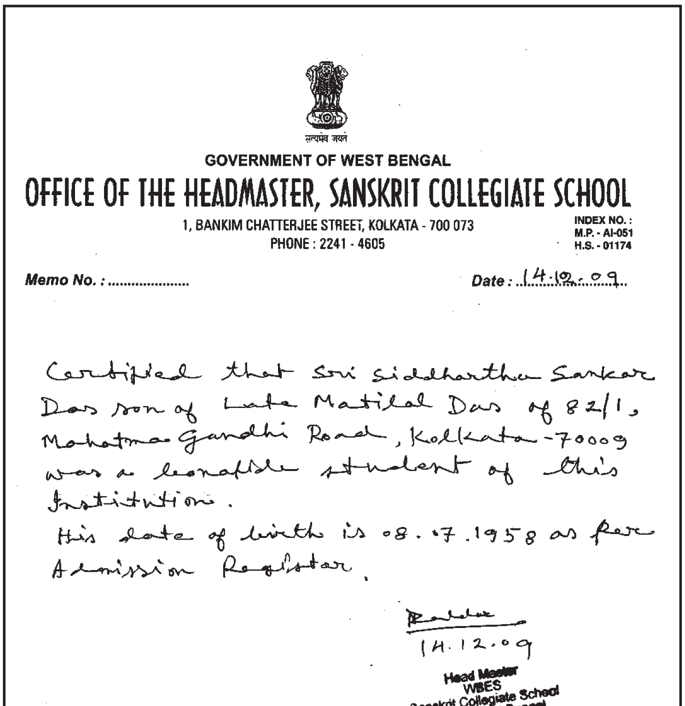
এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার যে সিদ্ধার্থশঙ্কর ওরফে খোকন ওরফে মুনিকে সবাই 'ভেটকি' নামে চিনলেও, বাড়িতে কেউ কখনো ও-নামে ডাকেনি। আসলে অসুস্থতার কারণেই নাকি ওঁর মুখটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। সেজন্যই হয়তো বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ছেলেরা ওঁকে ওই নামে ডাকত। পরে সেটাই চল হয়ে যায়। কোনো খ্যাতনামা মানুষ ওঁর অমন নাম দেননি বলেই মনে করেন দিদি। তবে যে-ই এ-নাম দিক, কেউ 'ভেটকি' বলে ডাকলে বা না-ডাকলেও ভেটকির কিছুই যেত-আসত না!

দিদি আর মায়ের কাছে যা শোনা গেল, তাতে ভেটকির দিন কাটত সূর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। খুব ভোরে উঠতেন রোজ। সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই। তারপরই চলে যেতেন রাস্তার চা-এর দোকানে। খুব চা খেতেন। কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরেই বাজারের ব্যাগ হাতে আবার বের হওয়া। প্রতিদিন নিয়ম করে বাজার করা চাই-ই-চাই। নিজের পছন্দমতো বাজার, বিশেষ করে মাছ কিনে বাড়ি ফেরা। সব মাছই ওঁর পছন্দের ছিল। বাদ শুধু চিংড়ি। ছোটো মাছের তো দারুণ ভক্ত! বাজার সেরেই স্নান করে সোজা চশমার দোকানে। ইউ এন কোং, ৮০ এম জি রোড। নিজে চশমা তৈরি করতেও পারতেন। পাওয়ার টেস্টিং-ও। দোকান বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে টুকটাক চশমার কাজ করতেন। সম্প্রতি ভেটকির সেসব যন্ত্রপাতি একটি দাতব্য চিকিৎসালয়কে দিয়ে দিয়েছেন দিদি। দুপুরে ঠিক সময় করে বাড়িতে খেয়ে নিয়ে, আবার দোকানে। আড্ডাবাজ ভেটকির দোকানেও আড্ডা হবে না, সে কি হয়! কিন্তু সেসব নিরামিষ আড্ডা। অফিসিয়ালি সুরার প্রবেশাধিকার নেই! তবে সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই...

কেমন ছিল ভেটকির ছেলেবেলাটা? প্রশ্ন শুনে দিদি শুরু করলেন সেই ছোট্টবেলার অসুখ থেকে। 'সেই যে ছেলেবেলায় মারাত্মক অসুখটা হল, তখন থেকেই ভাইটা রুগ্ন। কোনো ডাক্তার যখন কিছু করতে পারছেন না, তখন পাড়ারই এক ডাক্তারবাবু ওর চিকিৎসা করলেন। ডাক্তার গৌরপদ রায়। 'গৌরবাবু' নামেই সবাই ডাকত। যখনই ডাকা হত, চলে আসতেন। হাসপাতালে দেওয়া হয়নি। বাড়িতেই ট্রিটমেন্ট হয়েছিল। এককেসময় এককেরকম সিন্ড্রোম দেখা যেত। কখনো অজ্ঞান হয়ে যেত। মাঝে প্যারালাইসিসের লক্ষণ দেখা দিল। একবার এমন হল যে মুনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শেষে ওকে দেখলেন ডক্টর শ্যামল সেন। বাড়িতেই ব্রেইন এক্সরে হল। তিনি ওষুধ দিলেন — গার্ডিনাল। বেশ কড়া ডোজের। রোজ দু-বার — সকালে আর রাতে খেতে হত। ওটা না খেলে একদম ভালো থাকত না। কখনো যদি ওষুধ খেতে ভুলে গেল তো ঠিক বাড়ি ফিরে আসত। আসলে এমন হয়ে গিয়েছিল যে গার্ডিনাল না খেলে ওর খুব অসুবিধা হত।'

ড. সেনই বলে দিয়েছিলেন, ভেটকিকে কখনো লেখাপড়া বা অন্য কোনো ব্যাপারে চাপ দেওয়া যাবে না। তবু লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। বাকি ভাইবোনেদের মতো সে-ও প্রথমে ভর্তি হয় আমহার্স্ট স্ট্রিটের মিশনারি স্কুল চ্যাপেল গার্লস-এ। ওখান থেকে ক্লাস ফোর পাস করে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর মতি শীল কলেজে ভর্তিও হয়, তবে উচ্চ মাধ্যমিক আর দেওয়া হয়নি। ক্লাস ইলেভেনে থাকতেই প্রথমে বই বিক্রি আর পরে নিজেদের চশমার দোকানে বসা শুরু হয়ে যায়। আর সেইসময় থেকেই একটু-একটু করে তৈরি হয় নতুন জগৎ। সেই জগতে জায়গা করে নেন শক্তি-সন্দীপনের মতো কবি-সাহিত্যিকরা। কলেজস্ট্রিট কফি হাউস হয়ে ওঠে নতুন ঠিকানা। প্রেসিডেন্সি কলেজ চত্বরে জমে ওঠে আড্ডা। কবিতার চর্চা, নানা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া।

ছোটোবেলায় একবার হারিয়ে যান ভেটকি। তখন খুবই কম বয়স। শরীর খারাপ থেকে কিছুটা ভালো হওয়ার পরপরের ঘটনা। বললেন দিদি। 'হঠাৎ একদিন সকালে মুনি নেই। খোঁজ-খোঁজ...। কোথায় সে? জানা গেল, কাকার সঙ্গে পাঁউরুটি কিনতে গিয়েছিল। কাকা ফিরে এসেছেন, কিন্তু খোকনের খোঁজ নেই। এদিক-সেদিক যখন খোঁজ-খবর চলছে, তখনই এক ভদ্রলোক বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি নিয়ে আসেন।' এরপর ভেটকিকে নিয়ে আর-এক বিড়ম্বনা হয় যখন সে ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে। একদিন বাড়িতে বড়োরা কেউ নেই। শুধু ছোড়দি আর ভেটকি। হঠাৎ পুলিস কড়া নাড়ল ওঁদের বাড়িতে! 'সিদ্ধার্থশঙ্কর আছে? ওকে একবার থানায় দেখা করতে বলবেন।'


GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE HEADMASTER, SANSKRIT COLLEGIATE SCHOOL
1, BANKIM CHATTERJEE STREET, KOLKATA - 700 073
PHONE : 2241 - 4605
INDEX NO. : M.P. - AI-051 H.S. - 01174

Memo No. : ....
Date : 14.12.09

Certified that Sri Siddhartha Sankar Das son of Late Matilal Das of 82/1, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700009 was a bonafide student of this Institution.
His date of birth is 08.07.1958 as per Admission Register.

14.12.09
Head Master
WBES
Sanskrit Collegiate School
Govt. of West Bengal

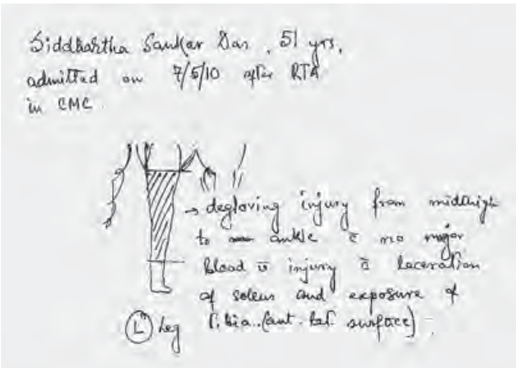
ভেটকির স্কুল থেকে দেওয়া বার্থ সার্টিফিকেট



চশমার দোকান আজ 'SREE RAM SPORTS'

ছোড়দির পরামর্শে ততক্ষণে ভেটকি ছাদে লুকিয়ে। পরে বড়োরা বাড়ি ফিরলেও ওঁকে জিজ্ঞেস করে কিছুই জানা গেল না। অগত্যা দাদা রাতে একাই গেলেন আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায়। জানা গেল, একটি বাচ্চা ছেলে কলেজস্ট্রিটের পুকুরে পড়ে যায়। দেখেই জলে ঝাঁপ দেন ভেটকি। মনেও নেই যে, নিজেই সাঁতার জানেন না! বাচ্চাটাকে তুলেও আনেন। যদিও হাসপাতালে নিতে-নিতে ছেলেটি মারা যায়। দিদি বললেন, 'এরকমই বেপরোয়া ছিল মুনি। নিজে সাঁতার জানে না, অথচ জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে দু-বার ভাবেনি। ওর যে একটা মস্ত অসুখ আছে, সেটা মানতেই চাইত না। সেবার পুলিস বলেছিল, বাচ্চাটা বেঁচে গেলে ওকে পুরস্কার দেওয়া হত!'

প্রেসিডেন্সি কলেজে শুধু আড্ডাই নয়, পছন্দের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে ধরে এনে জোর করে খাওয়াত। পৃথ্বীশ গাঙ্গুলি, প্রকাশ কর্মকাররা প্রায়ই বাড়িতে আসতেন। প্রকাশ কর্মকার আবার অনেক সময় প্যাকেটে করে হোটেলের খাবারদাবারও নিয়ে আসতেন। মনে করে-করে বলছিলেন দিদি। 'ভাই ছিল খুব মিশুকে আর আড্ডাবাজ। দোকানেও আড্ডা চলত। চশমার দোকানে বিশেষ লাভ না হলেও চাপ দেওয়া হত না। আসলে ওটা ছিল ওর একটা এনগেজমেন্ট। কলেজস্ট্রিটের পাবলিশার্সদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। ভালো কমিশন পেত। এমনি বিক্রি ছাড়াও স্কুলের লাইব্রেরির বই সাপ্লাই দিত। সব মিলিয়ে মোটামুটি রোজগার ছিল।'



দুর্ঘটনায় ঠিক কী হয়েছে? — লিখে দিলেন ডাক্তারবাবু

ভেটকি 'সিদ্ধার্থ দাস' নামে কিছু কবিতা লিখেছিলেন। বাড়িতে কিছুই রাখেননি। 'আসলে ও বাড়িতে কিছু রাখত না। একবার দেখিয়েই নিয়ে চলে যেত। খালি ওর কটা ছবি আমার কাছে রেখে দিয়েছিল। সেটা কি অসময়ে চলে যাবে বলেই?' নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন বড়দি পাঞ্চালি। কিছুটা থেমে বলে চললেন, 'নকশাল আমলে ওকে নিয়ে খুব ভয় ছিল আমাদের। তবে ও নকশালদের সঙ্গে বিশেষ মিশত না। পরের দিকে অবশ্য ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স নাগাদ একটু যেন সমর্থক হয়েছিল। ওর কথাবার্তায় তেমনই মনে হত। যেহেতু সারা জীবন ওকে ওষুধ খেয়ে কাটাতে হবে, সেজন্য আমরা ওর বিয়ে দেওয়ার কথা কখনোই ভাবিনি। নিজে থেকে কিছু করলে সেটা আলাদা ব্যাপার। আমরাই ওকে দেখব বলে ভাবতাম। কিন্তু বেশিদিন আর সেটা করতে হল না।'

'সেই দিনটা ছিল ২০১০ সালের ৭ মে। ক-দিন ধরেই ও একটা কবিতা বলছিল সবসময়। এমনিতেই সারাদিন প্রচুর কবিতার লাইন বলত। 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি...', এরকম আরও অনেক। ওইসময় একটা লাইন খুব বলছিল। চলে যাবে বলে বুঝতে পেরেছিল কিনা কে জানে। '...ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা'। দাদা চলে যাওয়ার পর থেকেই একটু কেমন হয়ে গিয়েছিল। আগের দিন, ছ-তারিখ সকালে আমি নিউ আলিপুরের বাড়িতে চলে যাব শুনেই, দেখি চোখে জল। ওইদিনই কোথায় একটা পড়ে যায়। মাথায় ব্যান্ডেজ। একটা টক্সাইড দিইয়ে চলে যাই। সাত তারিখ স্কুল থেকে ফিরে মাকে ফোন করতেই বললেন, খোকনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সন্ধেবেলা কলেজস্ট্রিটে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা থ্রি সি বাই টু রুটের বাস পায়ের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। রাত তখন ন-টা। দশটা নাগাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দেখি, বাইরে শোয়ানো। বেড পায়নি বলে চিৎকার করছে। গালাগাল করছে। ড্রিংক করে রয়েছে তো! একটু-একটু করে ভালো হচ্ছিল। ডাক্তাররাও আশা দিচ্ছিলেন। গোলাপি-গোলাপি স্কিন দেখা যাচ্ছে। জেনারেল বেডে দেওয়ার কথা হচ্ছিল। পায়ে না হয়ে হাতে হলে তো পারমিশান ছাড়াই বাড়ি চলে আসত! অতদিন থাকার ছেলেই নয়! কিন্তু হঠাৎই চলে গেল। কুড়ি ইঞ্চি উন্ডের কষ্টটা আর নিতে পারল না। ৩১ মে মৃত্যু। সকাল ৭টা ১৫।' পোস্টমর্টেম রিপোর্টের শেষেও লেখা ছিল — 'Death was due to the effects of injuries...।'

'মদ খেত বলেই কি ও খারাপ?' প্রশ্ন তুলে দিদি জানালেন, ওর মদ খাওয়াটা বাড়ির অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। শাসনটা কম-বেশি সবাই করতেন। কিন্তু

ভেটকি কি আদৌ কাউকে ভয় পেতেন? কে জানে! ভেটকির মদ্যপানকে কেউ খারাপ চোখে দেখলেও, দিদির কথাবার্তায় ঈষৎ অভিমান থাকলেও, কোনো লজ্জা নেই। বিদ্বেষ নেই। নেশা-দোষ থাকলেও ভাই-এর গুণ নিয়ে বরং বেশ গর্বিত। দিদি পাঞ্চালিও একসময় একটি পত্রিকা করতেন। তখনই একবার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ইন্টারভিউ নিতে যান। কিন্তু এককথায় না করে দিলেন শক্তি। ফের এককথাতেই রাজিও হয়ে গেলেন! কথাটি ছিল, 'আমি ভেটকির দিদি'! সেই একবারই হয়তো মুনিকে 'ভেটকি' ডেকেছিলেন। আর সেই জোরে একবার নয়, দু-দুবার সাক্ষাৎকার দেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আসলে প্রথমবার কথাবার্তার পর দেখা যায়, কিস্যু রেকর্ডই হয়নি! ফের বিনা বাক্যব্যয়ে 'ভেটকির দিদি'-র মুখোমুখি হয়ে যান শক্তি চাটুজ্জে।

তবে, শক্তি-আরাধনা যতই হোক, ভেটকির মদ্যপান যে পরিবারের কাছে বাড়তি বিড়ম্বনা ছিল, সেটা মানতেই হবে। দিদি বললেন, 'পুজোর সময় বাড়িতে সবাই উদ্বেগে থাকতাম। এইসময় নেশা-টেশা তো বাড়ে। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের কাছে একটা কালীপুজো করত মুনি। কালীপুজো মানেই তো মদ। একে কালীপুজো, তাতে আবার ওর পুজো! সবাই টেনশনে থাকতাম। একবার ও আসবে বলে সদর দরজা খোলা রাখা হয়েছে। রাত অনেক। ও আসেনি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। দোতলার বারান্দায় ওর জন্য বিছানা করে রাখা। এসে শোবে। এরকমই বলে গিয়েছিল মুনি। ভোর-রাতে কে-একটা উঠে দেখে, বিছানাটাই নেই! দরজা হাট করে খোলা। মুনি ফিরে এলে বোঝা গেল, বিছানা চুরি হয়ে গিয়েছে। লেপ, তোশক, বালিশ... সব! সবাই মিলে খোঁজ-খোঁজ। পরে দেখা গেল, চোর রাস্তার ধারেই সেই বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।'

এই গল্পটা বলার সময়, এতক্ষণে একটু হাসির আভাস দেখা গেল দিদির চোখে-মুখে। কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্য। তারপরই ভেজা গলায় বললেন, 'মুনি আমার বড্ড প্রিয় ছিল। আমার স্বামীও চলে গিয়েছেন। ব্যাগে তাঁর ছবিটা হয়তো থাকে না, কিন্তু মুনির ছবিটা সবসময় থাকে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে। বের করে দেখি।' মুনি খুব রুটি-তরকারি খেতেও ভালোবাসত। বিকেলে এসে খেত। জানিয়েছিলেন দিদি। আমরাও একদিন দেখা করতে গিয়েই বুঝলাম — রুটি, পনিরের তরকারি আর রসগোল্লা সহযোগে জলখাবারের আয়োজন। যত্ন করে খাওয়ালেন। তখনই বললেন, 'মুনির খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন, তাই ওর প্রিয় জলখাবারটাই খাওয়ালাম'। তখনও জানা ছিল না, ভাই-হারানো দিদি নিজে আর রুটিই খান না! এখনও মোবাইল থেকে ডিলিট করেননি মুনির নম্বরটা।

ভেটকি নিয়ে উদ্বেগ অবশ্য রোজই থাকত। যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছেন, ততক্ষণই ভয় কাজ করত। কোথাও পড়ে নেই তো! অনেক সময় কেউ-কেউ বাড়িতে বেহেড ভেটকিকে পৌঁছে দিয়ে যেত। তবে বেশিরভাগ সময়ই অফিস থেকে ফিরে, খুঁজতে বেরিয়ে যেতেন দাদা। ক্যান্সারে ভুগে সেই দাদাও মারা গিয়েছেন ২০০৯ সালে। তারপরও কতদিন কত জায়গায় পড়ে থেকেছেন ভেটকি। কেউ না কেউ ঠিক বাড়িতে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শেষ যেদিন কলেজস্ট্রিটের রাস্তায় পড়ে গেলেন, সেদিন আর ফেরানো যায়নি। ঘাতক বাসটা দস্যুর মতো ওঁর একটা পায়ের উপর উঠে পড়েছিল। বছরের পর বছর যে পা-দুটোয় ভর দিয়ে একটু কুঁজো হয়ে, একমুখ হাসি নিয়ে কলেজস্ট্রিট দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, সেই পা-এর একটি থেঁতলে গিয়েছিল পিচরাস্তা আর টায়ারের মধ্যিখানে। কফি হাউসের সিঁড়ি ভাঙতে পারেনি আর। পঁচিশ দিনের লড়াই মিটিয়ে, হাসপাতাল থেকে মর্গ হয়ে, শুধু একবার গিয়েছিল কফি হাউসের শেষ আড্ডায়। বন্ধুদের কাঁধে চড়ে।

তাঁর বন্ধুত্বের স্বাক্ষর রয়ে গিয়েছে কফি হাউসের তিন-চার দশকের আড্ডায়। রয়ে গিয়েছে ভার্চুয়ালি তাঁর কাছেও, তাঁর মোবাইলের ফোনবুকে... আজও সেভ রয়েছেন অ্যালফাবেটিকালি... অচ্যুত মণ্ডল, অপালা, ব্রাত্য বসু, প্রকাশদা...

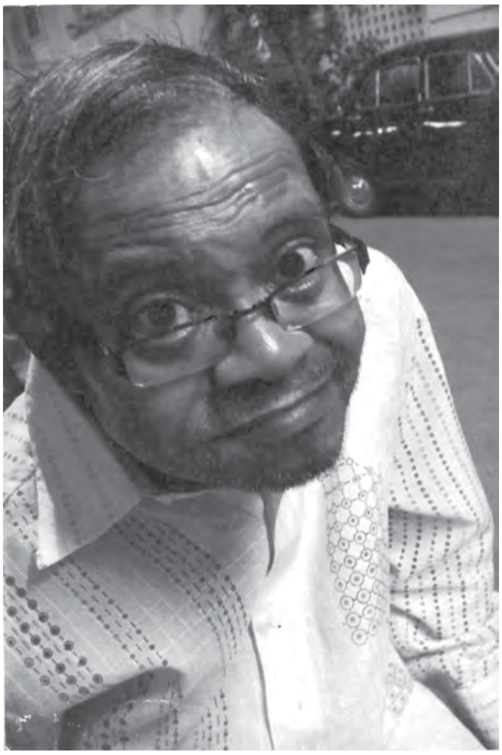
ভেটকি সম্পর্কে কথায়-কথায় ফের উঠে আসে তাঁর মদ খাওয়ার প্রসঙ্গ। অনেক নস্টালজিয়া, অনেক মজার কথায় মেতে ওঠেন সবাই। কিন্তু ভেটকির পরিবারের কাছে আজও কোথাও যেন ওই মদকেই অভিশাপ বলে মনে করা হয়। এখনও কানে বাজছে ভেটকির দিদির কান্না-ভেজা গলা — 'এখন আর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের দিকে যাই না। রাস্তায় কাউকে পড়ে থাকতে দেখলেই মনে হয়, ওই বুঝি শুয়ে আছে আমার ভাই। আমার মুনি।'



ভেটকির ব্যবহৃত

এই লেখার সঙ্গে ফটোগ্রাফ : অরুণাভ পাত্র

ছড়ায় ভেটকি



আয় আয় ভেটকি

মৃদুল দাশগুপ্ত

কলেজস্ট্রিটের পথে পাতা কার্পেট কি?
আসছেন কোনো নেতা? না, না, ও তো ভেটকি!
মদে চুর, সে কারণে মাথা তার হেঁট কি?
ফিরে এলি! ফিরে এলি! বুকে আয় ভেটকি।

তুই কোথা গিয়েছিলি! ট্রেনে হল লেট কি?
আয় আয় ফিরে আয়, আয় আয় ভেটকি।

কতদিন পরে দেখা, খাবি সিগারেট কি?
কোথাও যাবি না আর, আয় আয় ভেটকি।

মাঝরাতে কফিঘর খুলে দিল গেট কি?
এসেছে এসেছে ফিরে আমাদের ভেটকি।

লিখতে লিখতে মাথা, হল গুবলেট কি?
নচেৎ ভাবব কেন, বেঁচে নেই ভেটকি!

রিজার্ভ বেঞ্চে, এক্সট্রা

শৈবাল ঘোষ

একলাই তিনি কাঁসর-ঘণ্টা
    একলাই জগঝম্প
কবিতার গড়ে তিনিই সেপাই
    কবিতার ঘরে লম্ফ।

কবিতার টোপে স্বেচ্ছায় ফেঁসে
    বঁড়শিতে চিরবিদ্ধ
কবিতাপাঠের আসরে তিনিই
    নিপাতনে স্বতঃসিদ্ধ।

একলাই তিনি ট্রাফিক পুলিস
    কবিতার যানজটে
নাছোড়বান্দা বিল্বপত্র
    সর্ব কবিতাঘটে।

কবিরা সবাই রথী-মহারথী
    বিষ্টু এবং কেষ্টা
রিজার্ভ বেঞ্চে একলাই তিনি
    একটি মাত্র এক্সট্রা।

ভেটকির পাঁচকাহন

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

হাঁক পাড়লে ভেটকি,
শক্তি জাগেন, এবং ভাবেন —
হয়ে গেলাম লেট কি?

মোড়ের মাথায় ভেটকি,
সম্পাদকে অমনি ভাবে —
আজ কবিতার রেট কী?

ভোরবেলাতে ভেটকি?
সাতসকালে খুলল তবে
বারদুয়ারির গেট কি?

বুকফেয়ারে ভেটকি!
সাংবাদিকে ভাবছে এটা
পাবলিশারের থ্রেট কি?

মিউজিয়ামে ভেটকি,
খুঁজতে এলেন বুদ্ধবাবুর
পদ্যপাঠের ডেট কী?

চার কবিতে কলকাতারে
শাসন করে রাতদুপুরে!
ভেটকি ভাবেন আ মলো যা —
কবিও কিনা শাসক!
সহসা হাঁকে জাগল পাড়া —
ভেটকি, বাড়ি আছো?

আমাদের ভেটকি

দীপ মুখোপাধ্যায়

সেই সময়ে আমরা ছিলাম কাব্যে ওতপ্রোত
ঠোঁটের ডগায় শক্তি, সুনীল, তুষার, যোগব্রত —
আড্ডা ছিল কলেজস্ট্রিটের বিমূর্ত ক্যানভাসে
লিটল ম্যাগের স্বপ্নগুলো গিলতাম গোগ্রাসে।

ইনফিউশন চুমুক দিতে সকলে তৎপর
আর ছিল সেই কফি হাউস আশার বাতিঘর
ভেটকি তখন মনের মানুষ সবার চোখের মণি
এবং ছিল সমকালের প্রবল প্রতিধ্বনি।

আউড়ে যেত কাব্য কত স্মৃতির খাতা থেকে
আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে থেকেছি প্রত্যেকে
ভেটকি নামের আপনভোলা মানুষটাকে ঘিরে
সন্ধে থেকে রাত গড়াত তখন ধীরে ধীরে।

বারদুয়ারি খালাসিটোলা কিংবা কোথাও ব্ল্যাকে
আমরা তখন দূর আকাশে উড়ছি একে একে
ভেটকি তবু তীক্ষ্ণ সরস রয়েছে প্রাণপণে
অন্ধকারের পিদিম যেন দুঃসহ নির্জনে।

ভেটকি আছে ভালোবাসায় জড়িয়ে আছে প্রেমে
নকশি কাঁথার রুমাল হয়ে মনের ফটোফ্রেমে
আবার দেখি ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছোটে
কাব্য এসে উপচে পড়ে পবিত্র দুই ঠোঁটে।

সে ছিল তাই মেঘের ভাঁজে মনপবনের নাও
কিন্তু নিজে মনের কথা লেখেনি একটাও
ভেটকি আছে ছন্দ-দোলায় সেই কবিদের সাথে
চিরস্থায়ী বসত যাদের স্বপ্ন আঙিনাতে।

ভেটকি লিখছেন...



কালো কবির মৃত্যুতে

সিদ্ধার্থ দাস

কৃষ্ণ কবি
তোমার ফাঁসির খবর শুনলাম
নিথি রবীন্দ্রনের মুখে।
ভাষ্যকার নাকি সংবাদ পাঠের সময়
কোনরকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে না।
অথচ নিথির মুখখানা... কালো হয়ে গেল
কালো কবির মৃত্যু জানাতে...

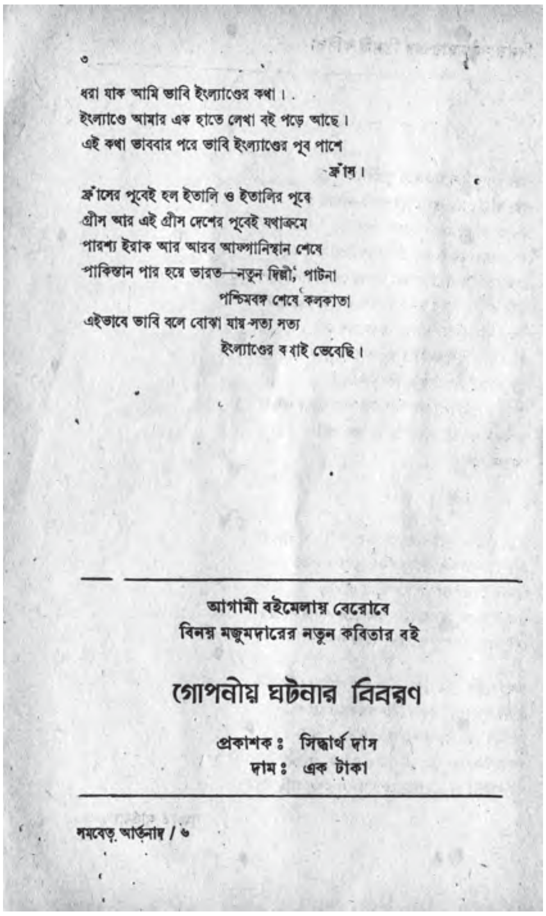
মোলায়েজ
পৃথিবীতে কবিতার দিন শেষ হয়নি।
পৃথিবীতে কবির দিন শেষ হয়ে যায়নি...
কবি তুমি
মানুষের অধিকারের জন্য লড়েছিলে
আমরা বিশ্বাস করি কবি
তোমার আত্মা তৃপ্ত হবেই
পৃথিবীর ঘৃণা আর ক্রোধে
জেগে ওঠা দেখে।

সমবেত আর্তনাদ
প্রথম সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৮৭ - মার্চ ১৯৮৮



ভেটকির ঘরের জানলার ফটোগ্রাফ : অরুণাভ পাত্র

প্রকাশক ভেটকি, অপ্রকাশিত বিনয়



৩

ধরা যাক আমি ভাবি ইংল্যাণ্ডের কথা।

ইংল্যাণ্ডে আমার এক হাতে লেখা বই পড়ে আছে।

এই কথা ভাববার পরে ভাবি ইংল্যাণ্ডের পুব পাশে

ফ্রাঁস।

ফ্রাঁসের পুবেই হল ইতালি ও ইতালির পুবে

গ্রীস আর এই গ্রীস দেশের পুবেই যথাক্রমে

পারশ্য ইরাক আর আরব আফগানিস্থান শেষে

পাকিস্তান পার হয়ে ভারত—নতুন দিল্লী, পাটনা

পশ্চিমবঙ্গ শেষে কলকাতা

এইভাবে ভাবি বলে বোঝা যায় সত্য সত্য

ইংল্যাণ্ডের ব'ইটাই ভেবেছি।

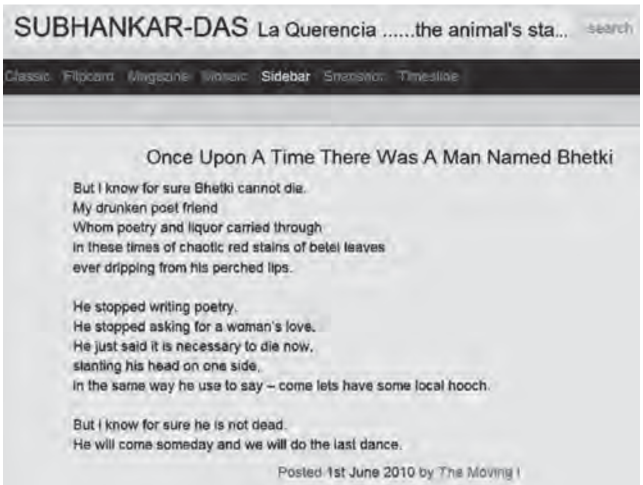
আগামী বইমেলায় বেরোবে
বিনয় মজুমদারের নতুন কবিতার বই

গোপনীয় ঘটনার বিবরণ

প্রকাশক ঃ সিদ্ধার্থ দাস
দাম ঃ এক টাকা

সমবেত আর্তনাদ / ৬

তখন বিনয় মজুমদারের প্রকাশিতব্য কবিতার বই *গোপনীয় ঘটনার বিবরণ*-এর বিজ্ঞাপন



SUBHANKAR-DAS La Querencia ......the animal's sta...

Classic Flipcard Magazine Mosaic Sidebar Snapshot Timeslide

Once Upon A Time There Was A Man Named Bhetki

But I know for sure Bhetki cannot die.
My drunken poet friend
Whom poetry and liquor carried through
in these times of chaotic red stains of betel leaves
ever dripping from his perched lips.

He stopped writing poetry.
He stopped asking for a woman's love.
He just said it is necessary to die now,
slanting his head on one side,
in the same way he use to say – come lets have some local hooch.

But I know for sure he is not dead.
He will come someday and we will do the last dance.

Posted 1st June 2010 by The Moving I

ভেটকির মৃত্যুর পরদিন নিজের ব্লগে শুভঙ্কর দাশের কবিতা

পটভূমিকা

সাতাশ বছর আগের কথা। এখন মনে হয় একটা স্বপ্নের মতো। মহাত্মা গান্ধি রোডের একটা চশমার দোকানে আমাদের দুপুরবেলার ঠেক। *সমবেত আর্তনাদ*-এর প্রথম সংখ্যা বেরোবে। চশমার দোকানটা ছিল ভেটকির। মাতাল কবিবন্ধু আমার। তখনই, ১৯৮৭-র কথা বলছি, সে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়। খুব কম লেখে। সর্বক্ষণ আউড়ে চলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা। বলতে কী, ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা তার মুখেই প্রথম শুনি। ওকে তা বলতে *দে'জ*-এ নিয়ে গিয়ে ৩০% কমিশনে 'শীতকাল...' কিনিয়ে দিয়েছিল। সুধীন দত্তর কাব্যগ্রন্থও। তো, কাগজটা কীভাবে হবে, কী করা যায়, এই নিয়ে আমি আর সঞ্জীব তখন প্রায়ই ধাওয়া দিচ্ছি তার দোকানে। ভেটকিই প্রথম সংখ্যায় জন্য বিনয়দার তিনটে কবিতা জোগাড় করে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য একটা ছোটো গদ্য। তো সেইসময়ই সে বিনয় মজুমদারের একটা ছোটো কবিতার বই ছাপবে ভাবছিল। *গোপনীয় ঘটনার বিবরণ*। তা নিয়ে একটা বিজ্ঞাপনও বেরোল প্রথম সংখ্যায়। কিন্তু বই বেরোল না! যা পয়সা চশমার দোকান থেকে আসত, সবটাই

বাংলা মদে চলে যেত বলে ব্যাপারটা ক্রমাগত পিছোচ্ছিল। অবশেষে একদিন প্লাস্টিক ঠোঙায় মোড়া সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমি দেখলাম। বাড়িতেও নিয়ে এলাম, কিন্তু ভেটকি সেটা আবার ফেরত নিয়ে নিল আমার কাছ থেকে। এসব ব্যাপারে সে বেশ পজেসিভই ছিল। তারপর বহু বছর পরে আমাদের আরেক তরুণ বন্ধু তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির এক মদের আড্ডায় সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। খুব সম্ভব শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ম্যানুস্ক্রিপ্টটি ছিল। ভেটকিই প্রচ্ছদের জন্য দিয়ে থাকবে। আমার সঠিক খেয়াল নেই এখন। তারপর মুদিয়ালী বাড়ি, সেই ২এ টিপুসুলতান রোড বিক্রি হয়ে গেল। বাড়ি বদলানোর সময় বহু জিনিস হারায় — ওটাও হারিয়েছে ধরে নিয়েছিলাম। হঠাৎ পুরোনো জিনিস ঘাঁটতে-ঘাঁটতে দেখি, প্লাস্টিক ঠোঙা-বন্দি সে আছে এখনও আমার সাথেই! *বোধশব্দ*-র এই ভেটকি সংখ্যার কথা শুনে মনে হল, এ পাওয়াটা বোধহয় নেহাত কাকতালীয় নয়। এই সংখ্যাতেই এটা যাওয়া উচিত; যে কাজটা ভেটকি করবে ভেবেও শেষ অবধি পেরে ওঠেনি। তাই সুস্নাতর হাতে দিয়ে এতদিনের অশান্তি কাটিয়ে ওঠা গেল কিছুটা।

— শুভঙ্কর দাশ

সংযোজন

শুভঙ্করদার মুখে পাণ্ডুলিপির এই কাহিনি কিছুটা শুনেই প্রবল উত্তেজিত হয়েছিলাম। সে-উত্তেজনা বিস্ময়ে পরিণত হল গোটা পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে। কবিতাগুলি ভালো না মন্দ, মনে হয় না সে-বিচার এখানে জরুরি; কারণ সাতাশ বছর আগে লেখা বিনয় মজুমদারের আকাঁড়া একটি কাব্যগ্রন্থের গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। আর পাণ্ডুলিপিটিও ছিল দর্শনীয়! সেই ঝকঝকে হাতের লেখা! লাল-কালো-নীল তিন রঙের কালিতে রয়েছে লেখাগুলি। লালচে, দুর্বল হয়ে যাওয়া কাগজ; দু-রকম মাপের। প্রথম বিয়াল্লিশটি কবিতা ছোটো কাগজে; পাতার দু-দিকে একটি করে লেখা। শেষ সতেরোটি, অর্থাৎ, ৪৪ থেকে ৬৪ নং পর্যন্ত ফুলস্ক্যাপে; পাতার দু-দিকেই একাধিক লেখা। মাঝের ৪৩ নং কবিতাটি নেই। সম্ভবত আগেই কখনো হারিয়ে গিয়ে থাকবে। ৬৪ নং কবিতাটির তলায় বিনয় মজুমদার লিখছেন — 'এক দিনে ১৮/২/১৯৮৮ তারিখে ৬৪টি কবিতা লিখেছি'। এ থেকে লেখাগুলির রচনাকাল ও লেখার সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। তবে, এখানে আমাদের হাতে একটি বাদে, সাকুল্যে তেষট্টিটি কবিতা। লেখাগুলির ক্রমও নির্দিষ্ট করা রয়েছে শিরে দেওয়া সংখ্যায়।

পাণ্ডুলিপির ছোটো পাতাগুলো কেন কে জানে, মাঝখান থেকে বিচ্ছিরিভাবে ছেঁড়া! বোঝাই যাচ্ছে, পরে ফের কেউ সেগুলিকে আঠা দিয়ে সেঁটেছেন; একই পাতার ছিন্ন দু-টি টুকরোয় একই নম্বর দিয়ে-দিয়ে জিগ্‌স পাজলের মতো মোটামুটি চলনসই একটা অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। তাতেও যা হাল, অনেকগুলি লেখাই অত্যন্ত কষ্ট করে বুঝতে হচ্ছে।

রয়েছে বানান-বৈষম্য। একই শব্দ নানা জায়গায় নানা বানানে লেখা হয়েছে। এখানে সেসব অপরিবর্তিতই রাখা হল। রয়েছে লেখার কিছু ভুলও। কোথাও 'চল্লিশ' লিখতে গিয়ে তিনি লিখে ফেলেছেন 'চলিশ', কোথাও 'যার' লিখতে গিয়ে 'চার', কখনো বা 'কাজ' লিখতে গিয়ে 'কাছ'। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশোধন করে প্রযোজ্য শব্দটিই ছাপা হল।

বিনয় মজুমদারের *কাব্যসমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সম্পাদক শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, '...বহুজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কবির নানাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে — এমন কথাও নানা মহলে শোনা যায়।' এই *গোপনীয় ঘটনার বিবরণ* হয়তো তেমনই। এই লেখাগুলি কখনো কোনোভাবে প্রকাশিত বা গ্রন্থভুক্ত হওয়ারও কোনো খোঁজ পাইনি। তাই কনটেন্টের বিচারে এটিকে 'বিনয় মজুমদারের অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ'-ই বলা হল। অনেকে লিখেছেন, ভেটকির নাকি একটি কাব্যগ্রন্থ ছিল; যদিও সে-বই চোখে দেখেছেন বলে জানাননি কেউই। মৃদু প্রশ্ন জাগছে, সে-বই কার হওয়ার কথা ছিল, 'লেখক' ভেটকির নাকি 'প্রকাশক' ভেটকির? অতএব, এসব ভাবতে-ভাবতে চলুন, ভেটকির হাত ধরে একবার শিমুলপুর থেকে ঘুরে আসা যাক।

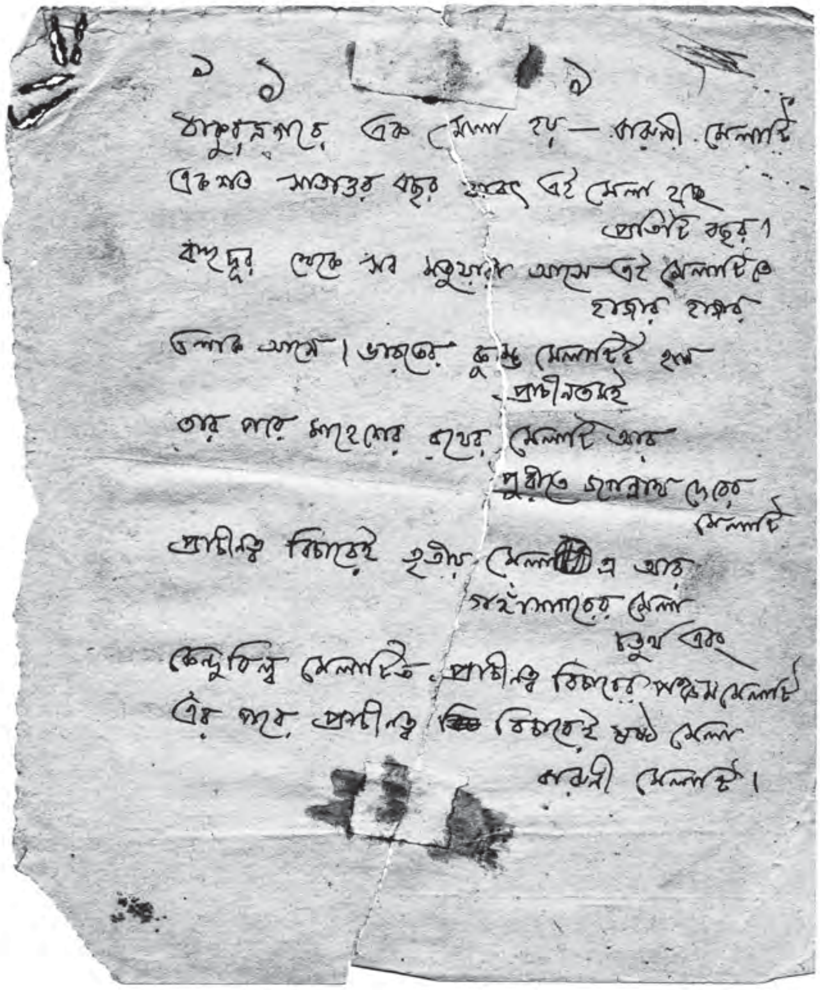
— সম্পাদক



অ প্র কা শি ত কা ব্য গ্র ন্থ

গোপনীয় ঘটনার বিবরণ

বিনয় মজুমদার


১ ১ ১

ঠাকুরনগরে এক মেলা হয় — বারুণী মেলাটি
একশত সাতাত্তর বছর যাবৎ এই মেলা হচ্ছে
প্রতিটি বছর।
বহুদূর থেকে সব মতুয়ারা আসে এই মেলাটিতে
হাজার হাজার
লোক আসে। ভারতের কুম্ভ মেলাটিই হল
প্রাচীনতমই
তার পরে মাহেশের রথের মেলাটি আর
পুরীতে জগন্নাথ দেবের
মেলাটি
প্রাচীনত্ব বিচারেই তৃতীয় মেলা এ আর
গঙ্গাসাগরের মেলা
চতুর্থ এবং
কেন্দুবিল্ব মেলাটিত প্রাচীনত্ব বিচারের পঞ্চম মেলাটি
এর পরে প্রাচীনত্ব বিচারেই ষষ্ঠ মেলা
বারুণী মেলাটি।

পাণ্ডুলিপি : *গোপনীয় ঘটনার বিবরণ*, বিনয় মজুমদার

১

ঠাকুরনগরে এক মেলা হয় — বারুণী মেলাটি
একশত সাতাত্তর বছর যাবৎ এই মেলা হচ্ছে প্রতিটি বছর।
বহুদূর থেকে সব মতুয়ারা আসে এই মেলাটিতে হাজার হাজার
লোক আসে। ভারতের কুম্ভ মেলাটিই হল প্রাচীনতমই
তার পরে মাহেশের রথের মেলাটি আর
পুরীতে জগন্নাথ দেবের মেলাটি
প্রাচীনত্ব বিচারেই তৃতীয় মেলা এ আর গঙ্গাসাগরের মেলা চতুর্থ এবং
কেন্দুবিল্ব মেলাটিত প্রাচীনত্ব বিচারের পঞ্চম মেলাটি
এর পরে প্রাচীনত্ব বিচারেই ষষ্ঠ মেলা বারুণী মেলাটি।

২

ঠাকুরনগরে আগে রেলের স্টেশন ছিল না তো।
কতিপয় উদ্বাস্তুরা এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে
এসে বসবাস শুরু করেছিল পরে ধরাপাড়া করে
একটি রেলস্টেশন বানিয়ে নিয়েছিল ও তার আগে এই
ঠাকুরনগর আর আশে পাশে গ্রামে
জমির দাম তো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আর
এমন জমিও ছিল যার দাম পাঁচ টাকা বিঘা।
এবং যখন রেল স্টেশন হল তখন এ জমির দাম বেড়ে বেড়ে
বিঘা প্রতি দাম হল এক লক্ষ টাকা।

৩

এবং রেলস্টেশন হবার পরেই সব উদ্বাস্তু গরীব
ধনী লোক হয়ে গেল, নগর পত্তন হল,
কারণ এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার
হয়ে সব কলকাতা মহানগরীতে চাকরী করার
নিমিত্ত, সেহেতু লোকে দ্রুত বেগে এইখানে জমি জমি কিনে
বাড়ী বানিয়েছে আর বহিরাগত ধনীরা রেলস্টেশন
হবার পরেই এসেছিল
এইভাবে ধীরে ঠাকুরনগর গ্রাম এবং আমার গ্রাম শিমূলপুরেই
মফস্বল শহরেই এখন রূপান্তরিত হয়েছে এবং
বিঘা পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা জমি আজ ঠাকুরনগর
স্টেশন রোডেই, তার দাম হল বিঘা প্রতি চার লক্ষ টাকা।

৪

ঠাকুরনগর থেকে রেলগাড়ি চলে যদি কলকাতা আসে
তবে প্রথমেই গোবরডাঙা ও এই গোবরডাঙায়
পুরসভা হয়েছিল একশত দশ বৎসর
আগেই, এখানে থাকে গোবরডাঙার রাজা, আমি রাজাদের
চিনি ও তাদের বড় প্রাসাদটি পুরাতন সিংহ দরজায়
দুটি সিংহ দুই দিকে। রাজারা অত্যন্ত মহাশয়।
বহু পুরাতন এই প্রাসাদের কড়িকাঠ প্রকৃতই কাঠে তৈরী
কাঠগুলি বাকা হয়ে গেছে
ছাদের ভারের চোটে রাজাদের আত্মীয়স্বজন
গোবরডাঙায় এসে বসবাস করছে তো দেড়শ বছর।

৫

গোবরডাঙায় এক কালীর মন্দির আছে বহু পুরাতন।
আমাকে রাজামশায় নিজে বলেছেন এই কালীর মন্দির
দক্ষিণেশ্বরের সেই কালী মন্দিরের আগে তৈরী হয়েছিল।
গোবরডাঙার মেয়ে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সাহিত্যিকা, তার বোন হাসিরাশি দেবী
বহুকাল আগে থেকে পূজনীয়া সাহিত্যিকা অপূর্বকুমার
ভট্টাচার্য এইখানে গোবরডাঙায় জন্মে ছিলেন এবং
অপূর্বের কবিতা তো প্রবেশিকা শ্রেণীটির পাঠ্যপুস্তকেই
ছিল এককালে আমি নিজেই পড়েছি।

৬

গোবরডাঙায় এক গ্রন্থাগার আছে এই গ্রন্থাগারে এক
হাতে লেখা বই আছে যাতে নজরুল
ইসলামের হাতে লেখা এবং অপ্রকাশিত কবিতা রয়েছে।
ইংরেজের নীল কুঠি ছিল এই গোবরডাঙায়।
রাজাদের হাতিশালা ছিল এই হাতী বাঁধবার
শিকল এখনো আছে, অতিশয় মোটা এই শিকলসমূল
মাঠে পড়ে আছে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।
গোবরডাঙার মাঝ দিয়ে গেছে যমুনা নদীটি।

৭

গোবরডাঙায় এক কলেজ রয়েছে রাজা কলেজ বানিয়ে
নিজে অধ্যাপনা করে এই কলেজে এবং
রাজাদের গ্রন্থাগারে যত বই ছিল সব দান করেছে তো
কলেজের গ্রন্থাগারে। কলেজের গ্রন্থাগারে, একদা গিয়েছিলাম আমি।
ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা বিধবাবিবাহ চালু হবার পরেই
পশ্চিমবঙ্গের যিনি প্রথম বিধবা বিয়ে করেছেন তিনি
গোবরাডাঙার লোক। গোবরডাঙায় তিনি অমর প্রেমিক।
এবং বরদাকান্ত পাঠাগার নামে এক গ্রন্থাগার আছে।

৮

গোবরডাঙায় বহু ক্লাব আছে, ব্রতচারী দল আছে, একদা আমাকে
নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল এক ক্লাবে। ব্রতচারী দল
এমন সুন্দর সব এমন সুন্দর নেচে এবং ব্যায়াম করেছিল
আমি তো অবাক দেখে। ইন্দ্রনীল গিয়েছিল, কলকাতা থেকে
উৎপল বসু আর শঙ্কর দে গিয়েছিল, গান গেয়েছিল
দুর্গা নাম্নী এক দেবী হারমনিয়াম ছাড়া এই ক্লাবটির
সুবর্ণজয়ন্তী হল, সুবর্ণজয়ন্তী সভা আজো মনে আছে
আরও বহু সমিতি ও টাউন হলও আছে গোবরডাঙায়।

৯

গোবরডাঙায় এক সায়েন্স ক্লাবও আছে তারা
মাঝে মাঝে সভা করে কোলকাতা থেকে
বৈজ্ঞানিক ডেকে নেয়। বিজ্ঞানীরা নানাবিধ বক্তৃতা
তখন সাধারণত বিজ্ঞানসভায় আমি সভাপতি হই।
যখন খোরানা সেই নোবেল প্রাইজ পেল তখন একটি
সভা হল সেইখানে গোবরডাঙায় আর আমি সভাপতি
কলকাতা থেকে গেল প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ডাক্তার সাধু আর
ব্ল্যাক বোর্ডে চকে লিখে কীসব বোঝালো এই ডাক্তার সাধুই।
আমি বললাম 'স্যার, আমি আপনার ছাত্র,
প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়তাম আমি।'

১০

রামকৃষ্ণ মিশনের ইস্কুল রয়েছে এই গোবরডাঙায়।
গোবরডাঙার রাজা একদা আমাকে এই ইস্কুলটি দেখালেন, তার
নামটি ঊষাপ্রসন্ন গোবরডাঙার রাজা বহু পরিচিত
পশ্চিমবঙ্গেই তিনি, রাজার বাড়িতে
একটি আশ্চর্য ছবি তৈলচিত্র আছে।
রাজা বললেন 'ওই ছবিটি অনেক আগে
সংগ্রহ করেছিলেন পূর্বপুরুষেরা।
হয়তো বা রাফায়েল ছবিটি একেছে।'
অতীব সুন্দরী এক উলঙ্গিনী পরী এই ছবি।
এমন আশ্চর্য রঙ, এমন আশ্চর্য চিত্র কোনদিন ভুলব না আমি।

ভেটকিকে নিয়ে নতুন বই!



প্রাপ্তিস্থান

ইতিকথা বইঘর | ধ্যানবিন্দু

boighar | haritbooks

ভৌকি

www.facebook.com/groups/bodhshabdo/
https://twitter.com/#!/Bodhshabdo

অষ্টাদশ সংখ্যা, পঞ্চদশ বর্ষ : পৌষ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫
বিনিময় মূল্য : ১০০ টাকা